

সাহিত্য ধারা

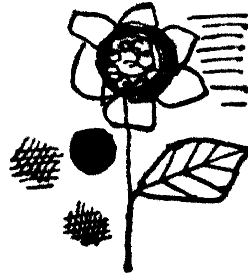
প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক। রমা ভট্টাচার্য। ২৬ সেন্ট্রাল রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩২

মুদ্রক। শ্যামা প্রেস। ২০বি, ভুবন সরকার লেন।
কলিকাতা-৭০০ ০০৭



সূচীপত্র



প্রতিবেশী সূর্যের রক্তাক্ত দিনগুলি

সারা দুনিয়ার ফ্যাসীবাদ বিরোধী শক্তিগুলির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেদিন ইতিহাসের দুই নৃশংস নায়ক হিটলার আর মুসোলিনী ভেবেছিল বিশ্বের প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করে সারা দুনিয়াকে নিজেদের হাতের মুঠোয় আনবে। সারা ইউরোপ জয় করে তার সমস্ত বৈষয়িক শক্তি নিয়ে হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর মাতৃভূমি সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর। ভেবেছিল অনায়াসেই সে বিজিত হবে। কিন্তু স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের প্রত্যেকটি দেশ-প্রেমিক মানুষ সেদিন দৃঢ়তা এবং অসীম সাহসের সঙ্গে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে বার্লিন পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক দেশ যুদ্ধ চায় না—তারা চায় শান্তি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ সংকটের সমাধানের পথ খোঁজে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। হিটলার চেয়েছিল যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তার পরিণতি সে হাতে হাতে পেয়েছে। মুসোলিনীর ভাগ্যেও জুটেছে সেই একই পরিণতি। জাপানী ফ্যাসিস্টদের ভাগ্যেও কম দুর্ভোগ ছিল না। শেষপর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন তার ভেঙে গেল। চীনের শ্রমিক কৃষক জনতার কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে নিজের ঘরেই তাকে মুখ লুকোতে হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিতর দিয়ে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ল। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যক্ত দুনিয়ার বাজারে তার হাত

প্রসারিত করল নতুন উপনিবেশিকতাবাদের নয়া কৌশল নিয়ে। ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের অনেক বাজার হাতছাড়া হয়ে গেল। নতুন নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। সেই সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রাখার মতো দুঃসাহস আর পুরনো বাজু সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল না। উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলির বুর্জোয়াদের সাথে আপোষ রফার মাধ্যমে তারা যথাশীঘ্র ভুয়ো স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিল। ভারতবর্ষের আপোষ-পন্থী বুর্জোয়ারাও জনতার স্বাধীনতার আন্দোলনকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রক্ত গঙ্গা বহিয়ে দিল। ধর্মের নামে দেশকে দু-টুকরো করল। একই ভারতবর্ষে হিন্দু আর মুসলমানের দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল।

ফ্যাসিস্ট নির্যাতন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার এই ভয়ঙ্কর দুঃখ-দুর্দশা এবং নিদারুণ দিনগুলির গর্ভেই যে নতুন আশা এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা আজও প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে আমরা কি করে তা ভুলতে পারি। যারা তাঁদের প্রাণ দিয়ে আগামী দিনের মানুষকে মুক্তির পথ দেখালেন তাঁদের সেই সংগ্রামকে স্মরণীয় করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। তাঁরা নিজেরাও নির্যাতিত হয়েছেন। অনেককে নাৎসী ক্যাম্পে বা কারাগারে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কিন্তু তবু তাঁরা মাথা নত করেননি। বরং নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, ঘৃণাকে জাগিয়ে রেখেছেন, বিশ্বাসকে উদ্দীপ্ত করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই জার্মান ফ্যাসিস্ট ক্যাম্পে তরুণী এসথারকে, যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনের জন্যে গভীর মমতায় পরিয়সীর মতো মৃত্যু বরণ করল। ইতালির তরুণ দেশপ্রেমিক ম্যাজিও, যে স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল সে স্বদেশে ফিরে এসে জার্মান নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে অসীম সাহসের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে উৎসর্গ করল। স্পেনের ফ্রাঙ্কোর কারায় যে শিশু ভূমিষ্ট হল এবং জন্মের পর থেকে বন্দীনীদের আদর আর স্নেহে বেড়ে উঠল, সেই ছোট্ট মেয়ে আশা একদিন বুঝতে পারল এই কারাপ্রাচীরের বাইরে আর এক অনন্ত জগৎ আছে, যেখানে অসংখ্য ভালো মানুষ তাদের কথা ভাবে—তাদের জন্যে চিন্তা করে। বিশ্বজোড়া মার্কিনী পুলিশী ব্যবস্থার এক সাধারণ হাতিয়ার হয়ে সার্জেন্ট ক্রেট ভিয়েতনামে এসেছিল, সে জানে না কাদের স্বপক্ষে কার বিরুদ্ধে সে লড়াই করছে। ভিয়েতকঙদের

হাতে বন্দী হয়ে সে মুক্তির আলো দেখতে পেল। বুঝতে পারল তার নিজের দেশের শাসকশ্রেণীর সত্যিকারের চরিত্র। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আজ সারা দুনিয়ার মানুষ কেন এত ঘৃণা করে।

আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট অত্যাচার, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিষ্ঠুর শোষণের এবং শাসনের বিরুদ্ধে এই সত্য, এই ঘৃণা এবং এই বিশ্বাসকেই ধারাবাহিকভাবে এই সংকলনে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ব্যক্তি মানুষের প্রতিরোধ থেকে সমষ্টিগত মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনী মূর্ত হয়ে রয়েছে এই 'প্রতিবেশী স্বর্গের রক্তাক্ত দিনগুলি'তে।

আজকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, যখন জনজীবনের ওপর নেমে এসেছে এক বর্বর আক্রমণ, অজস্র রাজনৈতিক কর্মীরা যখন জেলে বন্দী, জেলখানায় যখন গুলি করে কিংবা পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, প্রকাশ্য দিবালোকে যখন কমিউনিস্টদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে, যখন 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' নামে গণ-আন্দোলনের ওপর ফ্যাসিস্ট কায়দায় হামলা চালানো হচ্ছে তখন আমরা প্রকাশ করছি সারা বিশ্বের ফ্যাসিবাদ ও তার সাকরেদদের বিরুদ্ধে জনগনের অনমনীয় সংগ্রামের কাহিনীগুলি, যে কাহিনীগুলি রক্তের অক্ষরে লেখা, যা আজও মূর্ত হয়ে আছে। শাসকশ্রেণী যতই নিষ্ঠুর এবং বর্বর অত্যাচারই চালাক না কেন তাকে প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা জনতা রাখে।

এই সংকলনে অষ্ট্রেলিয়ার কোন ভালো প্রতিরোধের গল্প আপ্রাণ চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি, এ ত্রুটি আমরা সচেতন ভাবেই স্বীকার করছি।

ভূমিকা। প্রথম সংস্করণ।

বহু সচেতন পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণের কেনিয়ার গল্পটি বিরূপ সমালোচিত হওয়ায় গল্পটিকে এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করা হল না। পরিবর্তে সংযোজিত হল দক্ষিণ আফ্রিকা ও প্যালেস্তাইনের দু'টি প্রতিবাদমুখর গল্প।

এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান ভারতবর্ষে শ্বাসরোধকারী রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন ঘটলেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজন আজও ফুরোয়নি। আর সেই কারণেই এই সংকলনের প্রয়োজনও আশা করি ফুরোবে না।

বিশ্বের প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের জন্যে

এসথার

ব্রুনো আপিৎস্



সমাজতান্ত্রিক জার্মানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ব্রুনো আপিৎস্। জন্ম ১৯১০ সালে, লাইপজিগ শহরে। হিটলারের বুখেনভাল্ড বন্দী শিবিরের ভয়ঙ্কর বাস্তব অভিজ্ঞতায় রচিত তাঁর 'নেকেড অ্যান্ড উলভ্‌স' এক অমর সৃষ্টি। গ্রন্থটির জন্যে তিনি জাতীয় পুরস্কারও লাভ করেন'

একই অভিজ্ঞতায় এসথার গল্পটিতেও এক-দিকে ভালবাসা অন্যদিকে সংগ্রামকে তিনি পাশাপাশি ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণ তুলির টানে।

এত এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ক্যাম্পের পাশের জমিতে একটা গ্যাস চেম্বার তৈরি হচ্ছে। কারাগারের একজন কর্মী হল অসওঅলড্। এতদিনে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ফোরম্যান আর্নেস্ট অথচ কয়দিন ধরে বারবার এই কথাটাই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে এসেছে। প্রায় দিন পনের আগে যেদিন একশোটি গ্রীক ইহুদী মেয়ে এখানে এল, তখনই ওর সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু অসওঅলড্ ওর কথায় বিশ্বাস না করে বলেছে, 'গ্যাস চেম্বার? তুমি পাগল হয়েছ আর্নেস্ট। কেন, কার জন্যে?'

আর্নেস্ট যখন বলল, এই মেয়েদেরই জন্যে; সে তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

অসওঅলড্ তখন বলেছে, 'যত বাজে কথা। এই মেয়েরা যে-ক্যাম্প থেকে আসছে সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে গ্যাস দিয়ে মারা হয়। মাত্র একশোটি মেয়েকে পৃথিবীর এক প্রান্ত

থেকে অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে, কেবল তাদেরই জন্যে সেখানে গ্যাস চেম্বার তৈরি করার কি কারণ থাকতে পারে? সেখানেই যে-কাজ আরও সহজ হতে পারত, তার জন্যে এখানে তাদের নিয়ে আসার কি দরকার ছিল?'

আরও দিন পনের পরে ঘর তৈরি শেষ হল। ঘরের মাঝখানে একটি গর্ত, তার মধ্যে একটি বালতি। বাইরে থেকে একটা নল এসে এই বালতিতে পড়েছে। ভারি লোহার গরাদ দিয়ে জায়গাটি সুরক্ষিত করা হয়েছে।

আর্নেস্ট বলল, 'আমি জানি। ওই বালতিতে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ রাখা হয়। নল থেকে ফোঁটা ফোঁটা তরল পদার্থ তার সঙ্গে মিশে গ্যাসের সৃষ্টি করে।'

এর পরে অসওঅলডের আর প্রতিবাদ করার উপায় থাকে না। সে ভাবতে থাকে—তবে এই পরিত্যক্ত স্থানে যে-ঘরটা তৈরি হয়েছে সেটা গ্যাস চেম্বারই হবে এবং ওই মেয়েদেরই জন্যে।

সেই রাতে অসওঅলডের চোখে আর ঘুম নেই। দশ বছর আগে সে বন্দী হয়ে ঢুকেছে কারাগারে। এত দিনের মধ্যে এই প্রথম ও মেয়ে দেখল। পুরুষদের ঘরের পেছনের ব্যারাকে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেসব ঘরের চারপাশে মজবুত কাঁটাতারের বেড়া। পরদিন সকালে ডাক্তারের সঙ্গে মেয়েদের ঘরে যেতে হল। মেয়েরা কথা বন্ধ করল, কিন্তু একজনও উঠে দাঁড়াল না। কেউ কেউ কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাল। কয়েদীদের ছেঁড়া জামাকাপড় তাদের সেলাই করতে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন। এসথারের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি জার্মান ভাষা জান?' এসথার হাতের কাজ রেখে মাথা নাড়ল। তখন ওকে আর অন্য ছুটি মেয়েকে দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, 'এদের আমার কাছে নিয়ে এস।'

রক্ত নেবার সব ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্যে ডাক্তার অসওঅলড্‌কে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে মেয়েগুলোর সম্বন্ধে এইসব জ্ঞাতব্য

'অর্থ? কিছুই না।'

'সত্যিই কি কিছু না? সব যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে? আমার বন্ধুরা সবাই আর আমি প্রতিদিন এই ভাবনায় অস্থির হয়ে রয়েছি যে আমাদের কি হবে।'

'কেন তোমরা ভাবছ? তোমরা এখানে আসাতে আমরা খুশি হয়েছি। তোমরা মেয়েরা আমাদের পুরুষদের জীবনে যে কতখানি আলো আর উত্তাপ নিয়ে এসেছ, তোমরা নিজেরাই জান না!'

এসথার সরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। বলল, 'সেইটাই নিশ্চয় আমাদের এখানে থাকার কারণ নয়।'

'আমি তো অন্য কোন কারণ জানি না।'

এসথার বলল, 'তোমার উচিত আমাকে সব কথা বলা। আমি ভীতু নই, সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে পারি। মৃত্যুকে আমার ভয় নেই। যে-ক্যাম্প থেকে আমি এসেছি সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার বার মরবার শিক্ষা আমার হয়ে গেছে। সেখানে মৃত্যু যেন বিভিন্ন বেশে আমাদের সঙ্গী হয়ে ছিল। জীবন সেখানে ছিল মৃত্যুরই ছায়া। আমি জানি যে আমরা এই ক্যাম্প থেকেও জীবন্ত কখনও ফিরব না। কিন্তু এই যে অনিশ্চয়তার বিভীষিকা, সেইটাই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।'

'এ সমস্তই তোমার অলীক কল্পনা এসথার', বলল অসওঅলড্। তিক্ত হাসল এসথার, 'এখানে যেন কল্পনার কত সুযোগ! আমি শুধু জানতে চাই কি ভাবে আমাদের মরতে হবে। সেখানে আমাদের গ্যাস চেম্বারে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। এখানে কি হবে? তোমাদেরও কি গ্যাস চেম্বার আছে?'

অসওঅলড্ বলল, 'তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, এসথার।'

'আমি নিজেই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি। আমি তো মরতে চাই না, অসওঅলড্। সে সাহস আমার একটুও নেই—এতক্ষণ শুধু ভান করছিলাম।' এসথার ধপ করে বেঞ্চে বসে পড়ে চুলগুলো এলোমেলো.

করে নিজের হাত দুখানা মোচড়াতে লাগল।

অসওঅলড্ অসহায়ভাবে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত সে সাহস করে এসথারের চুলে হাত রাখল।

সেই কোমল স্পর্শের আকুতি এসথারের অন্তরে আঘাত করল। অসওঅলড্ যে-কথা ওর কাছে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, এই স্পর্শেই তা জানা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অসওঅলডের দিকে তাকিয়ে এসথার বলল, 'তোমার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ, অসওঅলড্।'

'আমি তোমাকে কিছুই বলিনি, এসথার।'

এসথার চোখ বুজে যেন সেই অন্ধকারকে সম্বোধন করে বলল, 'যে-জন্তুকে বাঁচাবার আর উপায় নেই তাকে ঠিক এই ভাবেই মানুষ আদর করে।'

কিছুক্ষণ সে সেখান থেকে নড়ল না, যেন অসওঅলডের সেই কোমল স্পর্শ সে তখনও অনুভব করছিল। তারপর নিজেই হেসে ফেলল, 'আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল। মেয়েরা এরকমই হয়। কিন্তু তোমরা ছেলেরা ঢের বেশী সাহসী। তোমরা যদি জান যে মৃত্যু তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তবে তোমরা বলবে—কি আর করব, উপায় নেই।'

ওর কথার উত্তর দেবার মতো জোর অসওঅলড্ নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না।

ডাক্তার অসওঅলড্‌কে ফোনে জানালেন, 'এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আসছি। যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখ, আর কি যেন নাম মেয়েটির, তাকেও নিয়ে এস।'

এক ঘণ্টা সময় আছে। অসওঅলড্ তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি এনে সব গুছিয়ে ফেলল। তারপর এসথারকে ডেকে নিয়ে এল। আসার পথে ও যেখানে কাজ করে সেসব জায়গা এসথারকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে আসছিল। অফিসের ঠিক পাশেই ওর শোবার ঘর, মাঝখানে

কেবল একটা সরু দেয়াল। সেই ঘরে এসথারকে এনে ওর কানে কানে বলল, 'এখানে জোরে কথা বলার উপায় নেই।'

এসথার ওর দিকে তাকাতেই দেখিয়ে বলল, 'দেয়ালগুলো এত পাতলা যে আমাদের প্রত্যেকটি কথা ওরা শুনতে পাবে।' এসথার চুপি চুপি বলল, 'তোমার ঘরখানি সুন্দর। এ ছবিটা কার?'

'আমার মায়ের।'

এসথার অনেকক্ষণ ধরে ছবিখানা দেখল, জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?'

অসওঅলড্ মাথা নাড়ল।

'দেশে এমন কোন মেয়ে আছে যে তোমাকে ভালবাসে?'

অসওঅলড্ অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমি যখন জেলে আসি তখন আমার বয়েস মাত্র সতেরো বছর।'

এসথার কিছু বলতে চাইল, কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আহা, বেচারা!'

অসওঅলড্ ওর হাত দুখানি ধরে বলল, 'তুমিই আমার জীবনে প্রথম মেয়ে। যখন থেকে তোমাকে দেখেছি, আমি বুঝতে পেরেছি…'

এসথার ওর বিছানার একপাশে এসে বসল। দুজনেই নিশ্চুপ। এসথার ওর হাতখানি নিয়ে নিজের কপালে চেপে ধরল। অনেকক্ষণ ওরা ওই ভাবেই বসে রইল। দেয়ালের ওপাশে অফিস। সেখানকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এদের ঘর এত নিস্তব্ধ, পাশের ঘরের সব কথা ইচ্ছে করলেই শুনতে পেত। তবে সেই সময়ে ওদের কাছে সেসব কথার কোন মূল্যই ছিল না। হঠাৎ এসথার সোজা হয়ে বসে মন দিয়ে কি যেন শুনল। পাশের ঘরের কথাবার্তা শুনে অসওঅলড্ও যেন অসাড় হয়ে গেল। এসথার লাফিয়ে উঠে দেয়ালে কান পাতল। শুনতে পেল…'এই মেয়েরা যদি জানত যে গ্যাস চেম্বারই ওদের ভাগ্যে আছে…'

অসওঅলড্ দৌড়ে অফিসে গিয়ে বলল, 'তোমাদের কি মাথা

খারাপ হয়েছে ? এখানে থেকে যে সব কথা শোনা যাচ্ছে, তা কি তোমরা জান না ?'

তাড়াতাড়ি আবার এসথারের কাছে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এসথার তখনও দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। একটু হেসে মৃদুস্বরে ও বলল, 'আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি।'

অসওঅলড্ এমনভাবে এসথারকে দেয়ালের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনল যেন আর একটু হলে ওর গায়ে আগুন ধরে যেত। তারপরে যেন ওকে নিরাপদ আশ্রয় দেবার চেষ্টায় জোরে নিজের কাছে টেনে রাখল।

পরে তারা ডাক্তারের ঘরে এসে তাঁর অপেক্ষায় রইল। দুজনের মনে একই চিন্তা। এসথার ফিস ফিস করে বলল, 'কখন হবে ?' অসওঅলডের মাথা তোলারও সাহস নেই। বলল, 'আমি জানি না।'

'আমাদের মধ্যে তো আর কিছুই গোপন নেই, অসওঅলড্, এখন তুমি আমাকে সব বলতে পার।'

'সত্যিই আমি জানি না, এসথার।'

এসথার আর কিছু বলল না। টেবিলে যন্ত্রপাতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তার এসে মাপ নিতে শুরু করলেন। প্রথমে এসথারের মাথার মাপ নিলেন। অসওঅলড্ লিখে রাখল। তারপর তিনি বললেন, 'এবার জামা-কাপড় খুলে ফেল।' এসথার ভয় পেয়ে গেল। যেন নিজেকে রক্ষা করার জন্যে হাত দিয়ে শরীর ঢাকল। ডাক্তার কঠোর স্বরে বললেন, 'শিগগির কাপড়-চোপড় খোল।' অসহায়ভাবে সে ভয়ে ভয়ে সেই ঘরের পুরুষ দুজনের দিকে তাকাল। টেবিল চাপড়ে ডাক্তার আবার বলেন, 'তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।'

বিবর্ণমুখে কাঁপতে কাঁপতে এসথার বেল্ট আর বোতাম খুলে ফেলে লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

অসওঅলড্ দৃঢ়পদে ডাক্তারের সামনে গিয়ে বলল, 'এবার তবে

আমি যেতে পারি?' ডাক্তার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন, 'কেন, কি হয়েছে?'

'না না, এবার আমাকে যেতে দিন'—বলেই অসওঅলড্ সে-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার ওর পিছু পিছু ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

অসওঅলডের মুখ উত্তেজনায় বিবর্ণ, ও জানে এ জন্যে ওর বিপদ ঘটতে পারে। তবু ওভাবে চলে আসায় যে কাজ হয়েছে তা ও বুঝতে পারল। 'আমি তোমার নামে রিপোর্ট করব, নিজেকে কি ভেবেছ তুমি?' বলতে বলতে ডাক্তার নিজের ঘরের দিকে গেলেন। 'যাও, কয়েদীকে এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও'—অসওঅলড্‌কে নির্দেশ দিয়েই তিনি চিৎকার করে এসথারকে বললেন, 'এখনই বেরিয়ে যাও।' এসথার বেল্টটি তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অসওঅলড্ অপেক্ষা করছিল, এসথার মাথা নীচু করে ওর সঙ্গে গেল।

সেদিন থেকে এসথারের মধ্যে পরিবর্তন এল। সে যেন এখন অন্য মানুষ। ওর মুখের ভাবও বদলে গেছে।

দুপুরে খাবার সময় ডাক্তার ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেলে অসওঅলড্ এসথারকে দেখতে গেল। মেয়েটিও খালি ঘরখানায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এখন ওর মনও আগেকার চেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবু এক-এক সময় ওর মধ্যে সেই পুরনো ভয়টা জেগে ওঠে। অসওঅলড্ তা টের পায়। তখন দুজন দুজনকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যেন একে অন্যকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে চায়। মন শান্ত হলে পর এসথার জানলার ধারে গিয়ে বাইরে তাকায়। বলে, 'মেঘগুলো কী সুন্দর, দেখ—আর আকাশটা কী নীল!'

ক্লান্ত স্বরে অসওঅলড্ বলে, 'এখন এসব দিকে কি করে যে

তোমার চোখ পড়ে?' জানলার গরাদে কপাল চেপে রেখে এসথার বলে ওঠে—'এসব ছাড়া অন্য কোন দিকেই আমার দৃষ্টি যায় না। এখন আমি কেবল আকাশ আর মেঘই দেখি। আহা, এসব যদি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম!'

অসওঅলড্ ওর কাছে গিয়ে ওর কাঁধে নিজের মাথাটি রাখল। এসথার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবু কিন্তু আরেকটি এসথার আমার মধ্যে আছে। সে মেয়েটি সারারাত ধরে নিজের মৃত্যুর কথাই ভাবে। ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, পাছে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে সে-আশঙ্কায় ঠোঁট কামড়ে পড়ে থাকে, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরে। বালিশে মুখ গুজে কেঁদে বলে ওঠে—'খুনী, খুনী, এরা সব খুনী।'

কোনমতে এসথার বেঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকে। তারপর সব ঝেড়ে ফেলে বলে ওঠে—'আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করব। আমার এই হাত দিয়ে ওদের আঘাত করব। আমাকে যদি টেনে নিয়ে যেতে চায়, আমি মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। হাজার যুদ্ধ করেও এই মৃত্যুর হাত থেকে তো আমার নিস্তার নেই! আমার পথের শেষ প্রান্তে সেই গ্যাস চেম্বার। যেভাবে আরও হাজার হাজার লোক মারা গেছে, যাচ্ছে, সেভাবে আমাকেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে।'

অসওঅলড্ ওর খুব কাছেই বসেছিল। ওর বুকের কাছে মাথা রেখে এসথার বলল, 'প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে জেগে যখন চোখ মেলি তখন আবার এই পৃথিবীকে দেখতে আমার বড় ভালো লাগে। দেখা, শোনা, ছোঁয়া—এ সবের মধ্য দিয়ে আমি সবরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই। এখন একটি ছোট চারাগাছের মতোই আমার প্রাণ, সহজে নিজেকে যে মেলতে চায়।'

অসওঅলড্ কথা বলতে পারল না, কোন সান্ত্বনাও দিতে পারল না, কিছু বলার ক্ষমতাই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। কেবল তার

আঙুলগুলো এলথারের চকচকে নরম চুলের মধ্যে খেলা করল। ওর অসহায় ভাব দেখে এলথার মৃদু হাসল। বলল, 'আমার সময় তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কালই সব শেষ হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, সুখ, প্রেম—সবই কি শেষ হয়ে যাবে? আচ্ছা অসওঅলড্, তোমাকে যদি কেউ বলে কাল তোমাকে বিষাক্ত গ্যাস দেওয়া হবে, কাল তুমি কালচে নীল রঙের স্ফীতকায় একটা শব ছাড়া আর কিছুই নও, তীব্র দুর্গন্ধময়, ঘৃণ্য…'

অসওঅলড্ শিউরে উঠে ওর মুখ চেপে ধরল।

এলথার মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার বলল, 'তুমি কি এসব কথা অস্বীকার করতে পার, অসওঅলড্? অথচ আমি যে কেবল একটি মধুর ধ্বনির মতো মিলিয়ে যেতে চাই। আমার জীবনের ছন্দ বড় রকমের একটি দোলা দিয়ে শেষবারের মতো বিলীন হয়ে যাক—এই আমার সাধ। আমি যখন আকাশে মেঘ দেখি, অথবা তুমি যখন আমাকে আদর কর, তখন আমার মনে হয়—আমি অনেক ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছি। এ ধরণীর ধুলোয় জন্মেছি, ধুলোতেই মিশে যাব ঠিক। কিন্তু এরই মাঝে যে রয়েছে জীবন, বেঁচে থাকা—আহা, শুধু বেঁচে থাকা!' আবেগে অসওঅলড্কে জড়িয়ে ধরে বলে যায়, 'জানি না কেন আমার এখন এ তৃষ্ণা জাগল। সহজভাবেই তোমাকে বলি। তুমি বুঝতে পারছো তো? আমরা আর একটুও সময় নষ্ট করতে পারি না। বল, মরতে তো আমাকে হবেই। আর ঠিক এই মুহূর্তেই প্রেম এল আমার দ্বারে। এ কি করুণা, না ভাগ্যের কৌতুক? একে আমি কি ভাবে গ্রহণ করতে পারি? কি করে আমি নিজেকে তার জন্যে প্রস্তুত করব? ঝাঁপিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আমার তো আর অন্য উপায় নেই।' বলে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। শুষ্ক, সংযত সেই ক্রন্দন। সমস্ত শরীর ওর কেঁপে কেঁপে উঠল, তারপর খুব ধীরে ধীরে ও শান্ত হল। দুর্বলভাবে অসওঅলড্কে জড়িয়ে ধরল। চোখের জলে ভেজা ওর মুখ যখন তুলল, বেদনার মৃদু হাসিতে

কেবল ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে উঠল।

অসওঅলডের মুখে বার বার হাত বুলিয়ে এসথার বলতে থাকে, 'তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় অসওঅলড্, তুমি মেঘের মতো, গাছপালার মতো, ঐ নীল আকাশের মতো… ।'

সে-রাতে এসথারের ঘুম হল না। মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনার উদয় হতে লাগল। একবার দেখল, সে খুব জোরে ডাক্তারের গলা টিপে ধরেছে, তারপর ওঁর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার মনে হল অসওঅলড্ আর ওর সঙ্গীরা কয়েকজন ওকে বাঁচাবার জন্য কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করে আছে। এসথারের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তাগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম শুনতে পায়, ও ডাক্তারের সঙ্গে খুব রাগ করে চেঁচিয়ে কথা বলছে। ক্রমশ সেই গলার স্বর নেমে যাচ্ছে। আবার শোনে সব মেয়েদের কাছে সে আবেদন করছে তারা যেন নিজেদের মুক্তি দাবি করে। হঠাৎ আবার এই দৃশ্যেরও পরিবর্তন ঘটে, দেখে ও গ্যাস চেম্বারে গেছে, চীৎকার করছে। নিজের বিকৃত মুখখানা ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ওর আতপ্ত মস্তিষ্ক এই ভাবনার শেষে পৌঁছতে পারে না। অপরিসীম ক্লান্তিতে ওর সমস্ত চিন্তা ডুবে যায়। তার পরেই আবার ডাক্তারের লালসাপূর্ণ কুৎসিত দৃষ্টি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঘৃণায় বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে হাত দিয়ে ও নিজের দুটো চোখই ঢেকে ফেলে। ওর রক্তের গতি আর নাড়ির স্পন্দন ও যেন নিজের কানে শুনতে পায়। মনে হয় যেন হাওয়ায় ভেসে ও চেতনার সীমান্তে গিয়ে পৌঁচেছে। হঠাৎ পাশের মেয়েটির কাশির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। তখনই কঠিন বাস্তব ওর চেতনায় এসে আঘাত করল।

পরদিন দুপুরবেলায় এসথার খুব তাড়াতাড়ি সেই খালি ঘরটায় চলে এল। অসওঅলড্ আসা মাত্র ওর কাছে ছুটে গেল।

'কি হয়েছে, এসথার?'

'কিছুই না, তুমি আজ এত দেরি করলে কেন?'

'কই, প্রতিদিন তো এই একই সময়ে আসি।'

'না, না, আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে,' বলে অসওঅলডের কাঁধে মাথা রাখল। তারপর ওকে বেঞ্চের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, আমরা এখানে একটু বসি।'

দুজনে পাশাপাশি বসল। এসথার অসওঅলডের হাত দুটো ওর হাতের মধ্যে টেনে নিল। বলল, 'এখনও হয়তো কিছু দেরি আছে।'

'থাক এসথার, এখন আর ওসব ভেবো না।'

অনেকক্ষণ ধরে এসথার ওর হাত দুখানি দেখল। তারপর একটা হাত নিয়ে ওর মুখে ঠেকাল। সমস্তটাই সে এক পূজারিণীর ভঙ্গিতে করল, পরে ওকে জড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ অসওঅলড্ ওকে কাছে টেনে নিয়ে আবেগে চুম্বন করল। এসথার আর আত্মসংবরণ করতে পারল না, দুচোখ বুজে রইল। এক সময় এসথার সরে আসছিল। কিন্তু যখনি নারীদেহে অনুভব করল অসওঅলডের প্রথম লাজুক স্পর্শ, সেই স্পর্শের শুচিতা তাকে মুগ্ধ করল, তার অন্তরতম সত্তা এই ভেবে গভীর ক্রন্দন করে উঠল যে অসওঅলডের পক্ষে যা প্রথম, তার পক্ষে তাই শেষ।

চুপিচুপি ওকে বলল, 'এমন কিছু একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে অসওঅলড্, যাতে আমরা একবার অন্তত নিজেদের একা পাই। তোমার ঐ ছোট ঘরটার কথাই ভাবছি। সেখানেই আমি তোমার কাছে আসব। দেখো, কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে।'

একটু নিস্তব্ধতার পর এসথার ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখনও তো আমার মধ্যে জীবন রয়েছে, আমি তো এখনও বেঁচে আছি। আমি দেখতে সুন্দর অসওঅলড্, তোমার জীবনে যে পাওয়া হবে প্রথম, আমার জীবনে তাই হবে শেষ।'

অসওঅলড্ ওকে থামাবার চেষ্টা করতেই এসথার তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরল। বলল, 'না, না, তুমি কি বলতে চাও আমি জানি। সেসব কথার এখন কোন প্রয়োজন নেই। যত তাড়াতাড়ি

পার তুমি এর ব্যবস্থা কর। কালই কর, নয়তো পরশু রবিবারে।'

এইভাবে ছোটখাট প্রণয়লীলার মধ্যেই তাদের প্রেমের মিলন-সম্ভোগের স্থানকালের ব্যবস্থা দুজনে মিলে করে ফেলল, যে-মিলন অসওঅলডের জীবনে প্রথম আসবে, এসথারের জীবনে তাই হবে অন্তিম পাথেয়।

রবিবার বিকেলে ডাক্তার চলে যেতে আর ঘরটা খালি হতেই অসওঅলড্ এসে এসথারকে ডেকে নিয়ে গেল। এসথার সঙ্গে একটি ছোট প্যাকেট নিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে কি আছে জিজ্ঞেস করতেই এসথার বলল, 'গোপনীয় কিছু।'

অসওঅলড্ ডাক্তারের ঘরেই ওকে নিয়ে এল। ভেতরে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল, কারণ জানলায় কালো পর্দা দেওয়া ছিল। রুগীদের পরীক্ষা করার জন্য যে বড় কৌচখানা ছিল, সেখানা আগেই সে সাদা চাদরে ঢেকে দিয়েছিল।

'বাঃ সুন্দরভাবে তুমি সব প্রস্তুত করে রেখেছ দেখছি। আমরা অনেকক্ষণ সময় পাব তো?'

'হ্যাঁ, রাত্তির পর্যন্ত।'

এসথার দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে বলল, 'আমি কিন্তু তোমাকে অবাক করে দেব। তুমি পেছন ফিরে চোখ বুজে বস। আমি যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চোখ খুলো না কিন্তু।'

অধীর কৌতূহলে অসওঅলড্ প্রতীক্ষা করে রইল। কাগজের প্যাকেট খোলার শব্দ হল।

'তুমি কি করছ?'

'খবর্দ্দার, এদিকে তাকাবে না।'

আবার কাগজে কিছু জড়িয়ে এক কোণায় ছুঁড়ে দেবার শব্দ শোনা গেল। তার পরে সব চুপচাপ।

এবার এসথারের গলা শোনা গেল, 'চোখ বন্ধ রেখেই ঘুরে বস।'

অসওঅলড্‌ও তাই করল।

'এইবারে তুমি আমার দিকে তাকাও।'

অসওঅলড্‌ দেখল, এসথার ওর ঠিক সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সুনিপুণ বেশে সজ্জিতা একটি সুন্দরী তরুণী। আকাশনীল রেশমে তৈরি ওর পোশাক, তাতে বড় বড় শাদা চন্দ্রমল্লিকা যেন ফুটে রয়েছে।

অসওঅলড্‌ মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে অবাক করে দিতে পেরে এসথারের চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি খেলে গেল।

'কোথায় পেলে তুমি এই পোশাক?'

এসথার খুশির আবেগে ঘুরে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে ওর পোশাকের নরম ভাঁজগুলি ওর চারপাশে ঘুরে এল। বলল, 'আমার সুটকেসেই পেলাম। আমাকে বন্দী করার সময় ওরা বলেছিল কিছু কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিতে। তখনই তাড়াতাড়িতে এই পোশাকটিও ওর মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। কত মাস ধরে যে মিথ্যে এটিকে বয়ে বেড়িয়েছি···না না, মিথ্যে ঠিক নয়···এই মুহূর্তে তোমার চোখে সুন্দর হয়ে ওঠার জন্যে ওটা আমাকে আনতেই হত।'

অসওঅলড্‌ আনন্দে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর দেহের উষ্ণতার ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে উঠল, তার পরেই লজ্জায় এসথারের কাঁধে মুখ লুকোল। এসথার টের পেল ওর মনে ভয় জেগেছে। আর তখনই মায়ের মুখের মতো স্নেহ-মধুর হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকাল।

হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ওর সামনে ঘুরে এসথার বলল, 'আমি সুন্দর তো?' তখন ওর চোখ দুটো জ্বলছে, দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে এলোমেলো চুলে ও দাঁড়িয়ে রইল।

পোশাকটি সুন্দরভাবে আঁট হয়ে ওর শরীরে চেপে বসেছিল। হঠাৎ অসওঅলডের মাথায় এই ভাবনাটা এসে ওকে কষ্ট দিল, কাল তো এই হবে এসথারের মৃতদেহ, এ ছাড়া আর কিছু নয়।

এসথার আবার অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'বলো, আমি সুন্দর

কিনা ?' বলেই খুব জোরে হেসে উঠল। অসওঅলড্ দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে চুম্বনে চুম্বনে ওকে অস্থির করে তুলল।

'তুমি যে আমার ফ্রক ছিঁড়ে ফেলবে...'

মুহূর্তের জন্যে ওর মনে ভয় এল, পরক্ষণেই ওর বুকে মাথা রেখে বলল, 'ছিঁড়লেই বা, আমার তো আর কখনও প্রয়োজন হবে না।'

অসওঅলড্ ওর কথায় কান না দিয়ে কৌচের ওপর ওকে শুইয়ে দিল। দরজার বাইরে যে মৃত্যু নিঃশব্দে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, তাকে এসথারও ভুলতে চায়। ওর জীবনের শেষ প্রেমের কাছে একবার অন্তত সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু বেশিক্ষণ ও তা পারে না, ওর উত্তপ্ত রক্তের মধ্যেও মৃত্যুর পদধ্বনি বেজে উঠে অন্য সব শব্দকে ডুবিয়ে দেয়। সেই ছায়াশীতল স্পর্শকে ও কেবলই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে।

এসথার চায় ওর জীবনের এই বিশেষ অভিজ্ঞতাটিকে ও সচেতনভাবে উপভোগ করবে, কিন্তু ও বার বার হেরে যায়। সমুদ্রকূলে বালুকণার মত ওর চিন্তাগুলি ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে উড়ে উড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কটা বাজল ?'

অসওঅলড্ এসথারের বুকে মাথা রেখে স্বপ্নাতুর কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আরও অনেক সময় আছে।'

এসথার আপন অঙ্গে অসওঅলডের প্রেমবিহ্বল স্পর্শ পায়, আর মা যেমন ক্রন্দনরত শিশুকে আশ্বস্ত করে, তেমনিভাবে অসওঅলডের মুখে হাত বুলতে থাকে। ওর নিজের অন্তরের অশ্রুনদীতে বান নেমেছে। যেন কোন আশাহীন ভরসাহীন অজ্ঞাত কূলে গিয়ে ওর জীবনতরী ডুবে গেছে। ঠিক যেখানটায় অসওঅলড্ মাথা রেখেছে, সেইখানে সে অসহ্য বেদনা বোধ করে, চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে, শূন্যদৃষ্টিতে সে রুদ্ধ ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুদিন ধরে এসথার অসওঅলডের জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। অবশেষে তৃতীয় দিনে যখন অসওঅলড্ খালি ঘরটায় ওর সঙ্গে

দেখা করতে এল, তখন ও অত্যন্ত ক্লান্তভাবে মাথা তুলে তাকাল। একে অন্যের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন ওরা পরস্পরের কত অচেনা।

'আমি আসতে পারিনি এসথার।'

হাসবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে এসথার।

হঠাৎ অসওঅলড্ মাটিতে বসে এসথারের কোলে মুখ ঢাকল। এসথার ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল, 'কি হল তোমার ?'

অসওঅলড্ লাফিয়ে উঠে শক্ত করে ওর কাঁধ চেপে ধরল, 'আজ রাতে তোমাকে আবার আমার কাছে আসতে হবে। আসতেই হবে কিন্তু, তোমাকে আমার খুব দরকার।'

'আমাকে ?'

'তুমি আমার জন্যে খালি ঘরটায় অপেক্ষা করবে, আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব। এখন আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস কোর না, তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে, বুঝেছ ?'

সে রাতে চাঁদের আলো ছিল না, ক্যাম্পের সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। রাত একটায় অসওঅলড্ মেয়েদের ঘরের দিকে গেল। এসথার অপেক্ষা করেই ছিল। জানলা বেয়ে নেমে অসওঅলডের প্রসারিত দুই বাহুর মধ্যে ও ধরা দিল।

অসওঅলডের ঘরে গিয়ে এসথার ক্লান্ত হয়ে ওর বিছানায় বসে পড়ল। তারপরে ওর দিকে তাকাতেই ওর বিবর্ণ মুখখানি এসথারের নজরে পড়ল। ওকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে এসথার নিজের মনেই অনুমান করল অসওঅলডের এই পরিবর্তনের কারণ কি। বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওর হাত টেনে ধরে বলল, 'তোমাকেই করতে হবে বুঝি ?'

অসওঅলড্ ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বার বার ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল। এসথার ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকাল।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে অসওঅলডের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমিই ? তবে কি তুমিই ?'

অসওঅলড্ মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল। এসথার আহত অভিমানে বিছানায় শুয়ে একদৃষ্টে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চিন্তাগুলো যেন জমে পাথর হয়ে গেছে।

এসথারের অশান্ত হৃৎস্পন্দনের তালে তালে স্তব্ধ মুহূর্তগুলি অতিক্রান্ত হতে থাকল। অবশেষে এসথারের ঠোঁট নড়ল, 'কখন ?'

অসওঅলড্ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করে এসথার আবার জিজ্ঞেস করল, 'কখন ?'

অসওঅলড্ কথা বলার চেষ্টা করল, মুখ থেকে শব্দ বেরোল না। এসথার আবার বলল, 'বলো না, কবে ?'

অনুনয়ের ভঙ্গিতে অসওঅলড্ তার হাতটি তুলে ধরল।

এসথার জিজ্ঞেস করল, 'কালই ?'

দুজনে একদৃষ্টে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অসওঅলড্ ওকে সাহায্য করবে বলে এগিয়ে আসে। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, দুহাতে নিজের চোখ ঢেকে এসথার চুপি চুপি যেন নিজেকেই বলতে থাকে—'আজই তবে আমার জীবনের শেষ রাত্রি, যাও সরে যাও—আমাকে ছেড়ে দাও। উঃ কী অসহায় আমি ! একটা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা আমাকে গ্রাস করতে আসছে।'

তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। কান্না চাপবার জন্যে বালিশ কামড়ে ধরল।

অসওঅলড্ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। অতিকষ্টে এসথার এবার উঠে বসল। বলল, 'আমাকে দুর্বল হলে চলবে না। এখনই যদি দুর্বল হয়ে পড়ি, কাল তবে কি হবে ?'

অসওঅলড্ ভরসা দিয়ে বলল, 'কাল ? কাল কিছুই হবে না।' ওর চোখ দুটো আশ্বাসে জ্বলজ্বল করে উঠল। 'কোন ভয়, কোন কষ্ট নেই, কিছুই না।' পাশের ছোট টেবিলটা একটা শাদা কাপড়ে

ঢাকা ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেলে বলল, 'দেখ, একবার তাকিয়ে দেখ, তোমার আর আমার জন্তে কি এনেছি।'

ছুটো সিরিঞ্জ আর অনেকগুলো ইনজেকশানের অ্যামপুল টেবিলটার ওপরে পড়েছিল। এসথার জিজ্ঞেস করল, 'এসব কি?' উপহার দেবার মতো করে একটি অ্যামপুল হাতে তুলে নিয়ে অসওঅলড্ বলল, 'মরফিয়া।'

'মরফিয়া?'

'নিশ্চয়।' সজোরে চিৎকার করে উঠে অসওঅলড্ ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর মুখের যেখানে সেখানে চুম্বন করতে করতে বলল, 'এ যে কী চমৎকার জিনিস, তোমার কোন ধারণা নেই এসথার। আমরা ছুজনে অনেক উঁচুতে উঠে কোমল মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াব।'

এসথার মুগ্ধ হেসে বলল, 'সত্যি, কি মজা! আচ্ছা, তার পরে কি হবে?'

'তার পরে আমরা ঘুমোব।'

এসথার যেন অনেক দূর থেকে বলে উঠল, 'আর কখনও জাগতে হবে না?'

'না, আর কোন দিনও জাগতে হবে না।'

এসথার গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'বেশ!'

অসওঅলড্ বলল, 'তুমি আমাকে যা দিয়েছ, আমি তোমাকে তাই ফিরিয়ে দেব এসথার। তুমি একটি ঘরের দরজা খুলে আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছ। আর কেবল একটি পা এগিয়ে আমি তোমাকে অন্য একটি ঘরের দরজা পেরিয়ে যেতে সাহায্য করব। তখন তুমি দেখবে যে এ ছুইই সমান, কোন তফাৎ নেই।'

এসথার এবার চোখ বন্ধ করল। একটি হাসির আভা এসে ওর মুখখানাকে অপরূপ সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছে।

অসওঅলড্ একলাফে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এবার প্রস্তুত হও।'

অসওঅলড্ যখন টেবিলের জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, এসথার তখন চুপ চাপ সিরিঞ্জের শব্দ আর কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনছিল। তারপরে গভীর স্তব্ধতা। এবার সিরিঞ্জ ভরা হয়ে গেছে। প্রগাঢ় অন্ধকার এসে এসথারকে ঢেকে ফেলল। সে যেন বহু বহু দূরে মিলিয়ে গেল। সে এখন সম্পূর্ণ একা। তার রুদ্ধ চোখের অন্তরালে স্থানকালের অতীত হয়ে সে যেন অবস্থান করছে। অসওঅলড্ ওর বাহুতে হাত রেখে ডাকল, 'এসো।'

অনেক দূরের পথ থেকে যেন এসথার ফিরে এসেছে। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেলল। অসওঅলড্ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতের সিরিঞ্জটি চকচক করছে। সকৃতজ্ঞভাবে অসওঅলডের দিকে তাকিয়ে ও একটু হাসল, সিরিঞ্জটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এসথার বলল, 'না, না, এ কিছুতেই হতে পারে না। এ পথ যতই লোভনীয় হোক, তুমি বা আমি—কেউই এই ভুল পথে চলব না। আমরা তো অবাধ কল্পনাপ্রবণ নই। হয়তো তুমি এখনও বেঁচে থাকবে। আবার হয়তো নাও বাঁচতে পার। কিন্তু আমাদের পরে যে আরও হাজার হাজার মানুষ আসবে। যে-মৃত্যু আমাদের সামনে অপেক্ষা করে আছে, সে-মৃত্যুই আমাদের কামনা। আমাদের মৃত্যুর পিছনে আমি মহান একটি জাগরণের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমার যুগের কুয়াশা ভেদ করে আমি নিজের চোখেই যেন অনাগত ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি যা আসছে তা আমাদের মৃত্যুকে সার্থক করে তুলবে। এই মুমূর্ষু-যুগ নিষ্করুণভাবে আমাদের জীবনের অবসান ঘটাচ্ছে। কিন্তু আমি আমার একার জন্যে সহজ মৃত্যু কামনা করব না। কারণ ক্ষেতের প্রান্তে যে-বীজ ছিটকে পড়ে, তাতে ফসল হয় না। আমি ভাবিকালের ব্যাপক উর্বর মাটিতে পড়তে চাই।'

অসওঅলডের কাছে গিয়ে এসথার মায়ের মতো স্নেহভরে

দু-হাতে ওর মুখখানি তুলে ধরল। বিদায় জানাতে গিয়ে অনেকক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বলল, 'অসওআলড্, আমার জীবনের অন্তে পুরুষের শেষ প্রেম পেলাম তোমারই কাছে।'

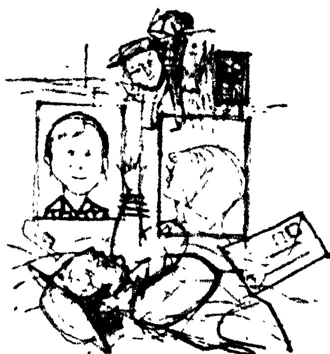
একটি লরী এসে থামল মেয়েদের ঘরের সামনে। তার ভেতর থেকে ডাক্তার এবং কারারক্ষীরা নামলেন কয়েকটি কুকুর এবং বন্দুক সঙ্গে নিয়ে। দুজন কারারক্ষী আর ডাক্তার ভিতরে ঢুকলেন। আধঘণ্টা পরে আঠেরোটি মেয়ে কয়েদী নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে এলেন। ধীর শান্তভাবে মেয়েরা লরীতে গিয়ে উঠল। দলের মধ্যে সকলের পেছনে ছিল এসথার। সে যেন চোখ বন্ধ করে চলেছে, কারণ তার দৃষ্টি বোধহয় ঝাপসা হয়ে আসছিল। ডাক্তার অতি বিনীত হাস্যে লরীর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ফোরম্যান আর্নেস্টের কাছে পরে শোনা গেল, গ্যাস চেম্বারের সামনে মৃত্যুপথযাত্রিদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় বাঁচার জন্যে শেষ সংগ্রাম করেছিল। কারণ সেখানকার মাটি এবড়ো খেবড়ো, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। গ্যাস চেম্বার থেকে আশি মিটার দূরে ওরা একটা জায়গায় দেখল রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—আর তার কাছেই একটা ছেঁড়া পোশাকের টুকরো পড়ে। পায়ে দলা নোংরা আকাশ-নীল রেশমী কাপড়ের একটা ফালি—তাতে বড় বড় শাদা চন্দ্রমল্লিকা।

অনুবাদ। মলিনা রায়

খোকা

ক্রিস্টা ওটেন



গণতান্ত্রিক জার্মানীর লেখক ক্রিস্টা ওটেন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। হয়তো লেখক হিসেবে প্রথম শ্রেণীরও নন। তবু তাঁর এই অনবদ্য গল্পটিকে বাদ দিতে পারিনি কোন মতেই। রণক্ষেত্র থেকে বাবা আর ফিরে এলেন না, ফিরে এল শুধু তাঁকে পাঠানো খোকার ছবিটা।

'আমি কি তোর সঙ্গে খানিকটা যাব'—জানি না কথাকটা বলার সময় গলাটা খানিকটা কাঁপল কি না। শেষ জিনিসটি তুলে নেবার সময় ও একবার চোখ তুলে তাকাল। অমনটি ওকে দেখে আসছি বরাবর। পাতলা একহারা চেহারা, কিন্তু চোখে এক এক সময় আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা ফুটে ওঠে—ঠিক ওর বাবারই মতো। ও বলল, গলার স্বরে হয়তো একটা মৃদু ধমক, হয়তো বা একটু বেশী দৃঢ়তাই ছিল, 'তুমি এত উতলা হোচ্চ কেন মা-মণি, আমি তো এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছি।' আমি অন্যদিকে ছুটে গেলাম। আট তলার এই ফ্ল্যাটের জানলার বাইরের উন্মুক্ত বাতাসে যদি বুকটা হালকা হয়। ওর পায়ের শব্দ বাইরে মিলিয়ে গেল। আঃ আকাশে কী সুন্দর হালকা মেঘের টুকরোগুলো সাঁতার দিচ্ছে। কিন্তু, লিফ্‌ট, এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাঁচতলায়, না এই তিনতলায়… সময়ের কি পাখা আছে! কোথা থেকে যে কেমন করে ছুটির তিনটি দিন কেটে গেল! আর কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই নিচের ফটক দিয়ে ওর অপসৃয়মান চেহারাটা আমার চোখে পড়বে। আর চলতে

চলতে যদি হঠাৎ ভুল করে একবার ওপরের দিকে চোখ তোলে।
ঠিক যেমনটি করেছিল মাস দেড়েক আগে, প্রথম বিদায়ের সময়।
চোখের সামনে যেন আবার দেখতে পাচ্ছি সেই দিনটি। প্রবেশিকা
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে ও এসে দাঁড়িয়েছিল। 'মা-মণি
আমি গণবাহিনীতে ভর্তি হব।' ওর কথায় আমার সেদিন গর্ব
হয়েছিল। আমি যে ওকে এমনি করেই বড় করে তুলেছি। আমি
জার্মান মেয়ে। যুক্তি আমি মানি। কিন্তু, সব মায়েরই বুকের
ভিতরটা বোধ হয় এমনি দুর্বল! সেবার যাবার সময় যেমন, এই
বারের মুহূর্তগুলিতেও সব যুক্তি, সব শক্তি যেন আমার ভেঙে পড়ছে,
মা-গো!

...তাকে যখন ভালো বেসেছিলাম! রুদি ডিয়েট্রিক, আসবাব-
পত্রের কারিগর। ওর তখন বয়স বোধ হয় সতেরো আঠেরো, আর
আমার পনেরো। তখন আমি লুকিয়ে চুরিয়ে পুতুল খেলতাম।
আর সে স্বপ্ন দেখত ভবিষ্যতের—ছোট্ট একটি কবোষ্ণ নীড়ের।
আর আমি? এখনও হয়ত লজ্জায় আনত হবে চোখের পাতা।
ফিসফিস করে বলতাম, আমার কিন্তু চাই বেশ টুকটুকে একটি—না
দুই, তিন, না না আট-আটটি! দমকা বাতাসের মতো ও হেসে উঠত,
বিয়ের পরে পাঁচ-ছ বছর লঘুপক্ষ দিনগুলি এমনি ভেসে গেল।
সুখের সময় এমনই বুঝি দেখতে না দেখতে কেটে যায়! হায়, এমন
সময়ে এল ভয়ঙ্কর সেই দানবটা, মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়ে
গেল কত নীড়—ঠিক আমাদেরই মতো। ওই নরম শান্ত মানুষটাও
সেদিন নিজের সামরিক পোশাকের দিকে তাকিয়ে রাগে ফেটে পড়ে-
ছিল, 'আমি ঘৃণা করি এই জামাটিকে—চাই না, চাই না আমি।'

যখন সে যুদ্ধক্ষেত্রে, চিঠি লিখেছিলাম। ইম্মো তখন জঠরে।
লিখেছিলাম, 'ওগো, তোমার সন্তান আর কদিনের মধ্যে সূর্যের আলো
দেখবে। তুমি কবে আসবে? আর...আর আমার এখনকার
এই বেঢপ চেহারাটা যদি তোমার চোখে পড়ে, আর কি আগের মতো

ভালো লাগবে!' ওর উত্তর পেয়েছিলাম, 'কী বোকা আর ছোট্টটি রয়ে গেছ তুমি! দুজনেই যে আমার আদরের!' উপদেশ দিয়েছিল যেন শরীরের যত্ন নিই আর খোলা হাওয়ায় যেন সকাল-সন্ধ্যায় একটু বেড়াই।

ইম্মো এল। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। বোমার ঘায়ে শহরের বাড়িঘর চুরমার হয়ে গেল। ওকে বুকে করে নিয়ে আমি পালিয়ে বেড়িয়েছি। ইম্মো হাঁটতে শিখল। আর তার পত্রের সংখ্যা কমে এল।...ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের পাতা।...মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ওকে ধরেছিল দুরারোগ্য আর্থ্রিটিস রোগে, দিবারাত্র ট্রেঞ্চে থেকে সৈন্যদের যা হয়। ইম্মো বড় হতে লাগল।

যুদ্ধ শেষ। কিন্তু সে এল না। শুধু সেই খামটিই একদিন ফিরে এল। ওর ভেতরে ছিল আমারই পাঠানো বাচ্চা ইম্মোর সেই ছবিটা। ওর পকেটেই ছিল। যুদ্ধবন্দীদের শিবির থেকে ওরা করুণা করে পাঠিয়ে দিয়েছে! ও আর আসবে না!

তারপর! নতুন জীবন। এখন আমি শিক্ষয়িত্রী। বাচ্চাদের পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে আমার চোখ কখনও জ্বলে ওঠে, শেখাই যুদ্ধকে ঘৃণা করতে। আমি আমাদের ছেলেকে বীর করে তুলতে চাইনি। চেয়েছি ও যেন একটি পরিশ্রমী, খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠে। একদিন পথে ওর খেলা দেখে আমার কী যে আনন্দ হয়েছিল! আরও কটি ছেলের সঙ্গে ও চলেছে, হাতে ওর ছোট্ট একটা লাঠির মাথায় লাল নিশান।

আর একটা খেলা ছিল ওর। নিজের তৈরি খেলার পিস্তল নিয়ে ও কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করত। একদিন কেড়ে নিয়ে ধমক দিয়েছিলাম, 'ছিঃ, যুদ্ধ করা খারাপ!' পরক্ষণেই ওর কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম, 'মা-মণি, আমি তো মানুষ মারছি না, ওরা যে শত্রু, আমার দেশ আক্রমণ করলে লড়ব না!'

আমাদের সেই খোকনই একদিন এসে বলেছিল, 'মা-মণি. আমি যাই।' আমার বুকের ভিতরটা আথালি-পাথালি করে দিয়ে সামরিক

পোশাক পরে ও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে গিয়েছিল। মনকে বুঝিয়েছিলাম, ও তো ঠিক পথেই চলেছে। ধীরে ধীরে আমাদের দেশে গড়ে উঠছে নতুন এক অর্থনীতির বুনিয়াদ। খেটে খাওয়া মানুষের কত স্বপ্ন একদিন সফল হবে! ও ঠিকই বুঝেছিল। ও যে আমাদেরই খোকন। হয়ত মায়ের মন দুর্বল বলেই কেবল চোখের জল বাধা মানেনি!

যখন ওর প্রথম চিঠি পেলাম, কী খুশিই যে হয়েছিলাম! বাড়ির জন্যে ও পাগল। আর···সেই যখন ছোট্টটি ছিল, তখনকার মতো ঝাঁপিয়ে এসে আমার মুখে চুমো খেতে চায়— দুষ্টু! লিখেছিল, 'মা-গো, আমি আমাদের দেশ আর পবিত্র সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করব···!' সেদিন ছেলের ছবি বুকে নিয়ে টেবিলে ওর ছবির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। কী আশ্চর্য মিল—সেই কপাল সেই ভ্রু! জীবনের প্রতি দুজনেরই ভালবাসা। কিন্তু ওরা ওকে বাধ্য করেছিল হাতে রাইফেল নিয়ে মানুষ খুন করতে! আর আমাদের খোকা? সে তার দেশ, তার মা, শান্তিকামী দেশবাসীদের আনন্দ সুখের সতর্ক প্রহরী!

···আঃ কি সুন্দর ওই সাদা মেঘের ভেলাগুলো। কেমন হালকা হাওয়ায় ভেসে চলেছে। ইশ্, দেখ দেখ, নিচের রাস্তায় খুশি খুশি বাচ্চাটা কলকল করে ধরতে যাচ্ছে আর একটা বাচ্চাকে! আর এতক্ষণে···ওই যে! আমার ইগ্মো এখন ফটক থেকে বেরিয়ে এল। কয়েক পা হাঁটল। কোমরবন্ধটা একবার ঠিক করে নিল। তারপর গর্বিত চোখে ধীরে ধীরে ও মুখ তুলল। আমি আর ও—এত উঁচু থেকে কত নিচে। কিন্তু আশ্চর্য, দৃষ্টিরেখার সন্ধিতে আবদ্ধ আমরা দুজন। আমি আর আমাদের সেই ছোট্ট খোকা!

অনুবাদ। অনবদ্য সান্যাল

আমাদের বিশ্বপিতা

ভালেনতিন কাটায়েভ



সাম্প্রতিক রাশিয়ান সাহিত্যের এক আশ্চর্য শক্তিশালী লেখক ভালেনতিন কাটায়েভ। জন্ম ১৮৯৭ সালে, ইউক্রেনে। বস্তু রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরদিনই কবিতার মতো কাজ করে গেছে তাঁর নানান চিত্রকল্পে। বর্তমান গল্পটি ওডেসায় নাৎসী অবরোধের পটভূমিতে রচিত।

'উঃ কি ঠাণ্ডা! আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে!'

'ওমা! আমারও তো ঘুম পাচ্ছে। নাও, এখন আর দুষ্টুমি করে না। তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নাও! ঠিক আছে, এর ওপরেই স্কার্ফটা জড়িয়ে নাও। এবার টুপি পর। বুটজোড়া নিয়ে এস। দস্তানা দুটো কোথায়? সোজা হয়ে দাঁড়াও, লক্ষ্মী সোনা... এত ছটফট করে না।'

ছেলেটির সাজা হয়ে যেতেই, মা তার হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তখনি ঘুমে ছেলেটির চোখ প্রায় জুড়ে এসেছে। বয়স তার চার বছর। ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। নিশান্তিকার আলো তখন একটু একটু করে ফুটে উঠছে। বাতাসে আবছা নীল কুয়াশার ঘন আবরণ। মা শিশুর গলার চারদিকে স্কার্ফটা ভালো করে জড়িয়ে দিল। কলারটা টেনে আর একটু ওপরে তুলে দিল। তারপর আদর করে চুমো দিল ওর ঘুম জড়ানো তুলতুলে ছোট্ট দুটি গালে।

কাঠের বারান্দা থেকে ঝুলছে বুনো আঙুরের শুকনো লতাপাতা। হিমেল তুষারের চাপে কাঁচের সার্সিগুলো ফেটে চৌচির। তাপমাত্রা

হিমাঙ্কের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী নিচে। পায়ের তলায় মাটি জমাট বরফ।

'মামণি, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'বললাম তো, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।'

'তাহলে সুটকেস নিলে কেন?'

'আমাদের দরকার হবে বলে। এখন চুপ করে হাঁট। এত কথা বললে শীতবুড়ি ধরে নেয়। বরং দেখে দেখে পথ চল...ঐ তো দেখ না কেমন বরফ পড়ছে।'

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তকমা আঁটা দারোয়ান, গায়ে ভেড়ার লোমের কোট। ওর মুখের দিকে না তাকিয়েই ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল। দারোয়ান ওদের পেছনে ভারি ফটকের ছোট দরজাটা বন্ধ করে দিল। ওরা রাস্তায় এসে পড়ল। পায়ের নিচে পাথর বাঁধানো পথটা পিছল। তুষারে ডালপালা সম্পূর্ণ ঢেকে যাওয়া অ্যাকাসিয়া গাছগুলোর তলা দিয়ে ওরা হেঁটে চলল।

মা আর ছেলের পোশাক প্রায় একই রকম দেখতে। স্ট্র-বেরী রঙের বেশ সুন্দর কৃত্রিম লোমের কোট, ফেল্টের জুতো, উজ্জ্বল পশমের দস্তানা। শুধু মার মাথায় রঙিন ওড়না বাঁধা, আর ছেলের মাথায় কান পর্যন্ত ঢাকা লোমের টুপি। রাস্তাটা নির্জন। ওরা যখন মোড়ের মাথায় এসে পৌছল, লাউডস্পীকারটা হঠাৎ এমন বেয়াড়াভাবে বেজে উঠল যে মা চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল এখন প্রাতঃকালীন প্রচারের সময়। প্রতিদিনের মতো আজও মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল তার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। শুরু হল নতুন একটা দিনের। ছেলেটি বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকাল, 'ওটা কি মামণি, মোরগ?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

'ওর ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'একটুও না। এবার চল। দেখ আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

লাউডস্পীকার থেকে শোনা গেল বাচ্চাদের মতো কচি কণ্ঠস্বর:

সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! কণ্ঠস্বরটি কেঁপে কেঁপে বাতাসে হারিয়ে যাবার পর শোনা গেল রুমানিয়ান ভাষায় শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রার্থনা :

আমাদের বিশ্বপিতা অসীম করুণাময়, যিনি আছেন অন্তরীক্ষে
তাঁর নামে আমরা তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম···

শিশুর হাত ধরে টানতে টানতে প্রায় ছুটেই মা রাস্তাটা পেরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল, যেন মিষ্টি কণ্ঠস্বরটা তার পেছন পেছন ধেয়ে এল। অথচ ততক্ষণে থেমে গেছে প্রার্থনা। সমুদ্রের দিক থেকে বয়ে এল হিমেল হাওয়া। পুলিস চৌকির জ্বালানো আগুনের চারপাশের আবছা কুয়াশা মনে হল যেন একরাশ গোলাপের ঝরা পাপড়ি। আগুন পোহাচ্ছে সশস্ত্র জার্মান সৈনিকেরা। চকিতে মা অন্যদিকে ঘুরে গেল। বাচ্চাটা হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নিল! ছোট্ট গালদুটো তার চেরীর মতো লাল। নাকে জমে উঠেছে তুষারের ফোঁটা। ছোট্ট হাতটা তখনও শক্ত করে মার মুঠোর মধ্যে ধরা।

'মামণি, আমরা এখনও বেড়াচ্ছি?'

'হ্যাঁ সোনা, আমরা এখনও বেড়াচ্ছি।'

'এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে আমার ভাল লাগে না।'

'দুষ্টুমি করে না।'

খামার বাড়ির মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি পথে ওরা এসে পড়ল অন্য একটা রাস্তায়। স্বচ্ছ হয়ে এসেছে ভোরের আলো। তুঁতে রঙ কুয়াশা-ঘন আকাশের গায়ে গোলাপী আভা। এই প্রথম রাস্তায় মানুষ দেখা গেল। নিঃশব্দ, মন্থর পায়ে সবাই চলেছে একই দিকে। প্রত্যেকেরই সঙ্গে রীতিমত পোঁটলা-পুঁটলি। কেউ কেউ ঠেলে নিয়ে চলেছে দু চাকার ছোট ছোট গাড়ি। দু একটা স্লেজও চোখে পড়ল। শহরের নানান দিক থেকে আসা পিঁপড়ের সারির মতো অজস্র ইহুদী—গন্তব্য তাদের একটাই। ওরা চলেছে পেরিসিপের

বন্দী-শিবিরে। শিবিরটা সমুদ্রের ধারে, শহরের একেবারে নির্জন প্রান্তে। চলমান সার্কাসের মতো অজস্র ছোট ছোট নোংরা তাঁবু। চারদিকে মরচে পড়া কাঁটা-তারের বেড়া। ইঁদুরের কলের মতো একটাই মাত্র প্রবেশ পথ। কোলাহলহীন, নিঃশব্দে ইহুদীরা এগিয়ে চলেছে পেরিসিপের পথে। রেল ব্রিজটা ওরা পেরিয়ে গেল। ওদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ, টাইফাসে জীর্ণ, তাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হল স্ট্রেচারে। যারা দুর্বল, হাঁটতে পারছে না, তারা দাঁড়িয়ে রইল ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে। ওদের সঙ্গে কোন সশস্ত্র প্রহরী নেই। ওরা জানে যারা স্বেচ্ছায় এল না, বা যারা আত্মগোপন করে রইল— তাদের গুলি করে মারা হবেই। তাই ওরা আজ বন্দীশিবিরমুখী।

ওরা জানে ইহুদীদের আশ্রয় দেওয়ার শাস্তি মৃত্যু। আশ্রিত কোন ইহুদীর জন্যে বাড়ীর সবাইকে নির্দ্বিধায় গুলি করে মারা হবে। তাই শহরের প্রতিটি প্রান্ত থেকে—নর নারী শিশু বৃদ্ধ, চলমান সংসার চলেছে ব্রিজ পেরিয়ে কুয়াশা জড়ানো বনাঞ্চল অতিক্রম করে শিবিরের দিকে। মাঝে মাঝে জার্মান রুমানিয়ান সৈনিকের চৌকি ঘিরে জ্বালানো আগুনের লেলিহ শিখায় প্রতিফলিত হচ্ছে ঘন তুষার। ওরা ইহুদীদের দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না, নিজেদের হাত পা কান গরম রাখায় ব্যস্ত।

এমন ভীষণ তুষারপাত সচরাচর চোখে পড়ে না। এমন কি উত্তরাঞ্চলেও না। গত ত্রিশ বছরে এমন তুষারপাত ওডেসায় আর কখনও হয় নি। কুয়াশা আর ঘননীল মেঘের মাঝে সূর্যের অস্পষ্ট আভাস। পথের মাঝে চড়ুয়ের মৃতদেহগুলো জমে শক্ত পাথর। দিগন্তলীন সমুদ্র এখন যেন শুভ্র তুষারের বিশাল একটা সাম্রাজ্য। আর হু হু করে হিমেল বাতাস বইছে তার বুক থেকে।

মহিলাটিকে রাশিয়ানদের মতো দেখতে। বাচ্চাটাকেও। ওর বাবা রাশিয়ান, রেড আর্মির অফিসার। মা ইহুদী। ওদের দুজনের আজ ওই বন্দী শিবিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যায়নি। ওখানে

যাওয়া মানে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া। তাই বাচ্চাটার হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল যতক্ষণ না সবকিছু থিতিয়ে আসে, কোন রকমে শহরের নির্জন রাস্তায় ঘুরে দিনটা কাটিয়ে দেবে। প্রথমে বাচ্চাটা বেশ শান্তই ছিল, ভেবেছিল সত্যিই বুঝি ওরা বেড়াচ্ছে। এখন ঘ্যানঘ্যান শুরু করল, 'মামণি, আমরা সবসময় খালি বেড়াচ্ছি কেন?'

'আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি বলে।'

'তাহলে এত জোরে জোরে হাঁটছ কেন? আমি আর পারছি না!'

'আমিও তো পারছি না, সোনা। চল আর একটু এগিয়ে যাই।'

মার মনে হল সত্যিই ও খুব দ্রুত হাঁটছে, প্রায় ছুটছে, যেন কেউ ওর পিছু নিয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করল স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে। বাচ্চাটা মুখের দিকে তাকিয়ে মাকে যেন চিনতে পারল না। শুভ্র কপাল ঘিরে ওড়নার প্রান্তে ছোট ছোট বরফের কুচি। বিবর্ণ হিমেল ঠোঁট দুটো দাঁতে চাপা। উজ্জ্বল চোখের মণিদুটো ঠিক ওর খেলনার ভাল্লুকের মতো। বাচ্চাটা চোখ তুলে তাকাল, তবু যেন মাকে দেখতে পেল না। ভয়ে ও ককিয়ে উঠল, 'মামণি আমি বাড়ি যাব। আমার খিদে পেয়েছে।'

বাচ্চাটাকে ও একটা খাবারের দোকানে নিয়ে এল। কিন্তু ধূসর রঙের ওভার কোট পরা দুজন রুমানিয়ান সৈনিককে ব্রেকফাস্ট করতে দেখে ও চমকে উঠল। ওর কাছে কাগজপত্র কিছুই ছিল না। যদি জানতে পারে, সোজা পাঠিয়ে দেবে বন্দী শিবিরে। তাই ভুল করে ঢুকে পড়েছে এমনভাবে ক্ষমা চেয়ে ও দ্রুত ছিটকে বেরিয়ে এল। বাচ্চাটাও ছুটল মার পাশে পাশে। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে কেঁদে উঠল। পরের দোকানটা খালি। ভেতরে প্রবেশ করে ও অনেকটা স্বস্তি পেল। বাচ্চাটার জন্যে এক বোতল গরম দুধ আর একটা রোল কিনল। এ দুটোই বাচ্চাটার প্রিয়। উঁচু টুলের ওপর সে পা ঝুলিয়ে বসল। উজ্জ্বল দু চোখে চাপা খুশির আমেজ।

মা কিন্তু ভেবেই পেল না এবার কি করবে। বিরাট লোহার ডেকচিতে দুধ ফুটছে। সারা ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে উষ্ণ একটা উত্তাপ। ওর মনে হল দোকানী ভদ্রমহিলার চোখে রয়েছে প্রচ্ছন্ন একটা কৌতূহল। তাই ও তাড়াতাড়ি পয়সা মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ভদ্রমহিলা জানলার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে ওদের স্টোভের পাশে একটু বসে যাবার জন্যে উপদেশ দিল। গনগনে স্টোভের পাশটা সত্যিই লোভনীয়। গরমে বাচ্চাটা তখন ঢুলছে। বুজে এসেছে তার চোখের পাতা। তবু মা আর দেরী করল না। দোকানীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে গিয়ে বাচ্চাটা চৌকাটে হোঁচট খেল। ঘুম তখন তার উধাও। মার দিকে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল। তুষার ছাওয়া বিশাল বিশাল পাইন গাছের নিচে দিয়ে দুজনে আবার পাশাপাশি হেঁটে চলল।

'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, মামণি।'

হিমেল হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে সে বলল। মা যেন না শোনার ভান করল। ও জানে এভাবে হাঁটা কি দুঃসাধ্য, তবু শহরে বাস করার অধিকার ওদের নেই! এখানে ওরা এসেছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস দুয়েক আগে। তারপর আর অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ঠিক সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

'আমার পা ব্যথা করছে, মামণি...'

বাচ্চাটা আবার ঘ্যানঘ্যান শুরু করল। মা তাকে রাস্তার একপাশে সরিয়ে এনে পাদুটো টেনে টেনে ম্যাসেজ করে দিল। হঠাৎ এই শহরে পাভলোস্কিদের কথা ওর মনে পড়ল। নভোরস্ক থেকে ওডেসায় আসার পথে ওদের সঙ্গে আলাপ। পাভলোস্কিদের তখন বিয়ে হয়েছে খুব অল্পদিন। তরুণটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আর ওর স্ত্রী ভেরা কারিগরি বিদ্যালয়ে কিসের যেন ট্রেনিং নিচ্ছে। স্টিমারেই ভেরার সঙ্গে ওর দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া আসাও করেছে। একবার ওরা চারজনে

খারকভ-ওডেসা ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল। পাভলোস্কিরা ওডেসার পক্ষে, ও আর ওর স্বামী চেয়েছিল খারকভ জিতুক। অবশ্য জিতেছিল ওডেসাই। উঃ সেদিন মানুষের সমুদ্রে, চিৎকার আর ধুলোর মেঘে নতুন স্টেডিয়ামটা যেন ডুবে গিয়েছিল! এখনো সে কথা ভাবতে ভালো লাগে। পাভলোস্কি এখন আর্মিতে। তবু ভেরা নিশ্চয়ই ওদের ফেরাবে না। এই অল্প কয়েকদিন আগেও আলেকসান্দ্রোভস্কি মার্কেটে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, দু-চারটে কথাও বলেছিল। কিন্তু বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে বেশীক্ষণ কথা বলা বিপজ্জনক। দু-তিন মিনিটের বেশী কথা বলতে দেয় না। সেদিনের পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ভেরা হয়তো এখন শহরেই আছে। সম্ভব হলে বাচ্চাটাকে ওখানে দু একদিনের জন্যে রেখেও আসা যেতে পারে। ওদের বাড়িটা শহরের একেবারে নিরি-বিলি প্রান্তে, ফ্রেঞ্চ বুলভারের কাছে। সেদিকেই ও ফিরে চলল।

'মা-মণি, আমরা বাড়ি যাচ্ছি?'

'না সোনা, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'ভেরাকাকীকে তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা সেখানে যাচ্ছি।'

'বাঃ কি মজা!' এই প্রথম সে যেন মনের মতো একটা জবাব পেল, বেড়াতে ও ভীষণ ভালবাসে। স্ট্রোগানোভস্কি ব্রিজ পেরিয়ে ওরা এগিয়ে চলল বন্দরের দিকে। ব্রিজের ওপর থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ল দিগন্তলীন বরফে জমাট সমুদ্র। তার মাঝে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে ওডেসার বিখ্যাত বাতিঘর। ছবির মতো সুন্দর সাজানো সারিসারি রুমানিয়ান যুদ্ধ জাহাজ। দূরে তুষারমৌলী পর্বতমালা। সব মিলিয়ে দৃশ্যটা সত্যিই চমৎকার! তাছাড়া ভেরার ওখানেও কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে।

এখনও ওদের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। বাচ্চাটা ক্লান্ত, তবু উচ্ছল। মার আগে আগেই গটগট করে হেঁটে চলেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও সেখানে পৌঁছতে চায়। মাঝে মাঝে মা ওর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে। পাভলোস্কিদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল সারা বাড়ি সৈনিকেরা ঘিরে ফেলেছে। বাড়িটা বিরাট, ছোট ছোট কয়েকটা ফ্ল্যাটে ভাগ করা। গেটটা চেন দিয়ে বাঁধা। বুঝল অনুসন্ধান এবং গ্রেপ্তার দুইই চলছে। দ্রুত পায়ে বাড়িটা ওরা পেরিয়ে গেল। সৈন্যরা ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না। বাচ্চাটা আবার ঘ্যানঘ্যান শুরু করল। মা তখন বুকে তুলে নিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করল। বাচ্চাটা ঝিমিয়ে পড়ছে। গাঢ় হয়ে এসেছে বিকেলের রোদ। অন্য পথে মা আবার শহরের দিকেই ফিরে চলল। হঠাৎ মনে হল কয়েকটা ঘণ্টা সিনেমায় কাটাবে। সিনেমা আজকাল অনেক আগেই শুরু হয়। রাত্তির আটটার পর পথে বেরনো নিষিদ্ধ। ঐ সময়ের পর থেকে রাস্তায় কাউকে দেখা গেলে গুলি করা হয়।

সিনেমার মধ্যে সৈনিক আর বারবনিতাদের ঠাসাঠাসি ভিড়। ওর গা গুলিয়ে উঠল, ভীষণ ক্লান্ত মনে হল। তবু বাইরের রক্ত হিম করা হাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভাল। তাই কোনরকমে চোখ কান বুজে বসে রইল। মা ওর গলা থেকে মাফলারটা খুলে নিল। আর বাচ্চাটা মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। যুদ্ধের ওপর সংবাদ বিচিত্রা শেষ হবার পর, কমেডি জাতীয় কি যেন একটা শুরু হল। প্রকৃত কাহিনীর মাথামুণ্ড ও কিছুই বুঝতে পারল না। সারা পর্দা জুড়ে কেবল অজস্র রূপসী মেয়ের মাথা, চুলগুলো তাদের শিং-এর মতো চূড়ো করে বাঁধা। ভিড়ের মধ্যে কে একজন যেন হঠাৎ একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তারপর দুজনে ছুটতে ছুটতে এসে একটা স্পোর্টসকারে উঠে বসল। গাড়িটা ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাশের সিটে কান পর্যন্ত লোমের টুপিতে ঢাকা একজন জার্মান

সৈনিক মার কাঁধের ওপর ঝুঁকে এল। মুখে অ্যালকহলের তীব্র গন্ধ। ফোলা ফোলা নোংরা আঙুলে বাচ্চাটার গালে টোকা দিয়ে ওকে জাগাবার চেষ্টা করল—উঁহুঃ ঘুমিও না খোকন, ঘুমিও না। খোকন কিন্তু জাগল না। ঘুমের মধ্যেই মাথাটা শুধু অন্যপাশে ফেরাল। জার্মানটা তখন তার ভারি মাথা রাখল মার কাঁধে, এক হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরল। মা কিছু বলল না। ভয় হল পাছে যদি ওর পরিচয়পত্র চেয়ে বসে। বিশ্রী গন্ধে সারা গা ওর আবার গুলিয়ে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টা করল নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখতে। উৎকর্ণ হয়ে চুপচাপ ও বসে রইল। একটু পরেই সৈনিকটা ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। যাক, বাঁচা গেল।

রূপসী মেয়েগুলোকে আবার পর্দায় দেখা গেল। হাসি হৈ-হুল্লোড়, সাঁজোয়া গাড়ি আর জার্মান সৈনিকের মিছিল। বিরাট একটা ফ্যাসিস্ট পতাকা উড়ছে আইফেল টাওয়ারের ওপর। সারা পর্দা জুড়ে হিটলারের প্রতিচ্ছবি। চোখ ঘুরিয়ে মুঠো পাকিয়ে ঠোঁট নেড়ে দ্রুত যে শব্দগুলো উনি ছুঁড়ে দিলেন—হাউ হাউ চিৎকার ছাড়া আর কিছুই মনে হল না।

অন্ধকার হলের মধ্যে সৈনিকেরা মেয়েদের কাতুকুতু দিল, মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল। যেমন গরম, তেমনি মানুষের গাদাগাদি। সিগারেট, রসুন, র' অ্যালকহল আর রুমানিয়ান চাঁটের তীক্ষ্ণ গন্ধে একাকার। তবু বাইরের ঠাণ্ডার চেয়ে এ অনেক ভাল। একটু অন্তত বিশ্রাম নিতে পেরেছে। বাচ্চাটাও খানিকটা আরামে ঘুমিয়েছে। কিন্তু প্রোগ্রাম শিগগির শেষ হয়ে গেল। ওরা আবার বাইরে বেরিয়ে এল। বাচ্চাটার হাত ধরে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলল। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কালো কালো বাড়ি-গুলোর ছাদে ঘন কুয়াশা। ঠাণ্ডায় চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। অদূরে কোথায় যেন একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। শুরু হয়ে গেছে পুলিশ পাহারা। আটটা বেজে গেছে। এবার বাচ্চাটাকে বুকে

তুলে নিয়ে ও ছুটতে শুরু করল। বাচ্চাটা ঘুমে ভারি। যেকোন মুহূর্তে শাস্ত্রীর ভয়ে মূর্চ্ছা যাবার মতো মায়ের অবস্থা। রাস্তার সবচেয়ে ধার ঘেঁসে ও এগিয়ে চলল। কুয়াশা জড়ানো বড় বড় পাইন আর অ্যাকাসিয়া গাছগুলো অশরীরীর মতো দাঁড়িয়ে। সারাটা শহর যেন অন্ধকারে মোড়া। নিস্পন্দ নিথর। মাঝে মাঝে অন্ধকারেই নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে কোন দরজা, আর বাতাসে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কামনা-বিধুর উদ্দাম বেহালার সুর। সরু ফিতের মতো এক একফালি সোনালী আলোর রেখা এসে পড়ছে দেহপণ্যাদের বাড়ির সামনে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর গায়ে। তারপরেই আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে শেভচেঙ্কো পার্কটা যেন আরও আশ্চর্য নির্জন। তুষার ছাওয়া ডালপালার ফাঁকে জোনাকির মতো টিপটিপ করছে নক্ষত্রের আলো।

চওড়া পিচের রাস্তা দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। বাঁদিকে বিশাল স্টেডিয়াম, যেখানে একদিন ওরা ফুটবল ম্যাচ দেখেছিল। স্টেডি-য়ামের ওপারেই সমুদ্র। অন্ধকারেও ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, অথচ অনুভব করতে পারল না তার সেই নিটোল নিস্তব্ধতা। পার্কটা ডানদিকে। পিচ বাঁধানো চওড়া পথটা নক্ষত্রের আলোয় চিকচিক করছে। নানা ধরণের বিশাল গাছগুলোকে ও এখন আলাদা করে চিনতে পারল। ক্যাটাপাসগুলো প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে তাদের লম্বা ঝুরি। এছাড়া পিরামিডের চূড়ার মতো অ্যাকাসিয়া পাইন ভিনিগার সাইপ্রেস। দূর থেকে ওগুলোকে দেখে মনে হয় যেন পুঞ্জিত মেঘমালা। প্রত্যিটা গাছের প্রান্তে তুষারের নিপুণ কারুকার্য। মা এখন মন্থর পায়ে হাঁটছে। সারিসারি শূন্য গ্যালারি। কিন্তু ওর একটাতে কে যেন বসে। ওর স্পন্দিত বুকে চলকে উঠল উষ্ণ রক্তস্রোত। মা আবার ফিরে তাকাল মূর্তিটার দিকে, ঝরা তুষারে অর্ধেক ঢাকা অস্পষ্ট একটা গাছের গুঁড়ির মতো। মাথাটা আসনের পেছনে হেলানো। মুখটা আকাশের দিকে তোলা। ওপরে সপ্তর্ষির ঝিকিমিকি।

এখন ওর আর ভয় করল না। এখন মনে হল এখানে ও অনেকটা নিশ্চিন্ত, কেননা ও সত্যিই ক্লান্ত।

পরের দিন নিশান্তিকায়, ভোরের আলো যখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠল, কয়েকটি লরী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল শহরের বিভিন্ন রাস্তায়, গতরাত্রের তুষার জমে যাওয়া মৃতদেহগুলোকে সংগ্রহ করার জন্যে। একটি লরী ধীরে ধীরে প্রবেশ করল শেভচেঙ্কো পার্কের ভেতরে। লরীটা দু বার থামল। একবার থেমে বেঞ্চ থেকে একটি বৃদ্ধের কঠিন দেহকে সংগ্রহ করল। দ্বিতীয় বার আর একটু এগিয়ে অন্য আর একটা বেঞ্চ থেকে তরুণী এবং একটি শিশুকে। ওরা দুজনে পাশাপাশি বসেছিল। বাচ্চার কাঁধটা জড়ানো মার বুকের কাছে। যেন জীবন্ত, কেবল ওদের মুখ দুটো শুভ্র তুষারে ঢাকা, চোখের পাতার নিচে শায়ার লেসের মতো তুষারের সূক্ষ্ম কারুকার্য। সৈনিকেরা যখন মৃতদেহ দুটোকে টেনে তুলল, বরফের ছাঁচের মতো ওরা উঠে এল, দেহের কোন অংশ এতটুকু শিথিল হল না। উপবিষ্ট নারীর দেহটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ওরা লরীর মধ্যে ছুঁড়ে দিল, দেহটা আছড়ে পড়ল বৃদ্ধের গায়ে। বসে থাকা শিশুটিকেও ওরা একইভাবে ছুঁড়ে দিল লরীর মধ্যে। দেহটা সশব্দে মার গায়ে আছড়ে পড়ে একটু লাফিয়ে উঠল।

লরীটা যখন চলতে শুরু করল, হঠাৎ রাস্তার লাউডস্পীকার থেকে একটা মোরগ ডেকে উঠল। শুরু হল নতুন আর একটা দিনের। প্রচারে শোনা গেল একটা বাচ্চার কচিকচি মিষ্টি কণ্ঠস্বর : সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত। কণ্ঠস্বরটি বাতাসে কেঁপে কেঁপে হারিয়ে যাবার পর শোনা গেল রুমানিয়ান ভাষায় শ্রদ্ধাজনিত প্রার্থনা :

আমাদের বিশ্বপিতা, অসীম করুণাময়, যিনি আছেন অন্তরীক্ষে তাঁর নামে আমরা তাঁকে জানাই……

অনুবাদ। অসিত সরকার

আশা

অজ্ঞাত



স্পেনের কারাগারে জন্ম ছোট্ট একটি মেয়ে, আশার। নরকের এই পঙ্কিল কদর্যতার মধ্যেই ও একটু একটু করে বড় হয়ে উঠল। ওর চোখ দিয়েই দেখানো হয়েছে একদিকে নাৎসী অত্যাচার, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের স্বাধীন আশা আকাঙ্ক্ষা। দুর্ধর্ষ এই গল্পের লেখক সম্ভবত বাধ্য হয়েই তাঁর নাম ব্যবহার করেননি।

ভারি বুটের আওয়াজ আর তালা খোলার শব্দ সেলের ভেতরের আবহাওয়াটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিল এবং দুর্বল একটা দেহ যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। 'বি' গ্যালারীর ২৬নং সেল।

স্পেনের বন্দীশালা। কারো কাছে এটা যমালয়ের দক্ষিণ দুয়ার, তবে বেশীর ভাগ লোকের কাছেই জীবন এখানে তিল তিল যন্ত্রণায় ভরা অন্তহীন মৃত্যুযাত্রা। ঘৃণার নিঃশ্বাস ছাড়ল দেয়ালগুলো। ভেতরে যারা সেই যন্ত্রণার ভুক্তভোগী আর বাইরে যারা সেই অত্যাচারের সাক্ষী, তাদের প্রত্যেকের ক্রুদ্ধ ঘৃণায় ভরা এই দীর্ঘশ্বাস।

ঐ অন্ধকার দালানটা দেখলেই দাঁতে দাঁত চেপে বসে, যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্তের স্বাদ লাগে মুখে। ঘৃণার যদি ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকত তাহলে অনেক আগেই এই গ্রেনাইট পাথরগুলো গুঁড়িয়ে যেত।

উনিশ'শ ছেচল্লিশ সালের ডিসেম্বরের এই সকাল বেলায় জেলের কশাইগুলো যে মেয়েটিকে কয়েদ করল তার নাম এন্টোনিয়া। আর পাঁচটা মেয়ের মতোই অতি সাধারণ ওর নাম। কিন্তু অপরাধটা নিশ্চয়ই রীতিমত গুরুতর। কব্জি দুটো ওর হাতকড়াতে বাঁধা, জামা-

কাপড় শতচ্ছিন্ন, মারের চোটে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। ধাক্কা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জেলের প্রহরীরা ওকে ঢুকিয়ে দিল এই ঘৃণিত দুর্গের ভেতর, যেখান থেকে একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরেছে কিনা সন্দেহ। প্রথম দরজাটা পেরিয়ে ভয়ে দিশাহারা হয়ে মেয়েটি চারিদিকে তাকাল। সবাই যা ভাবে মেয়েটিও নিশ্চয় তাই ভেবেছিল—না মরলে এই নরককুণ্ড থেকে রেহাই নেই।

ও স্বপ্নেও ভাবেনি ওকে কয়েদ করে রাখা হবে। সারা জীবনে ও তো কারো কোন ক্ষতি করেনি। বরং ভারী লাজুক প্রকৃতির মেয়ে ও, ছোট ছেলেটিকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। এমন সময় পুলিস এসে ওকে বিছানা থেকে টেনে হিঁচড়ে তুলল। জানাল 'রাজনৈতিক অপরাধে' ওকে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু রাজনীতির ও কিছুই বোঝে না, ওসব নিয়ে কোনদিন মাথাও ঘামায়নি।

এটা অবশ্য ঠিক যে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওর স্বামী গত বছর অবধি বন্দী ছিল। কিন্তু ও বেচারা 'ফ্যাসিজম' কাকে বলে তাই-ই জানে না। স্বামী আর দু'বছরের ছেলেটিকে নিয়েই ওর জীবন। শয়তানগুলোর মধ্যে একজন অভিযোগ করল, বাজারে তুমি মেয়েদের একটা প্রতিবাদ সভা করবার চেষ্টা করেছিলে।

'কি বলছ!' মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, 'আমি তোমাদের কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছি না···'

ওর গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে পুলিসটা গর্জন করে উঠল, 'চুপ কর্ কুত্তি।'

মেয়েটি তখনও পর্যন্ত মনেই করতে পারল না বাজারে কি হয়েছিল। হয়তো বা খিদের জ্বালা, জিনিসপত্রের চড়া দাম, সংসারের নানান দুঃখ কষ্টের অভিযোগ সে কোন সময় করেছে। স্বামীকে আর কচি ছেলেটাকে পেট ভরে খেতে দিতে না পারার দুঃখটাই ওর সবচেয়ে বেশী বাজে।

এখন মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে ও উপলব্ধি করল—আরও

অনেক যন্ত্রণা তাকে সইতে হবে। ওর কাছে তো এখন সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। সেলের ভেতরের গুমোট আবহাওয়ায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, মনে হল যেন এখনি মারা যাবে। শিউরে উঠল এন্টোনিয়া—আর মাসখানেকের মধ্যেই তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হবে। না, তার সন্তান এই কয়েদখানায় জন্মাতে পারে না, কিছুতেই না। এত বড় বর্বর অপরাধ কোন পুরুষই করতে পারে না।

কিন্তু অপরাধটা শেষ অবধি ঘটল। সেলে ঢোকার পর থেকে সেইদিন প্রথম তাকে বাইরে আনা হল। জেলের হাসপাতাল, ঠিক সেলের মতোই অন্ধকার নোংরা। সেখানে তার পরিচয় হল আর সব সমদুঃখভাগিনী অত্যাচারিতা সঙ্গিনীদের সঙ্গে। নবজাতক কন্যা। গরাদের ভেতরে কি যন্ত্রণাময় সেই জন্মদান। মেয়েটি জন্মাবার পর অন্য সব বন্দী মেয়েরা ঠিক করল ওর নাম রাখা হবে 'এস্‌পারান্‌জা', স্পেন দেশের ভাষায় যার মানে 'আশা'। তার মা প্রথমে ভাবল ওরা বুঝি ঠাট্টা করছে। যাদের জন্যে এই জীবন্ত সমাধি, তাদের আবার আশা কোথায়? একমাত্র পথ মৃত্যু, তবে যদি এই অসহ্য অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ঠিক ওর পাশের খাটিয়াটায় ছিল যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত এক বৃদ্ধা। ১৯৩৭ সাল থেকে সেই হতভাগিনী তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, যে কেউ দেখলেই বলবে ওর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু মরতে সে চায় না, এখনও তার জীবনে কত আশা।

বৃদ্ধা তার নোংরা বিচালিগাদার ওপর ভর দিয়ে উঠে এসে এন্টোনিয়াকে বলল, 'বোন, তুমি ভুল করছ, জীবনকে ভালবাসতে হবে নিবিড়ভাবে। বাইরের মুক্ত জনসাধারণের চেয়ে আমরা যারা কয়েদখানায় বন্দী, তারা অনেক বেশী করে ভালবাসব, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে জীবনকে আঁকড়ে থাকব। যে মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তাকে আমরা হার মানাব। আর তা করতে হলে আমাদের আশা চাই, বিশ্বাস চাই।

দেখছ তো অত্যাচারীর ঐ পাথরের দেওয়াল আর মোটা মোটা গরাদের বেড়াজালও নতুন জীবনের আবির্ভাবকে এই গোরস্থানের মধ্যেও ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। তবু এরা জীবনকে ঘৃণা করে। ওরা তোমাকে ঘৃণা করে। নিজের মৃত্যু কামনা করে ওদের পাশবিক সেই অত্যাচারের পথ সহজ করা ছাড়া তুমি আর কি করতে পার? আশা নিয়েই তো আমরা বাঁচব। আর তাই আমার মনে হয় এই নবজাতককে 'আশা' বলেই ডাকা উচিত।'

ছোট্ট আশার জন্মাবার খবরটা শত শত বন্দীদের মাঝখানে তখনি ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকের কাছেই আশা হয়ে দাঁড়াল এক দুর্লভ বস্তু। কেউ বুঝতে পারল না কেমন করে এরই ভেতর আশার জন্যে ছোট্ট একটি পালকের তোশক এসে পৌঁছল। সেলের ভেতর চুল বাঁধার ফিতে কেউ চোখেও দেখেনি কিন্তু এখন সেসব যেন কোন গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল, তার সঙ্গে আশার ছোট ছোট পোষাক তৈরির নানারকম সরঞ্জাম।

নবজাতকের আবির্ভাব মায়ের দিনগুলিকে কিছু কম দুর্বিসহ করে তোলেনি। তারপরেও আরও ষাট দিন তাকে ঐ সেলে থাকতে হয়েছিল। কেউ জানত না কোথা থেকে বাচ্চার জন্যে বোতলভরা দুধ হাজির হত। জেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিশ্চয়ই দুধ বিলির ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বন্দীদের নানা রকম নিজস্ব উপায় ছিল, যার ফলে বাচ্চার খাওয়ার অভাব একটা দিনও হয়নি।

কয়েদখানার মধ্যে জন্মেও সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক আগেই ছোট্ট আশার প্রচুর খেলনা জুটে গেল। প্রত্যেকটি সেলেই ওর জন্যে খেলনা তৈরি হতে লাগল। ছেঁড়া ন্যাকড়া, সুতো, কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে। যে মমতা আর যত্ন তাতে জড়িয়ে রইল তাতেই সেগুলো হয়ে উঠল অমূল্য। ছোট তোশকের বিছানার পাশেই খেলনাগুলো যেন জেলের নোংরা দেওয়ালের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

বছরের পর বছর যায়। এন্টোনিয়ার মেয়াদ পাঁচ বছর। আশার বয়স এখন সাড়ে তিন। সেল আর জেলখানার উঠোনটুকুর বাইরে সে কোনদিন যায়নি। মুক্তির কোন অর্থই সে বুঝত না। তার কাছে মুক্তির অর্থ জেলের আঙিনায় খেলা করা আর জেলখানার একটা কুঠরি থেকে অন্য কুঠরিতে ছুটোছুটি করে বেড়ানো।

প্রত্যেকটি বন্দী মেয়েই যেন ওর মা; কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর স্মৃতি থেকে সেই সব নিষ্ঠুর করুণ দৃশ্যগুলো তারা মুছে দিতে পারেনি। প্রথম দিনের ঘটনাটাই বীভৎস। একটি বন্দী মেয়েকে তার নিজের সেলে ফিরতে দেখেছিল রক্তে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। সবাই ছুটে এসে তাকে সেবা করতে লাগল।

আর একদিন তাকে আর সব বন্দী মেয়েদের সঙ্গে বাইরের উঠোনে জোর করে টেনে আনা হয়েছিল। জেলখানার লোকেরা, যাদের ও 'পাজী লোকগুলো' বলেই জানে, তারা ওদের সবাইকে ধাক্কা মারতে মারতে লম্বা বারান্দাটা দিয়ে নিয়ে উঠোনের এক কোণে এনে জড়ো করল। তারপর একদল প্রহরী লাঠি হাতে ওদের সবাইকে ঘিরে দাঁড়াল।

এমন সময় তারা আর একটি মেয়েকে এনে একটা থাম্বার সঙ্গে বেঁধে তার উপর কিল চড় ঘুষি বর্ষণ শুরু করল। মারের চোটে মৃতপ্রায় মেয়েটির সর্বাঙ্গ যখন রক্তে ভাসতে লাগল তখন তারা থামল। অন্য সব মেয়েরা এই দৃশ্য দেখে তীক্ষ্ণ করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। শেষ অবধি ছোট আশা এত ভয় পেল যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে ক্রমশ লুপ্ত চেতনার মধ্যেও সে টের পেল সেই লোকগুলো এবার তার মাকে আর তার বন্ধুদের ধরে মারতে শুরু করেছে।

সেলের ভেতরে জ্ঞান হতে যখন প্রথম চোখ খুলল, তখন তাকে বলা হল যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ও স্পষ্ট দেখল মায়ের আর কয়েকটি মেয়ের ক্ষত বিক্ষত মুখ থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। আর

কতকগুলি মেয়ে মাটিতে লুটিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

আশা এখন আরও একটু বড় হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই ওর মাথায় ঢোকে না কেন মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় সমস্ত বন্দীরা সমস্বরে কি এক অদ্ভুত গান গেয়ে ওঠে। আর প্রতিবারে একই প্রক্রিয়ার পুনারবৃত্তি ঘটে। ভোরবেলায় জেলার এসে তার একটি বন্ধুকে ধরে নিয়ে যায়। লম্বা বারান্দাটা দিয়ে যাবার সময় সে গান শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে আবার সবাই মিলে তার সঙ্গে সমস্বরে গেয়ে ওঠে আর সেলের দরজায় লাথি মারে।

কিছুক্ষণ পরেই বাজ পড়ার মতো প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যায়। ভয় পেয়ে যায় আশা। পরক্ষণেই বহুদূরে একটা চীৎকার হঠাৎ থেমে যায়। 'জিন্দাবাদ' কথাটা দিয়েই সেটার শুরু, তাই ঐ শব্দটা ওর স্মৃতিতে একেবারে গাঁথা হয়ে আছে।

আশা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, প্রত্যেকবার এই একই ব্যাপার ঘটে যাবার পরে, প্রথম যে মেয়েটি যাবার পথে গান গেয়েছিল সে আর ফিরে এল না কেন। সবাই ওকে বলে সেই বন্ধুটি জেলখানা থেকে চলে গেছে। এখন সে অন্যসব লোকজনদের সঙ্গে থাকবে যাদের আশা চেনেই না। কিন্তু ও অবাক হয়ে ভাবে, আমাদের বন্ধু যদি জেলখানার চেয়ে ভালো জায়গায় গিয়ে থাকে তবে সবাই মিলে এত কাঁদে কেন?

একদিন আশা দেখে সবাই জড়ো হয়ে একটা ছুটির দিন নিয়ে আলোচনা করছে। সব মেয়েরাই বলছে চোদ্দই এপ্রিল আসতে আর বেশী দেরি নেই। তার মানে ও কিছুই বুঝল না, তবু খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল।

অবশেষে উৎসবের দিন এল। আশা মনের আনন্দে ঘুমোতে ঘুমোতে উৎসবের স্বপ্ন দেখছিল, আচমকা একটা সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ভীরু চোখ দুটো মেলে ও দেখল তখনও চারদিক অন্ধকার। আশা বুঝতেই পারেনি ইতিমধ্যে ওকে কখন

উঠোনে আনা হয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে ও মাকে কোথাও দেখতে পেল না, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল কালকের দেখা কাপড়ের টুকরোগুলো একটা জানলা থেকে ঝুলছে। কাপড়গুলো একসঙ্গে সেলাই করে জুড়ে লাল হলদে বেগুনি রঙের একটা পতাকা বানানো হয়েছে। ও বুঝতেই পারল না সবাই মিলে একটা লেখা কাগজ আর ঐ সুন্দর জিনিসটার দিকে দেখিয়ে এত উল্লাস করছে কেন? এটাও বেশ সুন্দর লাগল আশার। এতক্ষণে তবু ওর ধারণা হল উৎসব বলে কাকে।

কিন্তু হঠাৎ আশা দেখতে পেল লোকগুলো বন্দীদের ধরে মারছে। ওর মাকে আর অন্য আট জনকে মারতে মারতে নিয়ে গেল। ওদের সবাইকে আশা চেনে। জেলের একেবারে ভেতর দিকে ওদের নিয়ে গেল। ওদের চীৎকার শোনা যেতে লাগল। এইবার সে শুনতে পেল সেই কথাটা যেটা এতদিন মাঝখানে হঠাৎ থেমে যেত। 'গণতন্ত্র জিন্দাবাদ'—চেঁচিয়ে উঠল অনেকের সঙ্গে ওর মা। এই গণতন্ত্র জিনিসটা কি একবার যার নাম করলেই ওদের হাতে এত মার খেতে হয়?

প্রথমটা আশা চেঁচিয়ে উঠতে গেল, ভাবল একবার বলে, 'মা তো ঐ রঙিন জিনিসটা জানলায় বাঁধেনি।' কিন্তু মা যে বারণ করে দিয়েছে 'একটি কথাও বলবে না'। আশা ভেবেই পায় না কেন যে মা সত্যি কথাও বলতে বারণ করে। কিন্তু ও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ পড়ল মায়ের দিকে, কি এক অদ্ভুত আনন্দের আলো মায়ের সমস্ত মুখে। প্রভাতী হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে সেই সুন্দর রঙিন টুকরোটা। আর জল-ভরা চোখে মা চেয়ে আছে সেই দিকে।

আশার কাছে রবিবারের দিনটা সবচেয়ে ভালো। এতটুকু ছোট্ট থেকে দেখে আসছে যে ঐ দিন বন্দীদের সবার কাছেই কত লোক দেখা করতে আসে। কিন্তু তাকে দেখতে কেউই আসে না।

মার কাছে শুনেছে অনেক দূরের দেশে তারও বাবা আছে, ভাই আছে, কিন্তু তাদের যথেষ্ট পয়সা নেই বলে তারা আসতে পারে না। আশা অবশ্য যারা দেখা করতে আসে তাদের কাউকেই দেখেনি। কিন্তু ওর কল্পনায় আঁকা হয়ে আছে, বড় বড় লোক—তাদের মস্ত পকেট জিনিসপত্রের ভারে ঝুলে রয়েছে। অবশ্য এই রকম মনে হবার কারণও আছে। প্রত্যেক রবিবারেই ওর বন্ধুদের সঙ্গে যে সব লোক দেখা করতে আসে, তারা ওকে অনেক মিষ্টি, খাবার, আরও কত সুন্দর সুন্দর জিনিস এনে দেয়। এত রাশি রাশি জিনিস ও পায় যে, সেসব পরের রবিবার পর্যন্ত চলে যায়।

একদিন তারও সঙ্গে দেখা করতে আসার মতোই ব্যাপার ঘটল। সেদিন ভোরবেলা যে লোকটা ওদের চিঠি বিলি করে সে ওকে একটা কাগজের প্যাকেট এনে দিল। খোলা আর ছেঁড়া কাগজের প্যাকেটের ভেতর থেকে সুন্দর সুন্দর কী সব দেখা যাচ্ছে। মা যখন প্যাকেটটা নিল, ওর মনে হল প্যাকেটটা ওর জন্যে নয়, লোকগুলো নিশ্চয়ই ভুল করেছে। কিন্তু মা বললেন ওটা তারই। ফ্রান্স থেকে এসেছে।

'ফ্রান্স? সে আবার কী?' অবাক হয়ে আশা জিজ্ঞেস করল।

'ফ্রান্স একটা দেশ। এখান থেকে অনেক দূরে সেই দেশ।' মা বলল, 'ঠিক যে কোথায় তা অবশ্য আমিও জানি না, কিন্তু আমি বরাবর বলতে শুনেছি যে ফ্রান্সের শ্রমিক আর জনসাধারণ আমাদের আর আমাদের বন্ধুদের খুব ভালবাসে। স্পেনের অনেক মানুষ সেখানে থাকে, আমাদেরই মতো স্পেনের মানুষ…'

'কিন্তু ওরা তো আমাদের চেনে না,' আশা প্রতিবাদ জানাল।

'চেনে না তো জিনিস পাঠাতে যাবে কেন?'

শেষ পর্যন্ত যখন দেখল যে প্যাকেটটা সত্যিই ওর, তখন খুলে ভেতরের জিনিসগুলো একে একে বার করতে শুরু করল। কী আশ্চর্য! দুটো জামা, চকোলেট, মিষ্টি আর একটা মস্ত পুতুল—

সত্যিকারের পুতুল।

উপহারগুলো যখন আশা কেবলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, মা কিন্তু তখন কোন একটা জামা থেকে পড়ে যাওয়া একটা লেখা কাগজ নিয়ে পড়ছে। একটু পরে মা ডাকল, মায়ের চোখের কোণে জল টল টল করছে, 'জান আশা, স্পেনের অন্য সব মেয়েরা তোমাকে এত সব উপহার পাঠিয়েছে। তারা ঠিক আমার আর যাদের এখানে দেখছো ঠিক তাদেরই মতো, ওরাও আমাদের কথা ভাবে। ওরা লিখেছে তোমাকে যদিও তারা চেনে না, তবু তোমাকে ওরা খুব ভালবাসে, আর তাই এই সব উপহার তোমাকে পাঠিয়েছে। আজ থেকে তুমি আরও অনেক নতুন 'মা' পেলে আশা। তুমি ঠিক বুঝবে না, কিন্তু তোমার মত স্পেনের প্রতিটা ছোট্ট ছেলেমেয়ের হাজার হাজার 'মা' আছে।'

আশা সত্যিই খুব ভালো বুঝল না কথাটা। তবে একটা কথা ওর কেবল মনে হতে লাগল—সেই নতুন পাওয়া মায়েদের ওরও তো কিছু পাঠানো উচিত। কিন্তু ওর যে কিছুই নেই। শেষ পর্যন্ত একটা কথা তার মাথায় এল। মাকে ডেকে বলল, 'ওরা আমাকে এত ভালবাসে, আমিও একটা কিছু করব ওদের জন্যে। আমি এবার লিখতে শিখব। তারপর চিঠি লিখব।'

আশার ইচ্ছে ছিল চিঠিটা মস্ত বড় হয়, কিন্তু এত ধৈর্য ওর কোথায়? মাত্র কয়েকটা কথা লিখতে শিখেই এক টুকরো কাগজে মায়ের সাহায্যে তার নতুন মায়েদের কাছে চিঠি লেখা হল :

'আমিও তোমাদের খুব ভালবাসি। এখানে তোমাদের কথা আমি অনেক শুনেছি। আমি তোমাদের 'ছোট্ট মেয়ে' শুনে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার অনেক ভালবাসা আর চুমো নিও!'

ছ-মাস পর একদিন সন্ধ্যেবেলা আশাকে আর তার মাকে খবর দেওয়া হল যে ছুটি লোক বাইরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'দুজন লোক।' বিস্ময়ে মা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'অসম্ভব! আমার

স্বামী তো কই এখানে আসার কথা জানায়নি ? তাছাড়া এখানে আর কাউকেই আমি চিনি না।'

আশা কিন্তু ভয় পেল। ভীষণ ভয় পেল। যত পুরুষ ও দেখছে, তাদের সকলেই 'পাজী'—শুধুই মাকে আর অন্য বন্ধুদের ধরে মারে, যন্ত্রণা দেয়। আশা নিজেই অনেকবার মার খেয়েছে আর মুখে ওরা তাকে যা তা বলেছে, আশা শুনেছে সেসব নাকি ভারি জঘন্য কথা। মা আর তার সঙ্গে যে দুজন লোক দেখা করতে এসেছে, তারাও নিশ্চয়ই ওদের ধরে মারবে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মার হাতটা শক্ত মুঠোতে ধরে আশা মস্ত বড় একটা ঘরে এল। ঘরটার মাঝখানে লোহার গরাদ দিয়ে দুভাগ করা। গরাদের ওধারে অনেক লোক। দুজন লোক ওর চোখে পড়ল। আশ্চর্য ! তারা একেবারে অন্য ধরনের, ওর দিকে কেমন স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে আছে আর হাসছে।

পরস্পরকে সম্বোধন করার পর লোক দুজন নীচু গলায় বলল, একটা কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ওরা এসেছে। 'কারখানা' কাকে বলে আশা তাই জানে না, তবু কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে রইল। ওদের মধ্যে অল্পবয়েসী ছেলেটি আশাকে একবারটি গরাদের ওধারে এনে দেবার জন্যে প্রহরীকে জানাল। এই নিয়ে বহুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর ওরা আশাকে যেতে দিতে রাজী হল। আশা কিন্তু তাতে বিশেষ খুশি হল না, কিন্তু লোকটি তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেল, আশা দেখল লোকটির চোখে প্রায় জল এসে গেছে। এত জোরে তাকে কোলের ভেতর আঁকড়ে ছিল যে ওর বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আশার আর একটুও ভয় করছিল না। ও বুঝতে পেরেছিল এরা ভাল লোক, তাই যখন তার ফ্রকের পকেটে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল, তখন টের পাওয়া সত্ত্বেও ও চুপ করে রইল।

তাদের আনা খাবার ইত্যাদির জন্যে মা তাদের ধন্যবাদ জানাল, আর বেশী পরিমাণে আনতে পারেনি বলে তারাও ক্ষমা চাইল।

তারপর মায়ের সঙ্গে আশা সেলে ফিরে গেল। এতক্ষণে আশা সেই কাগজের টুকরোটার কথা মাকে বলল। সব মেয়েরা ছুটে এল সেটা পড়বার জন্যে। রীতিমত উত্তেজিতভাবে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। মনে হল সবাই ভারি খুশি হয়েছে, কিন্তু আশা ভাবতেই পারল না ঐটুকু একটা কাগজ পেয়ে কেন তারা এত খুশি? মাত্র কয়েকটা কথা টুকরো টুকরো ভাবে ও ধরতে পারছিল। 'ওয়ারশ,' 'শান্তি সেনা', 'নিপীড়িতের মুক্তি।' এসবের অর্থ কিছুই ওর বোধগম্য হল না। তবে এটা বেশ বুঝল যে আজ তার জন্যেই তার সব বন্ধুদের এত আনন্দ আর খুশি। অনেক গল্পে যেসব বীরদের কথা শুনেছে, নিজেকে আশার তাদেরই একজন বলে মনে হতে লাগল।

পরদিন দেখল সমস্ত বন্দীরা লুকিয়ে লুকিয়ে একটা কাগজে কি সব লিখছে। তাকে সবাই বলল এটা কালকের যে চিঠিটা লোকটা তার হাতে পাঠিয়েছে, সেই চিঠির উত্তর। আশা বলল, 'আমিও তাকে লিখতে চাই। কিন্তু কি লিখতে হবে আমি জানি না।'

তখন মা এসে আশার হাত ধরে ধীরে ধীরে লেখাতে লাগলেন, 'আমরাও এখানে মরতে চাই না। এত অত্যাচার এত দুঃখ সহ্য করা সত্ত্বেও জীবনকে ভালবাসি। আমরা বাঁচতে চাই, কারণ ভবিষ্যতের ওপর আমাদের অনেক আশা, অনেক বিশ্বাস। কারণ প্রতিটি মানুষ যারাই আমাদের মতো চিন্তা করে তারা কেউই চুপ করে থাকবে না। আমিও বন্দীদের মধ্যেকার ছোট্ট মেয়ে—আমাকে সবাই আশা বলেই ডাকে—আমিও শান্তি চাই। শান্তি চাই আমার বাবাকে, আমার দাদাকে দেখতে পাব বলে, এই ভীষণ জায়গা থেকে বাইরে যাব বলে। যে মাঠ-ঘাট আমি কোনদিন দেখিনি, সেইখানে আরও অনেক ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে হয়ে খেলা করব বলেই শান্তি চাই।'

'তুমি কি সত্যিই এইসব চাও?' মা ওকে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়!' আশা দৃঢ়স্বরে জানাল, 'আর এই যদি শাস্তি হয় তবে ফ্রান্সের যেসব মেয়েরা আমাকে উপহার পাঠিয়েছে আমিও তাদেরই মতো। আমিও তাহলে শাস্তি ভালবাসি, যদিও কাকে শাস্তি বলে জানি না।'

অনুবাদ। অজ্ঞাত

নাম তার ম্যাজিও

গিয়োরগিয়ো কোম্লেনজি



সাম্প্রতিক ইতালীর ছোট গল্পে কোমেনজি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত এই গল্পটি ইতালীর সংবাদপত্র 'পাটুটুপকিয়া' কর্তৃক আয়োজিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং বিশ্ব যুব-উৎসবে বিশেষ আন্তর্জাতিক রচনা হিসাবে সংগৃহীত। ছাব্বিশ বছরের তরুণ ম্যাজিও, যে পুলিসের নজরবন্দী, যে জার্মান সৈনিকদের পাতা রেললাইন উড়িয়ে দিয়ে ট্রেন বোঝাই বন্দীদের মুক্তি দিয়ে পালাত—তার মৃত্যুতে সেদিন সারাটা দেশ স্তব্ধ হয়ে কেঁদেছিল।

উপত্যকায় গ্রাম্য ভবনে কিসের যেন বার্ষিক উৎসব হচ্ছে আজ। গাড়িতে করে সান্ধ্য পোশাক পরে মেয়েরা পার্টিতে আসছে। ভেতরে অর্কেষ্ট্রা বাজছে : সূক্ষ্ম পর্দার ভেতর দিয়ে বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে পরিচারকরা পরিবেশন করছে। কিন্তু আনন্দ উচ্ছল আড়ম্বরে আমার হৃদয় সাড়া দিচ্ছে না, আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তাই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে যে ওই জানলাগুলোর ওপর ম্যাজিও মরেছে। ম্যাজিওর বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ!

গ্রাম্য ভবনের দেওয়ালে সেদিনের লড়াইয়ের চিহ্ন রয়ে গেছে। ওই দেওয়ালগুলোর তলায় কাটা ট্রেঞ্চের ধুলোর গন্ধ কারো নাকে যদি এসে পৌঁছায়, তাহলে সে হয়ত এখনও সেদিনেব লড়াইয়েব ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারবে।

ম্যাজিওর মাথার চুল ছিল তামার মতো কটা রঙের। ম্যাজিও আমাদের সঙ্গে মানুষ হয়েছে পোর্ট এ পিয়েট্রোতে! ইস্টারের সময় ঘরে আগুন জ্বালবার উনুনের শিক পবিত্র করার জন্যে যেমন আমরা রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে টেনে গির্জায় নিয়ে গেছি, (ইতালিয়ান রীতি) তেমনিই আমরা ব্যাঙের সন্ধানে বড় খালটায় ঝাঁপ দিয়েছি।

কিন্তু অন্য ব্যাপারে ম্যাজিও ছিল আমাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। অপমান ও সহ্য করতে পারত না। যদিও সকলকে ও ভালবাসত, কিন্তু যে ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে চেষ্টা করত, তাকে ও নিশ্চিত কষ্ট দিত। কখনও কখনও যখন আমরা বড় খালটার বাঁধের ওপর বসে থাকতাম, ও বলত, 'জানিস, ইতালির মতো পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও বহু পাজী লোক আছে, যারা আমাদের অনিষ্ট করতে চায়।' কথাটা বলে ও ওর হাত দুটো বাড়িয়ে কি যেন আঁকড়ে ধরার ভঙ্গি করত কিন্তু আমরা ওর চেয়ে ছোট বলেই হয়তো ওর এই কথা আর ভঙ্গির সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারতাম না।

পনেরো বছর বয়সে ও যখন নিনাকে ভালবাসল, তখন একদিন শুনলাম ওকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বয়স ওর জেলে যাবার মতো ছিল না বলেই অবশ্য ও ছাড়া পেল। পর পর কয়েক বছর ওকে আর দেখাই গেল না। উনিশ শ' উনচল্লিশে ওর সঙ্গে আবার দেখা হল। ওর চুলগুলো তখন আরও কটা হয়েছে, আর চোখ দুটো আরও বিষণ্ণ।

কথা ও কমই বলত, কারণ সকলেই ওকে এড়িয়ে চলত। সন্ধ্যায় ওকে আমরা শুধু দেখতে পেতাম বাঁধের ওপর নিনার সঙ্গে। দুজনে ওরা হাতে হাত ধরে লাল আকাশের গায়ে কালো ছায়াছবির মতো ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ম্যাজিও রাত্রে কোথাও যেত না। প্রতিদিন রাত এগারোটায় পুলিসের স্থানীয় কর্তা ওর বাড়িতে এসে দরজা ঠেলত, উদ্দেশ্য নিশ্চিত হওয়া যে ম্যাজিও বাড়ি আছে। ম্যাজিও পুলিসের এই তত্ত্ব-তল্লাশের জবাবে ঘরের ভেতর থেকে কিছু একটা বলত, আলো জ্বালত। যখন আমরা খামারের উঠোন থেকে নাচ সেরে আসতাম, তখন ওর ঘরে এই আলো জ্বালান নিয়ে বলাবলি করতাম। একদিন আর একটা কথা শুনলাম; ম্যাজিও যখন মাছ ধরছিল তখন গ্রামের ছেলেরা নাকি ওকে খালি গায়ে দেখতে পেয়েছিল। সেই দিনই

সন্ধ্যাবেলা সারা গাঁয়ের লোক জানল, ওর পিঠে ক্ষতচিহ্নের একটা কুৎসিত পোড়া দাগ আছে। সঙ্গে সঙ্গে গুজব রটে গেল, ওর এই ক্ষত জুটেছে স্পেনে; কারণ মাঝে মাঝে শিস্ দিয়ে গান গাইতে গাইতে ও স্পেনীয় ভাষায় কি যেন বিড় বিড় করে বলত।

ম্যাজিও আরও দুবছর এখানে রয়ে গেল। সদা রোরুদ্যমান মা আর একমাত্র সঙ্গিনী নিনা, এরাই শুধু রইল ওর সামনে। তারপর ও আবার কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। উনিশ শ' তেতাল্লিশের আগে ওর সম্বন্ধে আর কিছুই শুনিনি।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের সে বছরটা ছিল খুবই ভয়ানক। পর্টো এ পিয়েত্রোতে জার্মানরা সারাদিন বাড়িগুলোর দিকে রাইফেল উঁচিয়ে আছে আর রাইফেল ছোঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের রুটিতে সযত্নে মাখন লাগাচ্ছে।

জার্মানরা নাকি রেল লাইন সারিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গেই কারা যেন সেই রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছে। উপত্যকায় আমরা সারা রাত ধরে বাজ পড়ার মতো বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনি। মনে হয় জার্মানরা হতাশায় বুঝি পাগল হয়ে গেছে। দুর্বৃত্তের সন্ধানে তারা বাড়ি বাড়ি খোঁজ চালাল, নির্বিকারে জিনিসপত্র তছনছ করল।

একদিন সকালে জার্মানরা সৈন্যদের স্মৃতিস্তম্ভের ওপর একটা ঘোষণা আটকে দিয়ে গেল। সারা গাঁয়ের লোক সেই ঘোষণার কাছে জড়ো হল, দেখল একটা ছবি। ছবিটা ম্যাজিওর। ম্যাজিও যেন ওদের সবাইয়ের দিকে চেয়ে হাসছে। সেদিন বিকেলে খালের কাছে অদ্ভুত একটা আওয়াজ শোনা গেল, ঠিক যেন ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো। মেয়েরা জানালার দিকে ছুটে গেল, তারপর সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করে পেছিয়ে এল। জার্মানদের নিয়ে এক সারি মিলিটারী ট্রাক রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে।

ট্রাক থেকে লাফিয়ে ভারি বুটের চাপে জোর করে দরজা ভেঙে ওরা বাড়ির ভেতরে ঢুকল। তারপর আবার ছেলে বুড়ো সবাইকে

টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এল।

পালিয়ে আসার যেটুকু সময় পেয়েছি, তারই মধ্যে ছুটে এসে ভুট্টা গাছের ভেতর লুকিয়ে পড়েছি আমি। মেয়েদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। খামারের পোষা জন্তরা জোরে ডাকছে। তারপর ধোঁয়ার কালো একটা মেঘ ছড়িয়ে পড়ল বাড়িগুলোর মাথায়, ধোঁয়ার সঙ্গে জ্বলে উঠল আগুনের লেলিহ শিখা।

হঠাৎ ক্ষেতের ভেতর দিয়ে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। মাটিতে কান পেতে শুয়ে পড়লাম। থেমে গেল পায়ের শব্দ। খুব সাবধানে দেখতে চেষ্টা করলাম। প্রথমে দেখলাম এক জোড়া বুট, তার ওপরে উঠে গেছে দুটো বলিষ্ঠ পা, তার ওপর গায়ের কোট। কোটটা কিন্তু সামরিক নয়। তাড়াতাড়ি আমি লোকটার মুখের দিকে তাকালাম, আর আমার ধারণা সেই মুহূর্তে আমি নিশ্চয় তার নাম ধরে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'ম্যাজিও !'

ম্যাজিও ঠেকনা দিয়ে বন্দুকটা রেখে মাথার টুপিটা খুলে ফেলল। ওর লাল চুলগুলো ঠিক যেন ভুট্টার সোনালী সুতোর মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। নীরবে ও খানিকটা তামাক নিয়ে হাতের তালুতে গুঁড়ো করল। আর আমি একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গ্রামে জার্মানদের মেশিনগানগুলো কটকট শব্দ করে চলেছে, ম্যাজিও সিগারেটটা পাকিয়ে অস্ফুট স্বরে শুধু বলল, 'উঃ কি জঘন্য !'

আমি ওকে সমর্থন করে বললাম, 'সত্যই জঘন্য।'

'ওরা কতজন হবে ?'

'তা জানি না, তবে মনে হয় অনেক।'

ম্যাজিও সিগারেটে গভীর একটা টান দিয়ে বলল, 'আমার মার খবর কিছু জান আর নিনার ?'

'আমি ঠিক জানি না।' আমি উত্তর দিলাম। ও চলে গেল।

রাস্তাটা খালি, বাতাসে শব্দ করে আগুনের স্ফুলিঙ্গগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ধ্যা হবার আগেই একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। পুরুষ

আর ছোট ছেলেপুলেদের নাকি জার্মানরা নিচের উপত্যকায় রেলওয়ে স্টেশনে দুটো মালগাড়িতে পুরে আটকে রেখেছে।

আবছা আলোয় আমরা দুটো গাড়িকে শুধু অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। উপত্যকার পটভূমিকায় গাড়ি দুটোকে খেলনার মতো দেখাচ্ছিল। মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে প্রিয়জনের নাম ধরে ডাকছিল, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল না। বড় জোর গির্জার পেছনে গ্রাম্য ভবনে গিয়ে পৌঁছায়।

মাথা নিচু করে ভিড়ের মানুষজন স্কোয়ারের কাছে ফিরে এসে কিছুক্ষণ নীরব থাকে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আর কাঁদছে না, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে কোলে। বয়স্ক মানুষেরা গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।

অন্ধকারে একের পর এক বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভিড়ের নীরব মানুষজন এবার উঠে পড়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে যায়। বুলেটের সঙ্গে আগুনের ঝলকানি চোখে পড়ে। ওরা লক্ষ্য করে জার্মানদের এই আক্রমণ যেন মানুষশূন্য গ্রাম্য ভবনকে কেন্দ্র করে। ভিড়ের মানুষজন গায়ে গা ঘেঁষে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। নিনা, ম্যাজিওর মা যেন ছায়াবনত গাছের গুঁড়ির মতো অন্ধকারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুকের আওয়াজ ক্রমাগত যখন কমে আসছে তখন মনে হল গির্জার পেছন থেকে পাথর গড়িয়ে আসার মতো একটা শব্দ আমরা শুনতে পেলাম। আমরা নিশ্চিত ছিলাম এ নিশ্চয় উপত্যকার গলি পথে মানুষজনের ছোটাছুটির শব্দ। একটু পরে দেখলাম কতকগুলো ছায়ার মতো মূর্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

প্রথম যে মানুষটা বাঁধের কাছ পর্যন্ত এসে সজোরে পড়ে গেল, তাকে দেখে ভিড়ের মানুষজন ফিসফিস করে উঠল, 'পিয়েরো, পিয়েরো এসেছে!' আরও অনেকগুলি নীরব মূর্তি একে একে প্রতীক্ষারত ভালবাসার জনের আলিঙ্গনে ধরা দিল।

ক্লান্ত ছেলেবুড়োরা আর কথা বলতে পারছে না। যাও বা দু-একটা কথা বলছে তাও দীর্ঘনিঃশ্বাসের আঘাতে টুকরো টুকরো

হয়ে যচ্ছে। ওরা জানাল জার্মানরা কি করে মালগাড়িতে পুরে প্রায় দমবন্ধ করে তুলেছিল।

ওরা জানাল কেমন করে ম্যাজিও এবং দশজন কি পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাসৈনিক এসে ওদের গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বেচ্ছাসৈনিকদের সাহসে অভিভূত হয়ে মেয়েরা ম্যাজিওর মা আর নিনার কাছে ছুটে গিয়ে আনন্দে ওদের জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু আবার গ্রাম্য ভবনের দিকে গুলি ছুঁড়ছে জার্মানরা। কথাটা ফিসফিস করে ছড়িয়ে পড়ল, ম্যাজিও নিশ্চয় ওখানে একলা রয়েছে। আহত ম্যাজিওর পেছনে পেছনে অনুসরণ করে জার্মানরা ওকে ফাঁদে ফেলেছে।

আজ উপলব্ধি করতে পারি ম্যাজিওর মতো মানুষ, যে উনিশ শ' তিরিশে স্পেনের যুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, তার জন্যে কোন ফাঁদই তৈরি হতে পারে না। সেই যুদ্ধেরই অনুরণন যে তার রক্তে। সারারাত ধরে বন্দুক চলল। সকালে আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠলাম কি ঘটেছে দেখবার জন্যে। বড় বড় গাছের পেছনে গ্রাম্য ভবন প্রায় অদৃশ্য। কিন্তু এখান থেকে বাঁদিকের জানলাটা দেখতে পাচ্ছি। জানলায় দাঁড়িয়ে ম্যাজিও বোধহয় তার জন্মভূমিকে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে। সবকিছু দেখবার ওর সময়ও নেই, তবু ও হয়ত দেখেছে ওর প্রিয় বাঁধটা, দেখছে সেই খালটা যে খালে ও ছেলেবেলায় ঝাঁপাইজুড়ি করত, চেয়ে রয়েছে একটার পর একটা বাড়ি পেরিয়ে গির্জার উঁচু চূড়োটার দিকে।

উপত্যকার পাশের জমি থেকে এঁকে বেঁকে জার্মানরা এগিয়ে এল, সূর্যের প্রথম আলোয় ওদের মাথার হেলমেটগুলো আয়নার মতো ঝকমক করছে। বেলা দশটার সময় এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এল সারা উপত্যকা জুড়ে।

শুধু গির্জার ঘন্টার ধ্বনি শোনা গেল।

একঘন্টা পরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ-এর মতো একটা কর্কশ আওয়াজ

শোনা গেল। মাইক্রোফোনে জার্মানরা ম্যাজিওকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিল।

ম্যাজিও ওদের সেই ঔদ্ধত্যের জবাব দিল জানলা থেকে দুর্নিবার গুলি বর্ষণ করে। জার্মানরা এবার ক্ষেপে গেল। কিন্তু বাইরে থেকে সব কিছু শান্ত দেখাচ্ছে।

হঠাৎ ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে একটা শাদা ধোঁয়া উঠে এল, গ্রাম্য ভবনটি যেন জ্বলছে আর সশস্ত্র একটি গাড়ি এগিয়ে আসছে প্রান্তর পেরিয়ে। গাড়ির অন্তরালে জার্মানরাও এগিয়ে চলেছে। ওপর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন একটা মুরগী তার সন্তান সন্ততিদের আগলে নিয়ে চলেছে।

দু'দুবার গাড়িটা রহস্যজনকভাবে এগিয়ে এল, আর একটু পরে ভীষণ একটা বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে তুলল আকাশকে। গ্রাম্যভবন থেকে শেষবারের মতো একটা গুলি ছুটে এল, কিন্তু তার আগেই পঙ্গপালের মতো জার্মানরা লাফাতে লাফাতে বেড়া ডিঙিয়ে, চীৎকার করে গ্রাম্য ভবনের দিকে ছুটল। এগারোটার সময় জ্বলন্ত রৌদ্র আর ফড়িংয়ের পাখার সামান্য শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

বিকেলের দিকে একটা মোটর গাড়ির আসা আর চলে যাওয়ার সময় গ্রামের মানুষ সতর্ক হয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করল। তারপর গাড়িটা চলে যাবার পর সবাই স্কোয়ারে ফিরে এল। প্রথম যে লোকটি স্কোয়ারে এসে পৌঁছল সে-ই হাত বাড়িয়ে মেয়েদের আর এগিয়ে যেতে বাধা দিল। গ্রাম্য ভবনের অলিন্দে একটা মৃতদেহ ঝুলছে। পা দুটো ওপরের দিকে বাঁধা, হাত দুটো শূন্যে ঝুলছে। পরনের প্যান্ট আর জামাটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। মৃতদেহের মাথায় ভুট্টার সোনালী সুতোর মত উজ্জ্বল লাল চুল। মৃতদেহটি সবাইকার প্রিয় একটি মানুষের, নাম তার ম্যাজিও।

অনুবাদ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

অতিথি

লুই আরাগঁ



আধুনিক সাহিত্যে লুই আরাগঁ অবিস্মরণীয় একটি নাম। জন্ম ১৮৯৭ সালে, প্যারিসে। ফরাসী সরকারের পতন এবং আত্ম সমর্পণের পর মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগঠকরূপে আরাগঁ রাইফেল কাঁধে নিয়ে অবিরাম ঘুরে বেড়ান ট্রেঞ্চে মাঠে জঙ্গলে, গোপন সভাসমিতির বিপজ্জনক পরিবেশে। জার্মান আক্রমণের তীব্রতার মুখে ডানকার্ক থেকে যে মিত্র সৈন্য পশ্চাদপসরণ করেন, আরাগঁ ছিলেন ঐ সশস্ত্র বাহিনীর অন্যতম সৈনিক।

'পাদরী মশাই আজ ফিরতে বেশী দেরি করবেন না তো? বেং-এর তরকারির জন্যেই বলছি।'

'না, মারী, আজ রাত্তিতে আমার জন্যে গুরুপাক কিছু করো না, যা গরম পড়েছে! না, আমার বেশী দেরী হবে না। কনফেশনগুলো শেষ হলেই ফিরে আসবো।'

মসিঁয়ে ল্যারোয়া বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর পরিচারিকা গজগজ করতে লাগল, একটা তরকারি এমন কিছু দামী খাবার হত না, ঠিক ঐটাই তিনি এড়াতে চান। এই অঞ্চলের সমস্ত লোকের মতো মারীও বলে বেং, এটা তাঁর খারাপ লাগে। তিনি নিজে বলেন ব্রেং। সেইটাই তো ঠিক। জিনিসটা তাঁর বিশেষ ভালো লাগে না। ভিকার বাগানের মধ্যে দিয়ে গির্জায় পৌছন যায়। আকাশিয়া গাছে ফুল ফুটেছে। চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু পাদরীর ইচ্ছে হল রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাবেন। গির্জায় গিয়ে যথারীতি বিভিন্ন লোকের পাপ স্বীকৃতি শোনবার কর্তব্যে আটকে পড়তে হবে, তার আগে বাইরে একটু ঘুরে যাবার ইচ্ছা হল তাঁর।

জায়গাটা যে তাঁর ভালো লাগে তা নয়। দশ বছর আগে এখানে

যখন তিনি প্রথম আসেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল এ যেন ঠিক তাঁর স্থান নয়, প্রথম দিনের সেই মনোভাব তাঁর আজও টিকে আছে। খাঁটি গ্রাম বা খাঁটি শহর হলে তাঁর পছন্দ হত। কিন্তু এই শহরতলির বাসিন্দারা হল ছোটখাট মহাজন, ব্যবসাদার, কিংবা এরা কাজ করে অন্যত্র। এদের বাড়ির পেছনে একটু ঝোপঝাড় থাকলেই এরা সন্তুষ্ট। তিনি যদি ভে-র পাদরী হতেন! সে জায়গাটা এখান থেকে মাত্র মাইল আধেক দূরে, মজুর এলাকা; প্রতিদিন সংগ্রাম, নানান সমস্যা সেখানে। তবু এর চেয়ে ভালো! পার্কের রাস্তায় এখনও পীচ তেতে রয়েছে। নির্মেঘ সন্ধ্যায় এক বেঞ্চির ওপর বসে দুজন স্ত্রীলোক, অনর্গল বকবক করছে। ওরা তাঁকে দেখে নমস্কার করল! আর একটু দূরে ফুটপাথের ধারে দুটি তরুণ-তরুণী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে। মসিঁয়ে ল্যারোয়া ছেলেটিকে চিনতে পারলেন না, কিন্তু মেয়েটিকে চিনলেন। ছোটখাট দেখতে, বছর পনেরো বয়েস। ভালো করে কাচা সাদা ব্লাউজের ওপর থেকে অস্ফুট দুটি স্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েটির চুল আর চোখ কালো, পরনে খাটো স্কার্ট, পায়ে মোজা নেই। বেশী দিনের কথা নয়, এই মেয়েটি নিয়মিতভাবে গির্জায় ছোটদের ধর্মোপদেশের বৈঠকে আসত। পাছে ওরা বিব্রত হয় সেজন্য মসিঁয়ে ল্যারোয়া মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

পার্কের ছোট গাছগুলো ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। মসিঁয়ে ল্যারোয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন, যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন গির্জাটা, আর বিষণ্ণ মনে ভাবলেন যেসব পাপ স্বীকারোক্তি তাঁকে এখন শুনতে হবে তার কথা। বারবার সেই একই জিনিস। তাঁর এলাকার লোকগুলো বড়ো পাপও কখন করেও না, অন্ততঃ যারা আসে তারা। আসলে লোকগুলো এই গির্জারই মতো। মসিঁয়ে ল্যারোয়া তাদের পছন্দ করেন না। আর এই গির্জাটাতেও তিনি কিছুতেই অভ্যস্ত হতে পারলেন না। এটার অসাধারণত্বই বা কি আছে? ১৯১০ সালে গথিক ধাঁচে গড়া গির্জা। যতদিন পাথরগুলো

সাদা আর জোড়াগুলো পরিষ্কার ছিল ততদিন নির্মাণ শিল্পের একটা আভাস পাওয়া যেত, তারপরে পাথর ময়লা হয়ে গেছে, ছোপ লেগেছে। ভে-র ধোঁয়া হাওয়ায় উড়ে এসে এখানে লাগে।

বাইরে থেকে গির্জাটা মনে হয় বেশ বড়, কিন্তু ভেতরে ঢুকলে হতাশ হতে হয়। সঙ্গীত মঞ্চটা আয়তনে ছোট, পাশের পথগুলো চওড়া নয়। সবকিছুই কেমন যেন স্থূল। মসিঁয়ে ল্যারোয়ার মতে যার একটু শিল্পরুচি আছে, তার কাছে এ খুব নৈরাশ্যজনক। মসিঁয়ে ল্যারোয়া যৌবনে নানা জিনিস অধ্যয়ন করেছেন, মিউজিয়ামে ঘোরাঘুরি করেছেন। নাঃ অল্পেই সন্তুষ্ট থাকবেন তিনি। তাছাড়া ঈশ্বরের ভবনে অভিপ্রায়টাই তো আসল জিনিস। সব যদি খুব সুন্দর নাই হয়, তবু সেখানে এসে যারা হাঁটু গেড়ে বসবে, তারা সঙ্গে নিয়ে আসবে মনের উর্ধবিহার, তাই কি যথেষ্ট নয়? তার দ্বারাই তো স্থাপত্যের যে অভাব রয়েছে তার পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু কই, যারা আসে তারা তো সঙ্গে তা নিয়ে আসে না।

কোন রোমান বাসিলিস্‌ক্ অথবা নিখুঁত গথিক গির্জার পাদরী হবার জন্যে মসিঁয়ে ল্যারোয়ার এত আগ্রহ হত না। ফ্রান্সের পল্লী অঞ্চলে যে ধরনের গির্জা অনেক আছে সেই রকম একটা গেঁয়ো গির্জা পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন। ও গির্জাগুলো দেখতে একটু অদ্ভুত, তবু ওদের মধ্যে একটা অনিপুণ আন্তরিকতার পরিচয় থাকে। কিন্তু ঈশ্বর আর বিশপের বিধান অন্য রকম। মসিঁয়ে ল্যারোয়ার জীবনের কঠোর কর্তব্য হল এই আত্মাবিহীন দেবালয়ের পৌরহিত্য করা। তবে এক সময় আসে যখন এইসব বাহ্য উপকরণ এড়িয়ে চলা যায়, যেমন যায় ব্লেৎ-এর বেলায়।

এই অঞ্চলটা বিশ্রী রকম শান্ত। মাথার ওপর খুব নিচুতে ঐ গরগর আওয়াজ যদি না থাকত, মনেই হত না যে যুদ্ধের মধ্যে আছে। যদিও ঐ আওয়াজে কেউ বিশেষ কর্ণপাত করে না। বিমান ঘাঁটিটা খুব কাছে। বাস্তবিক মাথার ওপর আওয়াজটা না থাকলে

মনেই হত না যুদ্ধ চলছে। বিশেষ করে এ জায়গায় বিজ্ঞাপন বড় একটা দেখা যায় না, যেগুলো দেখলে মসিঁয়ে ল্যারোয়া অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, তাঁর শরীরের মধ্যে কেমন যেন করে। শুধু মাত্র স্তম্ভটার গায়ে যেখানে আগে সিনেমা বা কনসার্টের বিজ্ঞপ্তি থাকত, আজকাল থাকে সৈন্যবাহিনী বা মিলিশিয়ায় যোগ দেওয়া বা টুকরো লোহা সংগ্রহের আহ্বান। এখানে বিজেতাদের সবুজ উর্দি কদাচিৎ দেখা যায়।

গির্জার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মসিঁয়ে ল্যারোয়া ভাবলেন এবার মনস্থির করা দরকার। মানসচক্ষে তিনি যেন দেখছিলেন, কাবা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। পরিহাসচ্ছলে তিনি বলেন, আমার মক্কেলরা। সম্ভবতঃ মাদাম পীয়রবুর্ত, বুড়ী ব্র্যুজর্ভা, সিগন্যালার বোকা বুদার, স্যাংগুলালি, বিদ্যালয়ের দু একজন ছাত্র। কি অসীম এদের ধৈর্য! মসিঁয়ে ল্যারোয়া তাঁর মনের বিতৃষ্ণা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলেন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর মন আগে থেকেই হিংস্রতায় ভরে উঠেছিল, বিশেষ করে এই ভেবে যে যত কম লোকই থাকুক না কেন—তাদের জন্যে তাঁর বেতারের খবর শোনা হবে না, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার খবর! এও তিনি সমর্পণ করলেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, তবে একটু অনিচ্ছার সঙ্গে। পকেটের মধ্যে জপমালায় তিনি হাত দিলেন। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে ছিল সাতজন, এর মধ্যে দুজন মহিলা। মেরী মাতার সামনে যে বাতিগুলো জ্বলছিল তার আলোয় তিনি এক নজরেই সবাইকে চিনতে পারলেন।

আগে থেকে অতিরঞ্জিত করে তিনি কিছু ভাবেননি। এই কঠিন ঈশ্বর ভক্তেরা তাঁর কাছে কি বলবে তা তিনি আদ্যোপান্ত জানেন, তিনি জানেন এক ঘন্টাকাল তাঁকে কি ক্ষুদ্র, কুৎসাময় জগতে আবদ্ধ থাকতে হবে। প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! ধর্মোপাসনার পরিচ্ছদ পরার জন্যে মঁসিয়ে ল্যারোয়া গির্জার পোশাক ঘরে ঢুকলেন। আজকাল কি বিশ্রী কাপড়ই না হয়েছে। আগেকার চোগাগুলোর

সৌন্দর্য, সেই চমৎকার মিহি কাপড়ের কথা যখন মনে পড়ে তখন তার অনুশোচনা হয়। আবার নিজের মধ্যে শূন্যগর্ভ সামাজিক অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে তিনি নিজেকে ভর্ৎসনাও করেন।

স্বীকারোক্তি শোনার আসনে বসে তিনি সবুজ পর্দার নিচে ঘুলঘুলির ওধার থেকে যে গুঞ্জন আসছিল তা অন্যমনস্কভাবে শুনতে লাগলেন: 'হে পিতঃ আমাকে ক্ষমা কর, কারণ আমি পাপ করেছি···' এমন কিছু স্ত্রীলোক আছে যারা তুচ্ছ খুঁটিনাটির বিবরণ দিয়ে আনন্দ পায়। যেন তারা পাপ স্বীকার করতে আসেনি, এসেছে পুণ্যের জাঁক করতে। নিশ্চয়ই পুণ্য খুব বড় জিনিস···মসিঁয়ে ল্যারোয়া বাগানে আকাশিয়ার দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাবলেন, আর ভাবলেন ভে-র পাদরীর সঙ্গে দাবা খেললে কি আনন্দটাই না পেতেন···যদি লোকটার রাজনীতি আলাপের ঐ ভয়ঙ্কর ঝোঁকটা না থাকত! হঠাৎ মসিঁয়ে ল্যারোয়া আবিষ্কার করলেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। যে মেয়েটি স্বীকারোক্তি করছিল তাকে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন, করে লজ্জিত হলেন। বিবেকের পরিচালক যিনি তাঁকে নিজের ওপর আরও কড়া নজর রাখতে হয়! 'বাছা, তুমি দশবার বলবে 'পাতের' আর দশবার 'আভে' স্তোত্র···'

এবার ডান দিকের ঘুলঘুলি থেকে আর একটি কণ্ঠস্বর উঠল। পাশে প্রার্থনার বেদীর ওপর কেউ অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে পড়েছে কিনা দেখার জন্যে মসিঁয়ে ল্যারোয়া সামনের পর্দাটা একটু সরালেন। উঃ এই কর্তব্যের শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁকে যেতে হবে! ঈষৎ সরানো পর্দার পেছনে তিনি দেখতে পেলেন মোমবাতির মৃদু আলো, এবং একথাও তিনি কিছুতেই না ভেবে পারলেন না যে আজকাল মোম জ্বালানো কত বড় বিলাসিতা। লোক আজকাল সাবান পায় না যা মানুষের কাজে লাগতে পারত, তা অনর্থক পুড়ছে দেখে মাতা মেরী খুব খুশি, এ কথা কি নিঃসন্দেহে বলা যায়! এই সব বিপজ্জনক চিন্তা তিনি মন থেকে দূর করে দিলেন। 'শোন বাছা, যা অতি

স্বাভাবিক তার জন্তে নিজেকে আর ছুবো না…'

এইভাবে ঘনায়মান অন্ধকারে চলল স্বীকারোক্তির পালা। দুবার মসিঁয়ে ল্যারোয়ার মনে হল আজকের মতো কাজ শেষ হল, কিন্তু দুবারই তিনি দেখলেন অনুতাপীদের সংখ্যা গুনতে ভুল করেছেন। এইবার নিশ্চয়ই শেষ। ইনি সেই মহীয়সী নারী যিনি মুদীকে ঠকিয়ে টিনভর্তি টমাটো হস্তগত করেছিলেন। তিনি দোষ স্বীকার করে বললেন তাঁর মূর্খতার অবধি নেই, কারণ পনেরো দিন বাদেই টিনের টমাটো অল্প দামে অবাধে বিক্রী হতে লাগল। হঠাৎ পাদরী মশাই-এর মনে হল, গির্জার মধ্যে কি যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে! 'বাছা, বেশ বুঝতে পারলে তো প্রবঞ্চনায় কোন লাভ নেই! এই ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর তোমাকে…' তিনি পর্দাটা তুলে ধরলেন, কেউ বাকী নেই। 'ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সন্তানের নামে…' বুড়ীর কাজটা তিনি তাড়াতাড়ি সারলেন, কেমন যেন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন।

স্বীকারোক্তি শোনার আসন থেকে নেমে আসার পর তিনি লক্ষ্য করলেন ডান দিকের কামরায় পর্দার নিচে একজন পুরুষের পা বেরিয়ে রয়েছে। তাহলে আবার তাঁর গুনতে ভুল হয়েছে? এখনও একজন অনুতাপী বাকী রয়েছে। কিন্তু গির্জার সঙ্গীত মঞ্চে কারা যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। এর অর্থ কি? তিনি এগিয়ে গেলেন।

ওদের তিনজন পুলিসের লোক, আর দুজন সাধারণ পোশাকে, যাদের তিনি অবিলম্বেই চিনলেন। স্বীকারোক্তির জায়গা থেকে ঐ বুড়ী বেরিয়ে আসার পর ওরা ওঁর মুখ ভাল করে দেখল, তারপর যেতে দিল। 'কি ব্যাপার মশাইরা?' মঁসিয়ে ল্যারোয়া খুব শান্ত গম্ভীরভাবে বললেন। তিনি প্রশ্ন করলেন এমন এক কণ্ঠস্বরে যা চড়াও নয়, খাদেও নয়। এ কায়দাটা শুধু তাঁরই জানা, যা মৃদুস্বরে বলা হলেও গির্জার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়। পুলিসগুলো ভয় পেয়ে থেমে গেল। সাধারণ পোশাক পরা লোক

দুটির একজন বলল, 'ভে-তে আবার আততায়ীর আক্রমণ হয়েছে, একটা বোমা মেরেছে। যে লোকটাকে আমরা পালাতে দেখেছি সে আপনার গির্জার মধ্যে পালিয়ে এসেছে…'

বোঝা যায় লোকটা চমৎকার ফরাসী বলছে, অথচ ওর কথার ঝোঁকগুলো কেমন যেন রূঢ়! মঁসিয়ে ল্যারোয়া শান্তস্বরে বললেন, 'খুঁজুন আপনারা, দেখুন যদি…কিন্তু কেউ নেই, বুঝলেন…' একটু থেমে বললেন, 'আমার যজমানদের মধ্যে শেষ লোকটি ছাড়া আর কেউ নেই। বেচারা আমার কাছে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করে আছে, আপনারা যদি অনুমতি করেন তো আমি ওর স্বীকারোক্তি শুনতে থাকি…'

অন্ধকারে এক মুহূর্তের জন্যে তিনি ইতস্তত করলেন। বুকের ভেতরটা দুরদুর করে উঠল। ঐখানে, ঐধারে লোকটার কাতর নিশ্বাস তিনি শুনতে পেলেন। ফিরে আসার সময়ে তিনি ওর জুতো দেখেছেন, গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ একজোড়া জুতো। এখনি যে কথা তিনি বুড়ীকে বলেছেন, ভাবলেন সেই কথাটা—'প্রবঞ্চনায় কোন লাভ নেই!' কিন্তু ওর সম্বন্ধে তিনি খুব নিশ্চিন্ত নন, হয়তো কিছু কৌতূহল জেগেছে। তিনি মনস্থির করলেন। ডান দিকের ঘুলঘুলি খুলে আরও ভালো করে দেখার জন্যে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'বল পুত্র, তোমার কথা বল, আমি শুনছি।'

গির্জার মধ্যে আসা যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। মসিঁয়ে ল্যারোয়ার মনে হল কে যেন পোশাক ঘরের দরজা খুলল। নিশ্চয়ই গির্জার পাহারাদার। কিন্তু এই যে খুব কাছে লোকটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—গভীর চাপা কণ্ঠস্বর, সে বলল: 'পাদরী মশাই…হে পিতঃ…!' পাদরীর কাছে কথা বলার অভ্যাস নিশ্চয়ই লোকটার নেই, হয়তো গির্জায় আশ্রয় নেয়ার জন্যেই মার্জনা চাইছে। পাদরী বললেন, 'বলো পুত্র, আমি তোমার কথা শুনছি।' তাঁরা যেখানটায় ছিলেন, সেই দিকে কার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। পাদরী যেন অনুভব

করলেন নতজানু লোকটি এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি তার দিকে ফিসফিস করে বললেন, 'অপেক্ষা কর, চুপ কর…' তারপর তিনি উঠলেন, দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটি যে একটু আগে তার সঙ্গে কথা বলছিল।

'আবার কি মশাই?' ধর্মোপদেশে অভ্যস্ত পাদরীর মৃদু কণ্ঠস্বর সহসা চিৎকার করে উঠল। অপর লোকটা তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে এসে পড়েছিল, আকস্মিক এই রুক্ষ সম্ভাষণে সে হতবুদ্ধি হয়ে পেছিয়ে গেল, 'এন্‌ৎ-শুলদিগেন জি…মাফ করুন, আমি মনে করেছিলাম…'

মসিঁয়ে ল্যারোয়া শরীরের মধ্যে একটু খুশির হিল্লোল অনুভব করলেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? কোথায় রয়েছেন আপনি মনে করেন? আমাকে আমার কাজ করতে দেবেন কি দেবেন না? আমার একজন যজমান রয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছে। বেচারী পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে অপেক্ষা করে আছে, বুঝলেন? আশা করি আপনারা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন…'

পুলিসের লোকগুলো ফিরে এল। ওদের একজন বলল, 'কাউকে পাওয়া গেল না।' জার্মানটা সাধারণ পোশাক পরা অন্য লোকটিকে কি যেন বলল। পাদরী মশাই বললেন, 'আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, ঐ দেখুন গির্জায় একটা ছোট দরজা রয়েছে, স্যাঁ জাঁ-বাতিস্তের বেদীর…'

ওরা সবাই সেইদিকে তাকাল। সত্যিই তো! তাহলে…

'আপনি কি বাইরে লোক রেখে এসেছেন, ব্রিগেডিয়ার?'

ব্রিগেডিয়ার বলল, 'হ্যাঁ।'

লোকগুলো সব টুপি খুলে হাতে নিয়ে স্যাঁ জাঁ-বাতিস্তের বেদীর দিকে চলল। মসিঁয়ে ল্যারোয়া দেখলেন তারা ক্রমে দূরে চলে গেল, তারপর গির্জার বাইরে বেরিয়ে গেল। তিনি নিজে নিজেই হাসলেন। তাঁর কানে যেন ঈশ্বরের মহিমস্তোত্র বাজতে লাগল। সর্ব প্রকার পাপ বোধ তিনি হারিয়ে ফেললেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, এবার

তিনি লোকটির স্বীকারোক্তি শুনবেন। তিনি যখন ফিরলেন, দেখলেন সেই কপট অনুতাপী তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে টুপি নেই। মোমবাতির আলোয় তার মুখে ছায়া পড়েছে।

মসিঁয়ে ল্যারোয়া বললেন, 'তুমি স্বীকারোক্তি করতে চাও না?'

'পাদরী মশাই…' আশ্চর্য, ওর স্বাভাবিক গলার স্বর কি গভীর, মনে হয় বুকের মধ্যে থেকে উঠে আসছে এবং মজুর বা সৈনিকের মতো তার শক্ত শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। 'আপনার সাহসের জন্তে ধন্তবাদ! কিন্তু, আমার এখন চ'লে যাওয়াই ভালো…'

'তুমি যদি এখন বেরোও তাহলে ওরা তোমাকে ধরবে, হে পুত্র।'

মসিঁয়ে ল্যারোয়া স্বীকারোক্তি সময়কার ঐ সম্বোধনের ওপর একটু জোর দিলেন, যেন তাঁর অভিভাবকত্বের অবস্থাটা তিনি আরও বেশী সময় ধরে রাখতে চান। কিন্তু তখনি, তাঁর মধ্যে সত্যিকারের খ্রীষ্টানসুলভ করুণার অভাব রয়েছে বুঝতে পেরে নিজের কথা সংশোধন করে নিলেন, 'বুঝলে খোকা?'

'আমার উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে…' যুবক মাথা চুলকে ইতস্ততঃ করল, 'আচ্ছা পাদরী মশাই, ওরা কি আপনাকে বলেনি ওদের কেউ খতম হয়েছে?'

মসিঁয়ে ল্যারোয়া যুবকটির দিকে তাকালেন। তার মুখ দেখে খুব সাহসী মনে হল, মনে হল সে আধা খেঁচড়া করে কিছু করতে চায় না। তাই দ্বিধাগ্রস্থভাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জার্মানদের কথা বলছ?'

স্পষ্টতই প্রশ্নটা বোকার মতো হয়েছিল, তাই সেটা চাপা দেবার জন্তে তিনি আবার বললেন, 'বেশ, এখন তুমি কি করতে চাও?'

'আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি এখানে অপেক্ষা করি, এক কোণে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকব…'

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

মসিঁয়ে ল্যারোয়া বললেন, 'না। শেষ পর্যন্ত ঐ হতচ্ছাড়ারা যদি

আবার ফিরে আসে ?'

যুবক অস্পষ্ট একটা ভঙ্গি করল। মনে হল সে চোখ দিয়ে যেন গির্জাটা পরিমাপ করছে, যেটা একটা ভবিষ্যৎ মুষ্টি যুদ্ধের ক্ষেত্র হবে। পাদরী মাথা বাঁকালেন।

'না থাকাই ভালো। এস আমার সঙ্গে। গির্জার পোশাক ঘর থেকে আমার বাড়ি যাওয়া যায়, বাগানের মধ্যে দিয়ে গেলে…'

যুবকটিকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না। সে বলল, 'কিছু যায় আসে না, একজন পাদরীর পক্ষে এই-ই যথেষ্ট সাহসের কথা।'

এখন আকাশিয়া ফুলের চমৎকার গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

পাদরী মশাই যখন বাড়ি ফিরে মারীকে বললেন তাঁর একজন অতিথি আজ রাত্রে খাবেন, মারী তখন হতাশ ভাবে হাত দুটো ওপরে তুলে বলল, 'নাঃ আপনি আর কিছুতেই বদলাবেন না। আমাকে বলে গেলেন সামান্য লঘুপাক ছাড়া আর কিছু খাবেননা আর এখন…'

মারী আর কিছু বলতে পারল না, লোকটির দিকে তাকিয়ে ও অবাক হয়ে গেল। তারপরেই সোজা ছুটে গিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল।

মসিঁয়ে ল্যারায়া বললেন, 'আমাদের খাওয়ার জন্যে এক ব্লেৎ-এর তরকারি ছাড়া বোধ হয় আর কিছু নেই, তাছাড়া এই যুদ্ধের সময়ে… তুমি ব্লেৎ-এর তরকারি ভালবাস ?'

'আপনি বেৎ-এর কথা বলছেন ? বেৎ তো খারাপ নয়, গাজরের চেয়ে ভালো।'

মসিঁয়ে ল্যারোয়া প্রতিবাদ করে বললেন, 'গাজর যদি গোল-আলুর সঙ্গে মিশিয়ে রাঁধা যায়, তাহলে সত্যিই ভালো…আর তোমরা যে এখানে বেৎ বলো তা ভুল, বলা উচিৎ ব্লেৎ।'

'প্রত্যেকেরই নিজের নিজের মত আছে। আমরা এখানে বলি বেৎ।'

তাঁরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। কিছুক্ষণ আগে গির্জায় যে রকম হেসেছিলেন সে রকম নয়। এ সেই প্রাণখোলা হাসি

যাতে অনেক সময় পেটে খিল ধরে যায়। তাঁরা নিজেদের সংযত করতে পারলেন না। মসিঁয়ে ল্যারোয়ার অফিস ঘর এটা। সবুজ মখমলের পটভূমির ওপর আঁকা ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের বিরাট মূর্তি। এই প্রথম মসিঁয়ে ল্যারোয়া পুরো আলোয় আগন্তুকের মুখ পরিষ্কার দেখতে পেলেন। দৃঢ় চিবুকের চেয়েও তার মুখের বড় বৈশিষ্ট্য হল বালকের মতো দুটি চোখ, উজ্জ্বল বাদামী রঙের কৌতূহলী দুটি চোখ। তার মুখের ওপর যদি সেই ছোট্ট বলি রেখাটা না থাকত, তাহলে নেহাৎ অনভিজ্ঞ একটা বালক বলে ধরে নেওয়া যেত।

'তুমি নিশ্চয়ই তামাক খাও?'

খায় মানে, না খেয়ে কি পারা যায়! উত্তর পাওয়ার আগেই পাদরী প্রায় জোর করেই তাকে ঠেলে দিলেন আরাম-কেদারায়। যুবকের মুখ খুশিতে ভরে উঠল। সে ধূমপান করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'লোকে ঠিকই বলে, সর্বত্রই সাহসী মানুষ আছে; কিন্তু কথাটা যে সত্যি তা দেখলে আনন্দ হয়···প্রত্যেকেরই নিজের নিজের মত ও পথ আছে, এবং তার নিজেরটা সে আঁকড়ে থাকবেই।'

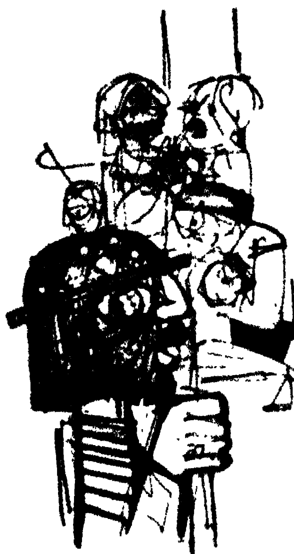
না এ ছেলের কাছে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম, মনে মনে ভাবলেন মসিঁয়ে ল্যারোয়া। তাছাড়া, সে মতলবও তাঁর নেই। বহু বিষয়েই চিন্তার পার্থক্য এত বেশী বলেই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গ পেয়ে সন্তোষ লাভ করছেন। মসিঁয়ে ল্যারোয়া যদি পাদরী না হতেন, তাহলে ঘটনাটায় আনন্দ হত কম। তাছাড়া তাঁর মনে হল সবুজ মখমলের ওপর যীশু খ্রীষ্টের বিরাট মূর্তি যেন তাঁকে অনুমোদন করছেন।

কিন্তু তাঁর মাথার মধ্যে তখন অন্য জিনিস ঘুরছে। দু তিনবার তিনি তাঁর সূত্র খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। অবশেষে তাঁর চেয়ারটা এগিয়ে এনে অতি-পরিচিতের মতো অতিথির উরুতে চাপড় মেরে দুষ্টুমীভরা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, 'তারপর এখন···আমাদের মধ্যে···সেই বোমা?'

অনুবাদ। অজ্ঞাত

একটি মায়ের কাহিনী

জিরি মারেক



দু-বার জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত চেকোস্লোভাকিয়ার অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠিত মহিলা সাহিত্যিক জিরি মারেক। জন্ম ১৯১৪ সালে। 'মেন ওয়াক ইন ডার্কনেস' এবং 'আওয়ার গ্রাউণ্ড ভিলেজ' উপন্যাস দুটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ইটস্ ডে অ্যাবাউ' 'অরাস মিটিং' এবং 'অফ্ 'ব্রম অ্যাণ্ড স্মাইল' অন্যতম।

এই কাহিনীর নায়িকা যেনই এক মা— যিনি মেরী, যিনি কাত্তিয়া, যিনি র‍্যাচেল, যিনি পেনিলোপী, যিনি হাজার বছরের বুড়ি, যিনি হারানো দুঃখে জর্জরিতা, যিনি এ বিশ্বের চিরন্তনী মা। হৃদয়ের সকল মাধুর্য, আঙ্গিকের নিপুণতায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মারেকের অন্তলম্পণী এ কাহিনীটি নিঃসন্দেহে নতুনত্বের দাবি রাখে।

মাননীয়েষু, আপনাকে একটা গল্প শোনাব, কেননা আপনার বেশ লেখার হাত আছে। এতদিন আমি আমার চিরস্থায়ী নিঃসঙ্গতাকেই এ-গল্পের একমাত্র শ্রোতা করে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যলোকেরও শোনবার সময় হয়েছে। এখন আপনার কাজ আমার এই সাদামাটা কথাগুলোকে লেখকদের মতো করে পেশ করা। লিখিত ভাষায় সবটুকু ক্ষমতা উজাড় করে যতটা সম্ভব প্রাণ ক্রোধ আর ক্ষোভ ঢেলে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া। এ কাজটা আপনাকে করতেই হবে। তবেই না সবাই আমার কথা বিশ্বাস করবে।

আমি একেবারে ছাপোষা একটি মেয়ে। বিশেষত্ব বলতে কিছুই নেই। থাকি একটা ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়িতে, খুব কম লোকেই আমাকে চেনে। আমার ঘরের জানলা দু'টোর ওপাশে অন্ধকার একটা গলি, কোন সময়েই সেখানে রোদ আসে না। আর পর্দার

ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে গলির ওপারের দেওয়ালটা। অবশ্য এর চাইতে সুন্দর দৃশ্য আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন, কেননা আমার দৃষ্টি সর্বদাই অতীতে নিবদ্ধ।

বাজারের কালো থলিটা হাতে নিয়ে বেরোবার সময় বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রতিদিনই দু'একবার দেখা হয়। তার কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসি। আমার হার্টের অবস্থাটা ভাল নয় আর সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্টেও ভুগছি। তাই খুব আস্তে আস্তেই হাঁটি।

কখনও কি ভেবে দেখেছেন কত নিঃসঙ্গ মহিলা রোজ এমনিভাবে যাতায়াত করে অথচ যাদের দেখবার কেউ নেই? পারিপার্শ্বিক জীবন প্রবাহের কাছ থেকে ওদের কোন পাওনা নেই। দোকানের জানলায় কত আলোর ঝলমলানি। কিন্তু তার কোনটাই ওদের জন্যে নয়। ওদের জীবন, কতকগুলো শূন্য জীবন। এ-পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে ওদের পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করবে। কিন্তু তবু ওরা বেঁচে আছে। ঠিক যেন জীবনপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জীবনেরই কয়েকটি ছায়া।

জীবনকে যারা চুটিয়ে উপভোগ করছে ঠিক তাদের মতো এরাও পারিপার্শ্বিক প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে সমান উৎসুক। তবে হ্যাঁ, ওদের মনের কোণে জমা হয়ে রয়েছে কিছু বেদনা, কিছু দুঃখ—আপনজন না থাকলে যা হয়। এক-একটা বিফল জীবন! কে আর কবে এদের কথা ভেবে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে!

লোককে বলতে শুনি, 'একতলার বুড়ি বাজারে চলল।'

এই সেদিন আমাদের ফ্ল্যাটের দ্বাররক্ষী ভদ্রমহিলা কিভাবে যেন আমার জন্মের তারিখটা জেনে ফেলল। শুনেই তো অবাক হয়ে সে চোখ কপালে তুলল, 'আরে, আপনার দেখছি বয়স বেশী নয়! চুলগুলো পাকিয়ে ফেলেই তো বিপদ করেছেন।'

'শুধু ওটুকু জেনেই কি কাউকে বিচার করা যায়? সত্যি বলতে বয়স আমার মোটেই কম হয়নি। মাঝে মাঝে মনে হয় এ-পৃথিবীতে আমার পর কয়েক হাজার বছরই বোধহয় পার করে দিয়েছি।'

আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলা কেমন যেন বিমর্ষভাবে হেসেছিল। হয়তো আমার কথা ভেবে ও দুঃখ পেয়েছিল। কিন্তু আমার জন্যে আবার দুঃখ পাওয়া কেন? আজ না হয় আমার এই দশা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি কোনদিন সুখের মুখ দেখিনি। স্বামীর সঙ্গে ঘর যখন করেছি অর্থকষ্ট কাকে বলে কোনদিন অনুভব করারই সুযোগ পাইনি। বিশেষ করে মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা, যেদিন আমাদের সোনা ঘর আলো করে আমার কোলে এল। সেদিন আমাদের খুশী যেন আর ধরছিল না।

দেখছেন তো, গল্পটাতে বিশেষত্ব বলে কিছুই নেই। হাজার হাজার লোকের জীবনে এমন দৈনন্দিন ঘটছে। ভয় হচ্ছে যে গল্পটাকে মামুলী মনে করে আপনি না আবার লিখতেই অস্বীকার করেন। দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন।

কিছুদিন বাদেই যুদ্ধ বাধল। এটাও অবশ্য নতুন কিছু নয়—যা ঘটেছে আমাদের চোখের সামনেই তো ঘটেছে। যুদ্ধ কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। আচ্ছা, আপনার কি একবারও মনে হয় না যে এভাবে যুদ্ধ কথাটা উচ্চারণ করলে বড় কম বলা হয়? দু' অক্ষরের এই অত্যন্ত সাধারণ শব্দটার সে সাধ্য কোথায় যে অন্তর্নিহিত সমস্ত ভয়াবহতাকে ব্যক্ত করবে! আমি এমন একটা শব্দ চাই যেটা উচ্চারণ করা মাত্র টের পাওয়া যাবে আশেপাশের সব কিছু গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, শত্রু আঘাত হানছে, লোকে জখম হচ্ছে, বারুদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে শুকনো রক্তের গন্ধ। কিন্তু যে-শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন বাস্তবের সঙ্গে তুলনা করতে গেলেই বিপদ। সেটাও আর তখন মনে ধরবে না।

আমার স্বামী যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য অস্ত্রধারণ করেননি, কারণ সেটা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। রাজদ্রোহী হিসাবে গ্রেপ্তার হবার পর মৃত্যুদণ্ড হল। একা আমি আমার শিশুপুত্রকে আঁকড়ে পড়ে রইলাম।

ছুটো তাৎপর্যময় ঘটনা এবার আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে যুদ্ধ নামক শব্দটা কতখানি বীভৎস, কি পরিমাণ গুরুভার। খেয়াল রাখতে হবে যে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ এ-সময়ে উদ্দেশ্যবিহীন। জীবিতদের সঙ্গে এক টেবিলে এ-সময়ে মৃত্যুর অবস্থান। আর একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে একটি তুল-তুলে নরম শিশুর কথা। যে মন কাড়তে ওস্তাদ। যে ঘুমের মধ্যে তার ছোট্ট হাত দুখানি মুঠো করে অপস্রিয়মান স্বপ্নগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

আমার মনে হয় আপনি যদি এমনি একটা বিবরণ দেন মন্দ হবে না। ধরুন, পার্কের মধ্যের পথটাতে রোদ এসে পড়েছে। একটা বাচ্চা টলমল করে রাস্তার মাঝ দিয়ে হাঁটছে আর চেঁচামেচি করছে। এক-একবার গাল ফুলিয়ে হাওয়া নিয়ে পরক্ষণেই ফুস্ করে ছেড়ে দিচ্ছে। কে বলবে যে এই পার্কে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মাটিতে গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। কে বলবে এই রাস্তা দিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষ মাটির ওপর থেকে চোখ না তুলেই হেঁটে চলে যাচ্ছে? আরে এ তো একটা ট্রেন! লাইনের ওপর দিয়ে কেমন ছুটে চলেছে! কি অপূর্ব উত্তেজনা—সারা পৃথিবীটাই একটা অপূর্ব জায়গা। খোকার চোখে পড়ে সবই রূপকথা হয়ে যায়।

মাথাভাঙা ঘোড়াটাকে নিয়ে খেলা শুরু হলে কাঠের টুকরোটার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয়। একমাথা নরম কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে ঘোড়া ছোটায়। তা বলে ও কিন্তু ছোট্টটি নেই—বিরাট এক শক্তিশালী পুরুষ। বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে নির্ভয়ে আক্রমনোদ্যত সৈনিক। ছুটে চলারও যেন বিরাম নেই। এমনি সময় জানলার ওদিকে একটা চড়ুই এসে বসে। পাখিটা নজরে পড়া মাত্র ঘোড়াটা চিৎপাত। ওদিকে জানলার চৌকাঠে বসা চড়ুই-এর কিচির-মিচির আর এদিকে ছোট্ট নাকটা কাঁচের সার্সিতে লেপটানো। 'আমায় দেখে কেন পালাল বলতো? লেজ নাড়ছিল কেন মা? চড়ুই যদি কথা বলতে পারে না

তো এত কি বকে ?'

পরক্ষণেই চড়ুইটার চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ওর রঙচঙে বলটা। সাঁ করে আকাশে ছুঁড়ে দিলেই তোমার পাশে এসে থপ্ থপ্ করে লাফাবে এমন জিনিস কি আর হয় !

(আর এরই মধ্যে যুদ্ধ বাধে, বেদনা আর হত্যার উস্কানিতে ভরা দেওয়ালে-সাঁটা বিজ্ঞাপনগুলোকে পাশ কাটিয়ে বড়রা এগিয়ে যায়)।

এবার আবার বই খোলা হয়েছে বাবুর। ছাপা কাগজগুলোর ওপর দিয়ে মোটাসোটা আঙুলটা চলে ফিরে বেড়ায় আর সুন্দর ছবি চোখে পড়লেই থমকে দাঁড়ায়। লোক ভর্তি গাড়ি, চাবুক হাতে সহিস, নদী, ষ্টীমার, ব্যাস্, এবার আঙুল আর আঙুল নেই, চিমনী সাফ করার ঝাড়ুদার হয়ে মই-বেয়ে উঠছে—এক, দুই, এক, দুই···। 'ওই যে লোকটা চিমনী পরিষ্কার করে, রাত্তিরে ও কোথায় ঘুমোয় মা ? আকাশের তারাদের কে নিবিয়ে দেয় ? আচ্ছা, সূর্যি মামা কি আমার এই থালাটার চেয়েও বড় ?'

বাচ্চা ছেলে মাত্রেই সুন্দর। আর সব চাইতে সুন্দর ঠিক ঘুমিয়ে পড়বার আগের সময়টায়। পালকের নরম গদির মতো যত স্বপ্ন তখন এসে ভিড় করে, ক্লান্ত চোখ দুটো জড়িয়ে আসে, ঠোঁটের কোণে এক টুকরো মৃদু হাসি। তারপর মুণ্ডবিহীন ঘোড়া, বল আর চড়ুই পাখি, সবাই জীবন্ত হয়ে খাটের মাথায় এসে বসে। পৃথিবীতে সুন্দর জিনিসের কি আর অভাব আছে !

কেন এসব বলছি ? কারণ আমারই চোখের সামনে আমারই ছেলেকে আমি মৃত্যুবরণ করতে এগিয়ে যেতে দেখেছি।

অন্য শিশুদের মতো ওর চোখেও জড়িয়েছিল বিহ্বলতা। হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলে ওদের বিরাট মিছিল। মৃত্যুপথযাত্রী একপাল কচি কচি ছেলে মেয়ে, কি কোমল আর কত অসহায় !

আর আমার সোনাও—না, না, ভয় পাবেন না, আমি কাঁদছি না। শুধু গলাটা একটু যা কাঁপছে। চোখের জল আমার বহুদিন শুকিয়ে

গেছে। রয়ে গেছে শুধু আতঙ্ক। কিন্তু আতঙ্ক তো কাঁদে না।

সেদিন যা ঘটেছিল আপনাকে কিন্তু সেই বিবরণ হুবহু তুলে ধরতে হবে। নির্জন থমথমে গ্রাম্য পরিবেশ। রেললাইনের পাশ দিয়ে একটা ফাঁকা রাস্তা চলে গেছে। পথের কাদা সত্ত শুকোতে শুরু করেছে আর তারই ওপর ছোট ছোট পা ফেলে বাচ্চারা টলমল করে এগিয়ে চলেছে। মাথার ওপরে ধূসর আকাশ। কি কাছে কি দূরে প্রকৃতি নিস্পন্দ নিথর। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। ভয়াবহ, সত্যিই ভয়াবহ। বাতাস অবধি লজ্জিত, গাছগুলো নিশ্চল। ভাগ্যিস্ শেকড় দিয়ে মাটির সঙ্গে আটকানো, তা না হলে এ বীভৎসতা ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। ঠিক ছুটে পালাত। ভয়ঙ্কর দানবীয় এক নীরবতা, যেন কোথাও কোন জীবনের চিহ্ন নেই। শুধু মিছিল এগোচ্ছে—এগোচ্ছে একদল শিশু, যারা ইতিমধ্যেই বহু কদর্য অত্যাচারের পরিচয় পেয়েছে। কিছু না বুঝেই ওরা অনুগতভাবে একে অপরের হাত ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছিল স্কুল ভাঙার পর ওরা সদলবলে বাড়ি ফিরছে। সঙ্গের প্রহরীদের জুতোয় লাগানো লোহার নাল খট্ খট্ শব্দ তুলছে। এই ধরণের একটা কিছু লিখবেন! হ্যাঁ, বলতে যেন ভুলে যাবেন না যে শিশুরা মৃত্যুবরণ করতে চলে গেল।

এসবই আমি চারদিক মোড়া একটা লরীর মধ্যে বসে, গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখেছি। সঙ্গে ছিল আমার মতো আরও অনেক মায়েরা। শুনেছিলাম আমাদের এই অনন্ত যাত্রা নাকি গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর অর্থাৎ কবরখানায় পৌঁছনোর জন্যে। কি নিষ্ঠুর যাত্রা! খিদে তেষ্টায় আমাদের তখন পাগলের দশা। কয়েকজন তো পথেই মারা গেল। কিন্তু সব চাইতে কষ্টকর আমাদের বাচ্চাদের ছিনিয়ে নেওয়া। অনিশ্চয়তার বোঝাই সবচেয়ে অসহ্য ঠেকছিল। ওদের ভাগ্যে কি রয়েছে, ওদের কি অন্য কোথায় সরিয়ে নিয়ে যাবে? কোন অনাথ আশ্রমে পুরে অত্যাচার করবে? তারি মাঝে একবিন্দু সান্ত্বনা—সবই

সহ্য করা চলে শুধু ওরা যদি প্রাণে বাঁচে। আমাদের নিয়ে যা খুশি করুক, কিচ্ছু যায় আসে না।

তারপর শিশুর দল রেললাইন অতিক্রম করল। বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষমান অনেক যানবাহন নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে অনুগতভাবে ধূমায়িত চিমনীর পথ ধরে ওরা চলে গেল।

আমরা সবাই তখন গরাদের ওপর ঝুঁকে। পরিষ্কার দেখলাম বাচ্চাদের নিয়ে ওরা চলে গেল। শুধু তাই নয়, আমি আমার সোনাকেও দেখলাম। চিৎকার করে ডেকে উঠলাম। জ্ঞান হারাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চোখে পড়ল সোনা আমার মুখ ফিরিয়ে দেখছে। যেন আমার ডাক শুনেই তাকাচ্ছে। অন্য মেয়েরাও দেখতে উৎসুক—আধ পাগল। ঠেলে আমাকে সরিয়ে দিল। গাড়ির মেঝেয় পড়ে গেলাম, মাড়িয়ে সবাই একশা করে দিল। তাই কিছু জানতে পারিনি – কিচ্ছু না। পরে শুনেছি প্রাণ ফাটানো সেই কান্নার আওয়াজে চটপট নাকি গাড়ি ছেড়ে দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। মায়েদের সেই কান্না এক প্রলয়ংকরী বন্যার মতো—কি ভৎর্সনা, কি আঘাত, এমন কি এত যে গুলি ছোঁড়া হয়েছে তারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

এরপর শুরু হল মায়েদের পারস্পরিক সান্ত্বনা দেবার পালা। (কারণ আশা এমনই একটা জিনিস যার মরণ নেই।) অনেকে বলতে শুরু করে এরা নাকি আমাদের ছেলে নয়। আমি নাকি দেখতে ভুল করেছি। এতটা যোগাযোগ কখনই ঘটতে পারে না। ওরা আমাদের ছেলে নয়—হতে পারে না। আমাদের ছেলে হলে নিশ্চয় ভাল ব্যবহার পাবে। অনাথ আশ্রমে রাখলেও রাখতে পারে, কিন্তু তা বলে হত্যা করবে না।

সবাই মিলে ক্রমাগত বলে চলে—না না, ওরা আমাদের ছেলে নয়। ওরা অন্য লোকের ছেলে।

আরে 'অন্যলোকের ছেলে' হবে কি করে? দেখছ না, ওদের জন্যে আমাদের হৃদয়গুলো কেমন খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে!

অতএব এই ভাবেই আমার সন্তান মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল আমারই সোনা, মুখে একগাল হাসি, তারারা কোথায় শোয় এই নিয়ে যার চিন্তা। আর যদি আমার ছেলে না-ই হয়, অন্য কারুর তো নিশ্চয়। শিশু নির্বিশেষে কি আর মৃত্যুর প্রকার ভেদ হবে। একসঙ্গে একদল ছেলেকে ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হত্যা! মোজার ফুটো দিয়ে বাচ্চাগুলোর আঙুল দেখা যাচ্ছিল। ধুলোমাখা হাতের চেটো দিয়ে নাক মুছছিল আর মাথার ফুরফুরে চুলগুলো ঠিক যেন চড়ুই পাখির বাসা। এই নিষ্ঠুরতার আবরণ উন্মোচন করতে পারে এমন কি কোন শব্দ আছে? সে সময় মায়েদের মনে যে কি হচ্ছিল লিখে কি তা প্রকাশ করা যাবে?

সবচেয়ে আক্ষেপের কথা আমি বেঁচে রইলাম। অবশ্য হৃদয়-স্পন্দন সেই সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু, আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে লজ্জা পেত, অগত্যা বেঁচে গেলাম। যুদ্ধশেষে আমি ফিরে এলাম, কিন্তু আমার ছোট্ট সোনা আর এল না।

সবই তো শুনলেন। নিজের ছেলেকে নিজের চোখে দেখলাম মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে—আমার কাহিনী এই পর্যন্তই।

কাকে যেন একবার বক্তৃতার মধ্যে বলতে শুনেছিলাম যুদ্ধের সময় এমন নাকি হামেশাই হয়, বাচ্চারা অবধি তখন লড়ে। ভুল—একেবারে ভুল। বাচ্চারা কখনও লড়াই করে না, ওরা শুধু কষ্ট পায়। সব যুদ্ধেই যোদ্ধার সংখ্যা কম, কিন্তু বলির সংখ্যা অনেক বেশী আর দুর্দশা অন্তহীন।

কেন এসব বকছি? কারণ আমি চাই আপনি এই নিষ্ঠুর কাহিনী লিখুন। লোকে হয়ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে এর চাইতে আনন্দদায়ক গল্প, প্রেম আর সুন্দরের কাহিনী পড়তে অনেক ভাল লাগে। বলুক গে!

লোকে যে আবার আরেকটা যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছে।

আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের এখন আর এমন কিছু নেই যা যুদ্ধ

এসে ধূলিস্যাৎ করে দিতে পারে। এই কাঁপা জীবনটায় কি আছে যে নতুন করে কেড়ে নেবে? কিন্তু কথা তা নয়। আরও তো অনেক মা আছে যাদের খোকারা জীবিত, যারা আমার সোনার মতোই হাসি-মুখে ঘুম ভেঙে ওঠে, ঘুমোবার সময় ঠিক তেমনি ক্লান্ত দেখায়। খোকার যা-যা খেলনা ছিল ওদেরও নিশ্চয়ই তাই আছে। নিশ্চয় ওদের ভ্রূর ওপরে ছেলেমানুষি স্বপ্নেরা আজও খেলা করে।

আমার যা কিছু লিখতে বলা সবই এদের জন্যে। সবাইকে বলে দেবেন আমি নজর রাখছি। আর সেইসঙ্গে দুনিয়ার মায়েদেরও বলে দেবেন প্রত্যেকে যেন নজর রাখে। লোকে যখন যুদ্ধের কথা পাড়ে, অস্ত্র শানায়, আমি শুধু শুনতে পাই হত্যার সেই মুহূর্তে শিশুদের করুণ আর্তনাদ। পার্কের মধ্যে ছাঁটি অথচ খেলায় মত্ত ছেলেপুলেরা আমার চোখে পড়ে না, আমি শুধু তাদেরই দেখি যারা যুদ্ধের শেষ দেখতে বেঁচে রইল না। দেখি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের মিছিল—মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে, সূর্যি মামা কি তাদের থালার মতোই বড়?

আমি এখনও কান খাড়া করে বড় বড় লোকেরা যুদ্ধ সম্বন্ধে কে কি বলছে শুনে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমার শোনা মানে একজন মায়ের কান দিয়ে শোনা, যে মা হাজার বছরের বুড়ি, হাজারো দুঃখে জর্জরিতা। আমার অসংখ্য সন্তানের সমাধিস্থল গুনে লোকে শেষ করতে পারবে না, যারা গেছে সবাই যে আমারই সন্তান। কারুর সাধ্য নেই যে ওদের মাঝ থেকে সেই একজনকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যে তার গোলগাল হাতদুটো দিয়ে আবার আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইবে।

যুদ্ধ? না, কিছুতেই না। যে শিশুরা মৃত্যু বরণ করেছে তাদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না? আমাদের সতর্ক করে দিতে যেন দামামা বাজাচ্ছে: আর যুদ্ধ নয়!

আমার নাম মেরী, আমার নাম কাতিয়া, আমার নাম র‍্যাচেল কিংবা পেনিলোপী। সহস্র নাম আমার—সারা জগতের আমি চিরন্তনী মা।

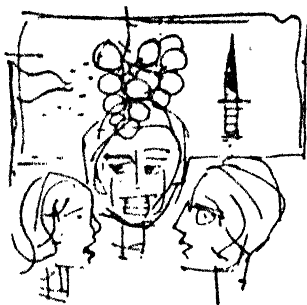
ওরা যুদ্ধের কথা বলে বটে, কিন্তু আমার কানেই ঢোকে না। কানে আসে শুধু শিশুদের আবোল-তাবোল বকবক আর মৃত্যু পথ-যাত্রীর অন্তিম আর্তরব।

দেখুন, যতদূর যায় আমি প্রসারিত করেছি আমার দু'হাত। যতটা পারি এই অত্যাচার ঠেকাব বলে মেলে ধরেছি আমার হাত দুটো। আর অত্যাচার আমি ঠেকাবই। যদি দরকার বুঝি। এই হাত যা আর কোনদিনই আমার সোনাকে আদর করার কাজে লাগবে না, কাজে লাগবে টুঁটি টিপে ধরবার জন্যে। যারা যুদ্ধের কথা পাড়বে তাদের টুঁটি টিপে ধরতে।

অনুবাদ | সিদ্ধার্থ ঘোষ

মহান আদর্শ

জাঁ ত্রদ্



'সাইলেন্ট ব্যারিকেড'-এর লেখক জাঁ ত্রদের জন্ম ১৯১৫ সালে। এই গল্পের রচনাকাল জুন, ১৯৪২। নাৎসী ডাক্তার হেড্রিচ্—বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়ার শাসনকর্তা হয়ে আসেন। কিন্তু চেকোশ্লাভিয়ার দেশপ্রেমিকরা তাঁকে হত্যা করে। নাৎসীবাহিনী তখন কয়লাখনি অঞ্চল লিদিসের জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালায় এবং সন্দেহজনক ব্যক্তিদের হত্যা করে।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে তাঁর চেহারাটা ছিল খুবই হাস্যকর। বেখাপ্পা ইস্তিরি না করা জামাকাপড়, তাও ঠিক মতো গায়ে লাগে না, ঢলঢলে আর মুখভর্তি বসন্তের দাগ। তাঁর ব্যাগটা সবসময় বোঝাই থাকত মোটা মোটা গ্রীক লাতিনের কেতাবে। এগুলির যেকোন পৃষ্ঠা থেকে তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করে যেতে পারতেন এবং তা করার সময় শব্দমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজের গলাটা যে ভাঙ্গা সে কথাটাও ভুলে যেতেন। যদিও এই অদ্ভুত চেহারার জন্যে তাঁর অন্য অনেক বেখাপ্পা নাম হতে পারত, তবু তাঁর বিশবছরের শিক্ষক জীবনে অন্যান্য স্কুলে যে নাম রাখা হয়েছিল সেটা এখানেও বহাল রইল। দিন দুয়েক গ্রীক-লাতিনের ক্লাসে মিনিট পনেরো ধরে তাঁর জ্বলন্ত বক্তৃতা শুনে, তৃতীয় দিনেই ছেলেরা তাঁর নামকরণ করল 'মহান আদর্শ'। তাঁর আসল নামটা চাপা পড়ে গিয়ে ঐ নামটাই চালু হয়ে গেল।

লাতিন রচনার ঘন নীল রঙের খাতার গাদার থেকে মুখ তুলে তিনি একদিন ক্লাসে ঘোষণা করলেন, 'মহান নৈতিক আদর্শ, যা তোমাদের অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে, সেই মহান আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে, পাশের ছেলের দেখে নকল করার মতো হাস্যকরজনক অসৎ

প্রচেষ্টাকে কোনভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।' গত কয়েকদিন ধরে সপ্তম শ্রেণীর সেই বছরের পাঠ্যসূচীর শেষ অধ্যায়ের বিশেষ কয়েকটি বাক্যের ওপর তিনি এত বেশী মনোনিবেশ করেছিলেন যে, পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না। অথচ, ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা চারদিকে ঘটে চলেছে। পুরনো আমলের গাম্ভীর্যসহকারে তিনি তাঁর কালিমাখানো অস্থিসর্বস্ব তর্জনটি তুলে শ্রুতিলিখনের প্রথম বাক্যটি উচ্চারণ করতে যাবেন, এমন সময় বাইরে থেকে উত্তেজিতভাবে কড়া নাড়ার আওয়াজ 'শোনা গেল। পেছনে আধখোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকলেন একটা ভয়ঙ্কর গুরুভারে তিনি স্তব্ধ, যেন বুকের ব্যথাটা চাপতে যাচ্ছেন এমনভাবে দরজার দিকে হেলে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ছাত্রদের জায়গায় বসে থাকার ইঙ্গিত করলেন।

হেডমাস্টার মশায়ের ঐ চেহারা এবং তার সঙ্গে অস্বস্তিকর থম্থমে আবহাওয়া হেসে উড়িয়ে দেবার জন্য রাইজানেক ফিস্ ফিস করে পাশে বসে থাকা মৌকাকে শুনিয়ে গ্রীকপুরাণ থেকে আবৃত্তি করল, 'হে স্পার্টার নাগরিকবৃন্দ ! আমি থার্মোপলির রণক্ষেত্র হইতে ত্বরায় আসিয়াছি !' কিন্তু তার এই রসিকতা মৌকার কানে ঢুকল না, একটা অজানা আশঙ্কার আকস্মিক পূর্বাভাসে সে কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অকারণে কলমটাকে কালিতে চুবিয়ে খাতার ওপর রাখল। কলমটা খাতা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, সমস্ত পাতাটার জায়গায় জায়গায় কালির ছোপ লেগে গেল।

'হাডেল্কা, মৌকা, রাইজানেক, তোমরা আমার সঙ্গে এস,' ভাঙা গলায় হেডমাস্টারমশায় বলে উঠলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় 'মহান আদর্শের' তর্জনীটা তখন নির্দেশ দেবার ভঙ্গিতে তোলা। তিনি জোর গলায় বললেন, 'আমরা এখন লাতিন রচনার পড়া শুরু করতে যাচ্ছিলাম, স্যার। আর নীতির দিক দিয়ে, এই ছাত্রদের অনুপস্থিতি··

হতভম্ব হয়ে গিয়ে ছেলে তিনটি তাদের পাঠ্যবইগুলি নাড়াচাড়া

করতে করতে উঠে দাঁড়াল। সহপাঠীদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে যেন নিজেদের বিপদটা আঁচ করতে চাইল। সবারই মানসপটে ভেসে উঠল গতকাল সুইমিং পুলের ওখানে বোকার মত তর্ক করার ঘটনাটা। রাইজানেক, যে ক্লাসের মধ্যে সবচাইতে বেশী কথা বলত, গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল, 'আরেকটা পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেল !'

হেডমাস্টারমশাই এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে চকিতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। 'মহান আদর্শ' তাঁর পিছু পিছু দৌড়ে গেলেন। তাঁর চিন্তা, তাঁর তিন জন সব চাইতে ভালো ছাত্র যাদের লাতিন অনুবাদের খাতা দেখার জন্য তিনি শিশুসুলভ আগ্রহে অধীর হয়েছিলেন, তারা ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারছে না।

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েই ছেলে তিনটি তাদের মাথার ওপর নেমে আসা বিপদটার স্বরূপ আঁচ করতে পারল। খোলা দরজা দিয়ে বারান্দার বড় জানালাটার আলোয় তারা ধূসর-সবুজ রং-এর চামড়ার কোট পরা তিনজন লোককে দেখতে পেল। মৌকা করুণ চোখে ক্লাসের দিকে ফিরে তাকাল, যেন একটা কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে সে, ওরা ওকে উত্তরটা একটু বলে দিক। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। হাডেলকা প্রথম সারিতে ওর ডেস্কের দিকে দৌড়ে ফিরে এসে ভয়ার্ত্ত ও পাগলের মতো তাড়াহুড়ো করে দোয়াতের ঢাকনাটা বন্ধ করল। তারপর আবার রাইজানেকের কাছে ফিরে গেল। রাইজানেকের হাত দরজার হাতলের ওপর। না, ও পেছনে ফিরে তাকাবে না, বিদায় নেবারও দরকার নেই।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। অন্য যারা ক্লাসে ছিল, তারা অনুভব করল একটা হিমশীতল ভীতি যেন তাদের শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে যাচ্ছে। এটা হল উনিশ শো বিয়াল্লিশের জুন মাস।

পাঁচমিনিটের মধ্যেই 'মহান আদর্শ, ক্লাসে ফিরে এলেন। তাঁর পা এত কাঁপছিল, যেন তিনি টেবিল পর্যন্তও পৌঁছতে পারবেন না। চেয়ারে ধপ্ করে বসে শীর্ণ আঙুল দিয়ে কপালটা চেপে ধরলেন এবং

শিশুসুলভ অভিযোগের ভঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'ভাবা যায় না, …সত্যি ভাবা যায় না।' তারপর তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে ক্লাসের দিকে তাকালেন, 'তোমাদের সহপাঠীরা…গ্রেপ্তার হয়েছে। কি অসম্ভব রকম ভুল বোঝাবুঝি, আমার…আমার ছেলেরা…'

সন্ধ্যা সাতটার সময় রাস্তার মাইকে, হেইড্রিখ-হত্যাকাণ্ড সমর্থন করার জন্যে যাদের সেদিন গুলি করে মারা হয়েছে, তাদের নাম ঘোষণা করা হল। ভয়ানক স্পষ্টভাবে শোনা গেল তিনটে নাম : ফ্রান্সিস্ হাডেলকা, চার্লস্ মৌকা, ভাস্তিমিল রাইজানেক।

পরদিন সকাল সাতটার সময় নিজেদের বসার ঘরে মাস্টারমশায়েরা জমায়েত হয়েছেন। সবাই চুপচাপ, কারো মুখে কথা নেই। জুন মাসের উজ্জ্বল রোদ বড় টেবিলটার ওপর এসে পড়েছে। তার রশ্মিতে বাতাসে ওড়া ধূলিকণাগুলোকে দেখাচ্ছে সোনার গুঁড়োর মতো। ভয় বিহ্বল কুড়িটি মানুষ ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করছেন, যেন ঘোর অন্ধকারে কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। এক একজন করে ঘরে ঢুকছেন, আর তাদের অসহায়তা যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে। চেকভাষার মাস্টারমশাই, কাল্ট্নার, জানলার ধার দিয়ে পায়চারি করছিলেন, সূর্যের আলো বার বার তাঁর শরীরে বাধা পাচ্ছিল। তাঁর ঘন কালো চুল, বিষণ্ণ মুখ। একসময়ে তিনি ২৮শে অক্টোবর, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখতেন। জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে তিনি হঠাৎ একটা চেয়ার আঁকড়ে ধরলেন। সকালের চোখ ধাধাঁনো আলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানোয় তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন একটা অপচ্ছায়া। অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন, 'এই হয়, প্রতিরোধের কথা বললে এমনই হয়! ওরা এখন আমাদের সবাইকে গুলি করে মারুক…ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ট্যাবর এ।'

হেডমাস্টারমশাই আরেকটা বুকের ব্যথা সামলে নিতে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অন্যরা সবাই চুপচাপ। দম বন্ধ করে রয়েছেন,

যেন ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। কথা বলার সাহস পেলেন একমাত্র ইতিহাসের মাস্টারমশাই। মুখমিষ্টি, চট্‌পটে গোছের মানুষ। ব্যাগ থেকে ভুভাঁজ করা একটা কাগজ বার করে টেবিলের ওপর পেতে রাখলেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং মন্ত্রী মোরাভেকের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম আনুগত্য ঘোষণা করে একটি বার্তা পাঠানো অত্যন্ত জরুরী বলে আমি মনে করি। আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে আমি এর একটা খসড়া তৈরি করেছি…'

থমথমে আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি ঘৃণা এবং গোলামীসুলভ প্রতিশ্রুতিতে ভরা কুড়িটি লাইন পাঠ করে গেলেন। তারপর কলমের খাপটা খুলে, স্বাক্ষরের জন্যে খসড়াটা এগিয়ে দিলেন স্কুলের প্রবীণতম শিক্ষকের দিকে ; ধর্মতত্ত্বের শিক্ষকমশায়ের বয়স সত্তর, অনেকদিন আগেই রিটায়ার করার কথা! কাঁপা কাঁপা হাতে তিনি খসড়াটা নিয়ে ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে লেখাটা পড়লেন। শেষ হয়ে গেলে কাগজটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি বাবা। জীবনের শেষ ধাপে এসে আর মিথ্যে কথা বলতে পারব না…'

তখন সিদ্ধান্ত হল যে এর চাইতে বরং সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে তাদের তিন সহপাঠীর অপরাধের নিন্দে করে একটি বক্তব্য রাখা হবে। আর সেই নিন্দাপ্রস্তাবটি যথাযথভাবে ক্লাস রেজিস্টারে তুলে রাখা হবে।

'কিন্তু এই কাজটি করবে কে?'

'কেন, ক্লাস টিচারই করবেন,' সমস্বরে বলে উঠলেন ইতিহাস আর চেকভাষার শিক্ষক দুজন।

যাদের ওপর এই দায়িত্ব পড়ল না, তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। 'মহান আদর্শ' কোন কথা না বলে তার মুঠো করা হাতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তিনিই সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষক।

[illegible] শ্রেণীর ঘরে কেউ আছে বলে মনে হল না। অন্য দিনের

মতো মৌমাছির গুঞ্জন তো শোনা যাচ্ছে না।

'মহান আদর্শ' ক্লাসঘরের দরজা খুলে ঢুকলেন। ছেলেরা নিয়ম-মাফিক উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানাল ঠিকই, কিন্তু তাদের গতকালের সঙ্গে আজকের অনেক তফাৎ। তারা যেন কতকগুলি ধোঁয়াটে প্রতিচ্ছায়া মাত্র, শুধুমাত্র ক্রমানুসারে বসার পদ্ধতিটা মুখস্থ থাকায় তাদের চেনা যাচ্ছে। তাছাড়া তাদের প্রত্যেকেই গতরাত্রে আজকের অনুপস্থিত তিন বন্ধুর শবানুগমন করেছিল।

তিনি আসন গ্রহণ করার পর ছেলেরাও যান্ত্রিকভাবে বসে পড়ল, যেন প্রত্যেকে যে-যার ভয়ের খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল। ভয়, না ঘৃণা!

'আমাদের ছেলেরা,' বলে তিনি শুরু করলেন, কিন্তু প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করেই তাঁর গলা বুজে এল। তিনি নিঃশ্বাস নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের একেবারে সামনে। কুৎসিত বসন্তের দাগওয়ালা মুখ, পরণে অবিবাহিতের লাট হয়ে যাওয়া পোশাক, হাঁটুর কাছে প্যাণ্টটা ঢলঢলে। 'আমার ছেলেরা,' তিনি আবার থেমে থেমে শুরু করলেন, কলারের চাপে যেন তাঁর গলাবন্ধ হয়ে আসছে, 'মাস্টার মশাইরা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন.... ইয়ে . মানে, গতকালের মর্মান্তিক ঘটনাটিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার···মহান নৈতিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে···'

সেই মুহূর্তে বিশজোড়া চোখ তাঁর দিকে তাকাল। যেন সেই বহু ব্যবহারে অর্থহীন শব্দটি হঠাৎ নতুন ভয়ঙ্কর প্রাণবন্ত একটা রূপ নিয়ে এসেছে। অনেক কষ্টে মাস্টারমশাই নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর হঠাৎ একটা ডুবন্ত মানুষের উন্মত্ততায়, যেন কথা শুরু করার আগেই দম আটকে যাবে এই ভয়ে, তাড়াহুড়ো করে বলতে শুরু করলেন, 'মহান আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তোমাদের শুধু এইটুকুই বলতে পারি, অত্যাচারীকে হত্যা করাটা অপরাধ নয়!'

ঐ একটি কথাই তাঁর সমস্ত উত্তেজনা ও বিভ্রান্তির অবসান

ঘটাল। তাঁর চিন্তা স্বচ্ছ হয়ে এল। এখন তিনি ক্লাসের প্রতিটি ছেলেকেই স্পষ্টভাবে চিনতে পারছেন, যাদের পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়িয়ে আসছেন। তারা সবাই এখন তাঁর প্রতিটি কথাই আঁকড়ে ধরছে। এর মধ্যে যেমন শান্ত স্বভাবের ভাল ছেলেরা রয়েছে, তেমনি আবার পাশাপাশি বখাটে ফাঁকিবাজ ছেলেরাও রয়েছে। হয়তো এদের মধ্যেই কেউ রাইজানেককে ধরিয়ে দিয়েছে। হয়তো বা কণামাত্র আক্রোশ, একটা ভুল বোঝাবুঝি অথবা গোপন মন কষাকষি, এর থেকেই আরও ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি ওদের কাছে একটা ডাহা মিথ্যে কথা কি করে বলবেন? গতকাল থেকেই যে কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে দানা বেঁধে গুমরে উঠছিল, গতকাল সকালে শিক্ষকদের বসার ঘরে যা প্রায় বলেই ফেলেছিলেন, এই ছেলেদের কাছে তা বলার জন্যে একটা অদম্য স্পৃহা বোধ করলেন। যাই ঘটুক না কেন, কথাগুলো এখন তাঁকে বলতেই হবে। ধীরে ধীরে, অনুত্তেজিত গলায়, ছেলেদেব সততার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, শান্তভাবে তিনি বললেন, 'আমি নিজেও হেইড্‌রিখ-হত্যার ঘটনাটিকে সমর্থন করি!'

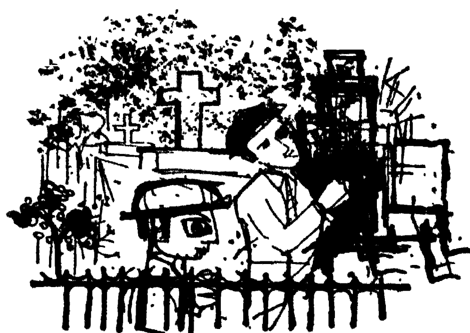
তাঁর যা বলার ছিল, তা বলা হয়ে গেছে। তিনি টেবিলের দিকে ফিরে গেলেন। তারপর চেয়ারে বসে পড়ে ক্লাসের খাতায় তাঁর বক্তব্য লিখতে শুরু করলেন। খাতায় তখনও কলমেব আঁচড় পড়ে নি, তাঁর রোজকার চেনা আওয়াজটি শুনতে পেলেন। 'মহান আদর্শ' ধীরে ধীরে তাঁর ছেলেদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। সপ্তম শ্রেণীর কুড়িটি ছাত্রই তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখে তাদের আগুন।

অনুবাদ। শুভ রায় বর্ধন

লাল শব

শ্বেতোস্লাভ্ মিনিকভ্



বুলগেরিয়ার এক আশ্চর্য শক্তিশালি লেখক শ্বেতোস্লাভ মিনকভ্। জন্ম ১৯০২ সালে রাজগ্রাদে। ১৯৩৬ সালে লেখক সংঘের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বলিষ্ঠতায় বিদ্রূপে তিনি মার্কিন ফ্যাসিজমের কুৎসিত নগ্ন মুখোশটাকে টেনে খুলে দিয়েছেন তাঁর অনন্য ছোট গল্প 'লাল শব'-এ।

পঞ্চাশ বছর আগে, অফুরন্ত শূকর আর ভুট্টার দেশ আইওয়াতে দিনের আলোয় প্রথম চোখ মেলেছিল জ্যাক প্যাটারসন। তার জন্মসময়ে ভাগ্য আমেরিকা-বিরোধিতা-সংশয়ের শিকার হয়ে ওঠেনি। তাই মানুষের ভাগ্য নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার স্বাধীনতা তখনও ছিল। নবজাত শিশুর দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে ভাগ্যদেবীত্রয় বলে দিলেন: শিশুটি হবে ব্যবসায়ী, বৃহৎ কাজ কারবারের মানুষ, টাকার ওপর গড়াবে।

বাস্তবিকই অনেক দুর্ভাগ্যের বেড়া ডিঙিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে জ্যাক প্যাটারসন শেষ পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াল। তার কাকা চিকাগোর খ্যাতনামা বক্সিং সংগঠক হার্ব চেম্বার্স মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তার উইলে জ্যাক প্যাটারসন যথেষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করল।

সে ছিল একটা ছোট্ট সংগঠনের সামান্য একজন বাজার প্রতিনিধি। সহসা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠল। কিন্তু ডলারের আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পুঁজি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতেই হবে। এ ব্যাপারে স্বর্গত হার্ব চেম্বার্সের সুখী ভ্রাতুষ্পুত্র অত্যুজ্জ্বল উদ্ভাবনী

বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল। তার স্থলাভিষিক্ত অনেকেই দুঃসাহসিক ব্যবসায়িক উদ্যোগের জালে জড়িয়ে ডুবে যেত অথবা তখনকার সেরা টুথপেস্ট নির্মাতার পরে ঘৃণা বর্ষণ করে বাজার নিয়ে খেলা শুরু করত। কিন্তু সে ছিল খুব উদ্যোগী পুরুষ। তাই এক যুগল বিনিদ্র রজনীর পরেই এই সিদ্ধান্তে এল যে, জীবনে সবচেয়ে নিশ্চিত জিনিস হচ্ছে মৃত্যু। এই নীতির প্রেরণায় নিউইয়র্কের কাছাকাছি সে আড়াই একর জমি কিনে ফেলল। আর সেটাকে কবরখানায় পরিণত করে তার নাম দিল 'শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যান'।

পাঠকদের কাছে হয়তো ব্যাপারটা অদ্ভুত একটু ঠেকতে পারে, কবরখানার মতো প্রতিষ্ঠানও নাকি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হবে! ঘটনাটা কিন্তু সত্যি, মৃতের শেষ বিশ্রামস্থলটুকুও আমেরিকাতে উদ্যোগী মালিকদের হাতে'থাকতে পারে।

জ্যাক প্যাটারসনও কেনা জমির ওপর আইনত মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তার স্বর্ণপ্রসূ পরিকল্পনার রূপ দিতে অগ্রসর হল। প্রথমে এলাকাটা ছোট ছোট প্লটে ভাগ করল। সাইপ্রাস আর ক্রন্দসী উইলোর ঘের-দেওয়া গলি তৈরি করল। ছোট্ট সুন্দর একটা ভজনালয় তুলল। তার সম্পত্তি ঘিরে তুলে দিল কংক্রীটের এক প্রাচীর। কবরখানার ফটকের সামনে বুদ্ধিমান মালিক কফিন, মালা এবং অন্যান্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্রব্যাদি বিক্রির জন্যে একটা দোকান খুলল। আর শেষ আকর্ষণ হিসাবে খুলল জ্যাজব্যাণ্ড এবং নৃত্যো-পযোগী-মেঝে-সমন্বিত একটি নৈশ ক্লাব।

কবরখানার জমিতে শব-গ্রহণের প্রস্তুতিপর্ব যখন সমাপ্ত হল, জ্যাক প্যাটারসন তার পিতৃব্যের দেহাবশেষ এনে সেখানে একটি বিশিষ্ট স্থানে কবর দিল। পরম হিতৈষীর কবরে কৃতজ্ঞ জ্যাক একটি মনোজ্ঞ স্মৃতিসৌধ তুলল। তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করল স্বর্গত হার্ব চেম্বার্সের ব্রোঞ্জ-নির্মিত মূর্তি।

কিন্তু প্রথম প্রজা-পত্তনের পর কবরে দেওয়ার জন্যে আরও অনেক

প্রজার প্রয়োজন। আর এখানেই দেখা দিল বিপত্তি। প্রত্যেকটা নতুন উদ্যোগের মতো শাশ্বত বিশ্রামের উদ্যানেরও প্রচার দরকার হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে জ্যাক প্যাটারসন শক্তিশালী সাবান-ফেনা বিজ্ঞাপন এজেন্সীর চতুর কর্মচারীদের ওপরে বিশ্বাস ন্যস্ত করল।

শীঘ্রই সংবাদপত্রে নানান প্রলুব্ধকর বিজ্ঞাপন দেখা দিতে লাগল।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন : যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে—কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু আমাদের অনুসরণ করেই চলেছে। জ্যাক প্যাটার-সনের অন্ত্যেষ্টি উদ্যোগ আপনার জন্যে নিশ্চিত করে রেখেছে একটি রোমাঞ্চকর নিভৃত কোণ শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে—অত্যন্ত আকর্ষণীয় সর্তে।

নিউইয়র্ক টাইমস্ : নরক যন্ত্রণা থেকে আপনার আত্মাকে বাঁচান। শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে শায়িত হোন। একান্ত পাপিষ্ঠও সেখানে সরা-সরি স্বর্গে চলে যায়।

মর্ণিং পোষ্ট : কোথায় নাইটিঙ্গেল পাখি সবচেয়ে মধুর গান গায়? জ্যাক প্যাটারসনের শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে। কোথায় মৃতেরা জীবনের সমস্ত সুবিধা উপভোগ করে? জ্যাক প্যাটারসনের শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে।

ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর : মৃত্যু ও জীবনের মাঝখানে এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা যদি যাপন করতে চান, শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে জ্যাক প্যাটারসনের নৈশ ক্লাব পরিদর্শন করুন। প্রথম শ্রেণীর জ্যাজব্যাণ্ড। অপর জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

এই বিজ্ঞাপনগুলি প্রচারের একেবারে প্রথম দিন থেকে মানুষের মন জয় করে নিল। শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানের দ্বারে এসে পৌঁছতে লাগল বহুতর মানুষ। শুধু নিগ্রোরাই মৃত্যুর ওপারের এই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হল। অপ্রয়োজনীয় হাঙ্গামা এড়াবার উদ্দেশ্যে জ্যাক প্যাটারসন কবরখানার ফটকে বড় হরফে বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছিল : নিগ্রোদের প্রবেশ নিষেধ।

কালো গাড়িতে আবদ্ধ শান্ত অতিথিদের অভ্যর্থনা করত অনুগত কর্মচারীবৃন্দ। যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করত, কবর দেওয়ার সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানও হত সেই অনুপাতে। বিবিধ সম্মান প্রদর্শন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পালা কতদূর হবে তা নির্ভর করত মৃত ব্যক্তির আর্থিক সংগতির ওপর। দুশো ডলার দিলে তিন মিনিটের ধর্মীয় মন্ত্রপাঠসহ সুন্দর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। পাঁচশো ডলারে অর্ধেক পাপমুক্তি আর দশ-মিনিট-পর্যন্ত-ব্যাপ্ত আবেগারোহী ধর্মীয় স্তব। হাজার ডলারের খরিদ্দার অপর জগতে প্রবেশ করত এমন এক গাম্ভীর্যময় ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যে সমস্ত পাপ থেকে সে মুক্ত হয়ে যেত। ঐকতান সঙ্গীত হত এবং সম্পূর্ণ উৎসবটির চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হত।

সন্ধ্যায় জ্যাক প্যাটারসনের নৈশ ক্লাব দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। দর্শকদের মধ্যে জোড়া প্রেমিক এবং কড়া আবেগ যাদের পছন্দ এমনি সব লোকই প্রধানতঃ ভিড় করত। জ্যাজ সঙ্গীতের চড়া ঝঙ্কার উঠত, তার মধ্যে তারা হুইস্কি পান আর হৈ-হল্লা করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠত।

জ্যাক প্যাটারসন সেইসব সাধারণ মানুষদেরই একজন, যারা জীবনে তিনটে প্রধান অবলম্বনে উপরই ভরসা রাখে : ঈশ্বর, ডলার আর বিজ্ঞাপন-শিল্প।

একেবারে ছেলেবেলা থেকেই জ্যাক প্যাটারসন আমেরিকার বিশাল ভূমিতে পিঁপড়ের সারির মতো শ্রেণীবদ্ধ অজস্র ধর্মসম্প্রদায়ের নীতিকথা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোন দিকে ছোট্ট জ্যাকের মাথাটা ঘুরবে সেটা বড় কথা নয়। কতগুলি নির্দেশ তাকে এ কথাটা মনে করিয়ে দিত যে আমেরিকা হচ্ছে খৃষ্টীয় সভ্যতার শয্যা। এবং প্রত্যেক আমেরিকান নাগরিকের প্রাত্যহিক জীবনে ঈশ্বরের একটা সক্রিয় ভূমিকা আছে। ধীরে ধীরে অনেকগুলি বছর কেটে গেল। জ্যাক প্যাটারসন এই সমস্ত জিনিসের বাস্তবতায়

ঠিক তেমনি ভাবেই বিশ্বাস করত, যেমন তার বিশ্বাস ছিল রেফ্রি-জারেটার আর ওয়াশিং মেশিনের ওপর।

সাচ্চা আমেরিকান হিসাবে জ্যাক প্যাটারসনের কাছে ডলারই হচ্ছে সর্বশক্তিমানের শক্তির মূর্ত প্রতীক, এ হচ্ছে মানবিক উন্নতির এক যাদু চাবি। ডলারের স্বর্ণচ্ছায়া তাকে নিয়ত প্রলুব্ধ করেছিল। তার মনের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছিল, এমন কি তার স্বপ্নেও সেই স্বর্ণচ্ছায়ার আবির্ভাব ঘটতে লাগল। অর্থ সংগ্রহের কষ্টকর উদ্যমে অন্ধ হয়ে তার জীবনসঙ্গী কঠোরতার কথা সে ভুলে রইল। কখনও কখনও ক্লান্তিতে আর হতাশায় ভেঙে পড়ে সে হয়ত একেবারে দমে যেত, কিন্তু তক্ষুণি আবার উঠে দাঁড়াত ডলারের স্বর্ণচ্ছায়া খুঁজতে। সে স্বর্ণ-চ্ছায়া শেষ পর্যন্ত তার কোলে ধরা দিল।

কম্পিউটারের মতোই একখানি যান্ত্রিক মন ছিল জ্যাক প্যাটার-সনের। তার বিচার-বিবেচনা ছিল সরল এবং ব্যবসায়িক। সে কখনও জটিল কিংবা বিমূর্ত ভাবনায় মনকে পীড়িত করে তুলত না। ঘটনার গা-বেয়ে-বেয়ে তার ভাবনা চলতো—সর্বদাই খুঁজে বেড়াত উচ্চতর মুনাফা। বিজ্ঞাপন শিল্পই ছিল তার সর্বক্ষণের অনুগত উপদেষ্টা। বিজ্ঞাপনের ভূত তাকে তাড়া করত। রেডিওতে টেলি-ভিশানে সংবাদপত্রে রাস্তাঘাটে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তাকে উপদেশ দিত, এবং তার উপর চাপিয়ে দিত বিজ্ঞাপনী মতামত। বিজ্ঞাপন তাকে বলে দিত কি খেতে হবে, কোন সিনেমা দেখতে হবে, আর কোন মিলনান্ত বইখানিই বা পড়তে হবে। বিজ্ঞাপনই তাকে বুঝিয়ে দিত কোন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে সমর্থন করতে হবে, আর এ বস্তুটিই তাকে শিখিয়ে দিত আশ্চর্যকর আমেরিকান জীবন-পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতে এবং সাম্যবাদকে ঘৃণা করতে।

যুদ্ধের পরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে জ্যাক প্যাটারসন আত্মবিশ্বাসে ভর করে উন্নতির সোপানে আরোহন করেছিল। ক্রমবর্দ্ধমান স্থির মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রত্যেকটি চলে-যাওয়া দিন তার

অন্ত্যেষ্টি প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধতর করে তুলছিল। কিন্তু আমেরিকার আকাশে তখন কালো মেঘ দেখা দিয়েছে এবং সে মেঘের অন্ধকার ঘনতর হয়ে উঠেছে। এটম বোমার অশুভ ছায়া মানুষের জীবনকে ত্রস্ত করে তুলেছে। একটা নতুন যুদ্ধের গুজব অবিরাম স্ফীত হয়ে উঠছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল সর্বত্র আর ঘন কুয়াসার মতো চেপে ধরছিল মানুষের মন। সংবাদপত্র তারস্বরে বলতে লাগল সোভিয়েত ইউনিয়নের আমেরিকা আক্রমণের সম্ভাবনা। রেডিও ষ্টেশন শোনাতে লাগল সর্বপ্রকারে কম্যুনিস্ট বিপদ প্রতিহত করার সাবধানবাণী। লোকের মনের শান্তি বিঘ্নিত হল। জ্যাক প্যাটারসনও তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। সাধারণ উত্তেজনার শিকার হল সেও। সেই প্রচণ্ড স্রোতের তোড় তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

লোকের অশান্তি বিশেষ করে তীব্র হয়ে উঠল যখন সিনেটর যোসেফ ম্যাক্‌কার্থী এক 'আমেরিকাবিরোধী কার্যকলাপ সমিতি'র সামনে পুরো আমেরিকা জাতিটাকেই হাজির করবেন বলে মনস্থির করলেন। প্রত্যেক দিন আমেরিকান নাগরিকগণ কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত হতে লাগলেন। এই সমিতি প্রচারকার্য পরীক্ষা করতে লাগলেন। অদ্ভুত মনে হলেও, সুশীল-সুবোধ ধার্মিক আমেরিকান জ্যাক প্যাটারসন জীবনে যে রাজনীতিতে আগ্রহ বোধ করেনি এবং কবরের ব্যবসায় আর ডলার অর্জনেই যার সমর্পিত তনুমন, শেষ পর্যন্ত তাকেও এই সমিতির থাবার মধ্যে পড়তে হল।

কোন এক সকালে পরীক্ষার্থে তার ডাক পড়ল। তাকে অসংখ্য প্রশ্ন করা হল। জবাবে সে বলল, 'কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সে নয়, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্বও সে করেনি এবং রাশিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা খারাপ বলেই সে মনে করে।' সমিতির চেয়ারম্যান রয় কর্ণিভার তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উইলট্রপ্ ষ্টিপল্‌জাজকে তুমি চেনো?' এক মুহূর্ত চিন্তা করে কিছুটা ইতস্ততঃভাবে জ্যাক প্যাটারসন বলল, 'যতদূর স্মরণ করতে পারি, এমন কোন লোককে আমি জানি না।'

'জীবিত নয়, মৃত। তোমার অন্ত্যেষ্টি প্রতিষ্ঠান তাকে কবর দিয়েছে,' কঠোর স্বরে মন্তব্য করলেন চেয়ারম্যান, '৪নং গলি, ২নং প্লট, ১৮নং কবর। ১৯৪৩ সালে উইলট্রেপ্ স্টিপল্জাজ সোবিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীর প্রয়োজনীতার কথা প্রকাশ্যে বলেছে।'

অভিযুক্তের মনে হল তার গায়ের চামড়া কুঁকড়ে উঠছে।

সামনের খোলা ফাইলের মধ্যে উঁকি মেরে মিঃ কর্ণিভার বললেন, 'আর পিটার পলি? তোমার প্রতিষ্ঠানই তাকে কবর দিয়েছে। ৭নং গলি, ৫নং প্লট, ১২নং কবর। তুমি কি জানো মৃত্যুর কিছুদিন আগে এই স্কুল-শিক্ষক পিটার পলি পঞ্চম সংশোধনীতে বিশ্বাস করে তার তৃতীয় জ্ঞাতি-ভাই কম্যুনিস্ট হ্যারল্ড ডগলাসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে এবং সেই কারণেই তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়?'

জ্যাক প্যাটারসন বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু চেয়ারম্যান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে তাকে থামিয়ে দিলেন, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছ জানি···হয়ত এ্যানি হাস্কিনস্কে জানার কথাটাও অস্বীকার করবে? ২নং গলি, ৬নং প্লট, ৯নং কবর। যুদ্ধের সময়ে এ্যানি হাস্কিনস্ রেডক্রশের প্রতিনিধি হিসাবে টাকাকড়ি এবং গরমজামা সংগ্রহ করেছিল রাশিয়ার লোকেদের জন্তে···। বেটি রীডিং-এ তার বাড়ি খানাতল্লাশী করে খ্যাতনামা রাশিয়ান লেখক শেখভের একখানা বই পাওয়া গেছে, হ্যাঁ বেটি.রীডিং লেন···'

সাম্যবাদী সাহিত্যের স্বর্গত পাঠিকার কবরের সঠিক স্থানটি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রয় কর্ণিভার ফাইল হাতড়াতে লাগলেন। এই অবকাশের সুযোগ নিয়ে জ্যাক প্যাটারসন আত্মসমর্থনে সচেষ্ট হল।

'কিন্তু মাননীয় হুজুর, ওরা তো সবাই আমার প্রতিষ্ঠানের মৃত খরিদ্দার। আমার অন্ত্যেষ্টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাম্যবাদের কি যোগ থাকতে পারে?'

'হ্যাঁ, চমৎকার সব লোক বটে, চমৎকার এক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত

খরিদ্দারই !' মিঃ কর্ণিভার চীৎকার করে উঠলেন। ক্রোধে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। 'স্বর্গত রাষ্ট্রদ্রোহীদের একটা আস্তানা। আরও অনেক কম্যুনিস্ট কর্মীর নাম আমাদের তালিকায় আছে, গোয়েন্দা, সন্ত্রাসবাদী—তোমার আপাত-নির্দোষ শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে তুমি তাদের আশ্রয় দিয়েছ।'

'কিন্তু সবাই তারা মৃত।'

'মৃত এবং এখনও বিপজ্জনক।'

পাষাণ-হৃদয় চেয়ারম্যানের সামনে হতবুদ্ধি ভীত জ্যাক প্যাটারসন দাঁড়িয়ে রইল। সে স্থির করল রাজনৈতিক সতীত্ব সম্পর্কে তার সর্বশেষ এবং সব চাইতে প্রামাণ্য সাক্ষ্য উপস্থিত করে চেয়ারম্যানকে তুষ্ট করবে। এক পা এগিয়ে সে পকেট থেকে বার করল রৌপ্যাধারে রক্ষিত চমৎকার বাঁধানো ছোট্ট একখানি বাইবেল। তার সামনের মলাটের মধ্যে গুঁজে দিল এক হাজার ডলারের একখানি নোট।

বাইবেলখানা মিঃ কর্ণিভারের হাতে দিয়ে জ্যাক প্যাটারসন বলল, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং কখনোই নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে এক হতে পারবো না। বাইবেল আমার প্রাত্যহিক পথপ্রদর্শক। দয়া করে একটু দেখুন কেমন করে সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদগুলির নিচে নিজের হাতে আমি রেখা টেনেছি।'

চেয়ারম্যান সুন্দর গ্রন্থখানার পাতা ধরে ওল্টাতে লাগলেন এবং ক্রোধ-শান্তির যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছে তার লুব্ধ চোখ তৎক্ষণাৎ তার মূল্যায়ণ করে ফেলল। তাঁর কঠোর মুখশ্রী বদলে অনেকটা অমায়িক ভাব ধারণ করল। সামনের স্তূপীকৃত কাগজের মধ্যে তিনি হাত চালিয়ে দিলেন।

হাল্কাভাবে বাইবেলখানা প্যাটারসনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মিঃ কর্ণিভার শান্তস্বরে বললেন, 'আমরা জানি তুমি একজন আদর্শ খ্রীষ্টান আর তাতে তোমার দোষ কিছুটা স্খালন করেও বটে। কিন্তু আমাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই তোমাকে সাবধান করতে হচ্ছে এখন থেকে

তোমার শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে সন্দেহজনক কোন মৃত নারী কি পুরুষকে আর আশ্রয় দিতে পারবে না। আমি তোমাকে আরও নির্দেশ দেবো তোমার কবরখানার ফটক এবং গলি থেকে লাল বিজ্ঞাপনী আলোগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। রঙের প্রশ্নে সেনেটেরিয়াল কমিটীর সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে লালটা অন্তর্ঘাতী রঙ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কবরগুলি গুপ্ত মাইক্রোফোন সজ্জিত করতে হবে, আর তোমার অভ্যাগতদের মধ্যে কম্যুনিস্ট এবং আমেরিকা-বিরোধী কার্যকলাপ ধ্বংস করার জন্য সাধারণভাবে সবরকম প্রয়োজনীয় সাবধানতা গ্রহণ করতে হবে।'

এই নির্দেশ দিয়ে মিঃ রয় কর্ণিভার মস্তবড় একখানা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আমরা স্থির করেছি, তোমাকে তিনমাসের কারাদণ্ডের স্থগিত শাস্তি দেওয়া হবে। ফেডারেল ব্যুরো অফ্ ইনভেষ্টিগেশনের সংগঠনগুলি তোমার বিশ্বস্ততা এবং ভবিষ্যৎ আচরণের ওপর নজর রাখবে।'

জ্যাক প্যাটারসনের ভাগ্যে দুঃসময় নেমে এল। লাল নিয়ন আলোর জায়গায় সে হলদে সবুজ আর নীল আলোর ব্যবস্থা করল। তার সম্পূর্ণ কবরখানাটা এবং নৈশ ক্লাব গুপ্ত মাইক্রোফোনে ছেয়ে ফেলল। কেবল মৃত লোকদের পরীক্ষার কাজটাই অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কঠিনতম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার বিস্ময়কর নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও তার মনে হল, সে যেন একটা অন্ধ গলির সামনে দাঁড়িয়ে। বাস্তবিকই, অন্ত্যেষ্টির জন্যে গৃহীত প্রত্যেকটি লোকের নৈতিক ও রাজনৈতিক নির্ভরযোগ্যতার সার্টিফিকেট সে দাবী করত। কিন্তু কেমন করে সে নিশ্চিত হবে যে বিপজ্জনক ব্যক্তি তার শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে ঢুকে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না? প্রত্যেকটি শব এসে পৌঁছলে সে নিজে পরীক্ষা করে দেখত। সর্বদাই সন্দেহ করত, শবের মধ্যে কতগুলো হয়ত কম্যুনিস্ট কলঙ্ক মুক্ত নয়। জীবিত লোকের কথাবার্তা কাজকর্ম থেকে সর্বদাই একটা ধারণা করে

নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মৃত হয়ে ওঠে একটা অতলস্পর্শ রহস্য, তার দিকে তাকাও—মুদিত চোখে নিশ্চল শুয়ে আছে, নিঃশ্বাসও ফেলছে না, কথাও বলছে না, তার জমে ওঠা মুখে ছোট্ট একটু সন্দেহজনক হাসি যেন বলতে চায়: এখন আর আমি কিছু কিছু আমেরিকা-বিরোধী ব্যাপার থেকে একেবারে মুক্ত নই।'

তার চারপাশের সব কিছুতেই জ্যাক প্যাটারসন ভীত হয়ে উঠল। কোরিয়ার যুদ্ধ বাধল। এটম বোমার ওপরে নেপাম ব্যাক্‌ট্রিয়লজিক্যাল এবং হাইড্রোজেন বোমার বৃহৎ অমঙ্গল ছায়া দিগন্তে প্রতিভাত হল। মনুষ্যরক্তের অশুচিগন্ধে বাতাস পঙ্কিল হয়ে উঠল। বইয়ের দোকানের শোকেসে শোভিত বই থেকেও রক্ত ঝরতে লাগল: নিহত হওয়ার আগে হত্যা কর, নিহত জো, রক্তাক্ত ছায়া। সিনেমা হলের সামনে রক্তরঞ্জিত পোষ্টার: ছয় রিভলবারের গান, মাথাকাটা মৃতদেহ, আমার হস্তে রক্ত চুম্বন কর। চৌমাথার টেলিফোন পোষ্টে ফাঁসি দেওয়া নিগ্রোদের দেহ আন্দোলিত হচ্ছে। রক্তাক্ত হিষ্টিরিয়ায় যন্ত্রণাবিদ্ধ আমেরিকা যেন একটা উন্মাদাগারে পরিণত হল।

সংবাদপত্র তারস্বরে শোনাতে লাগল: 'লাল, বাদামী এবং আধ-বাদামীদের সম্বন্ধে সতর্ক হও।' 'সোবিয়েত গোয়েন্দা তোমাকে ছেয়ে আছে।' 'রাশিয়ানরা ফ্লোরিডায় অবতরণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে।'

জ্যাক প্যাটারসনের ভয়টা আরও প্রবল হল। লাল বিপদ থেকে কবরখানা রক্ষার জন্যে, প্রধান প্রধান ছুটি এবং স্মরণীয় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিনগুলো বাদ দিয়ে দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিল।

রেডিও ষ্টেশন গর্জন করতে লাগল। 'অবিলম্বে মহাজাগতিক এটম-নিরোধক ঔষধ-পেটিকায় নিজেকে আবৃত করুন। আগামী কাল বড্ড বেশী দেরি হয়ে যেতে পারে।'

'প্রলয়ঙ্কর আকস্মিকতায় যে কোন মিনিট যুদ্ধ বাধতে পারে।'

'ডিলবি, ডিলবি, আরামদায়ক বড়ি ডিলবি সেবন করুন।'

জ্যাক প্যাটারসনের ভয়টা ক্রমশঃ আতঙ্কে পরিণত হল।

কবরখানাকে লাল শব মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে সে স্থির করল শুধু আট বছরের শিশুদের (এর চেয়ে বেশী বয়স্ক কারো ওপর সে বিশ্বাস রাখতে পারছিল না) এবং ষাট-উর্ধ্ব বৃদ্ধদেরই কবর দেওয়া হবে। খরিদ্দারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। আত্মরক্ষার তাগিদে তারা শীগ্‌গীরই ধরে ফেলল জ্যাক প্যাটারসনের শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানে পুলিসের ছায়া।

জ্যাক প্যাটারসন ঘুমতে পারল না। ভয়ানকভাবে তার মাথা ঘুরতে লাগল, চোখ হয়ে উঠল রক্তাক্ত। সে পালাতে চাইল, রাত্রির ভয়ঙ্কর সব স্বপ্নের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইল। স্বপ্নগুলো অন্তর্ঘাতী সব টিকটিকিতে ভরা, তারা তার গোড়ালি বেয়ে ওঠে, তাকে মুখ ভ্যাঙচায়, ধারাল দাঁতে হঠাৎ কট্ করে কামড়ে দেয়। কখনও কখনও তার মনে হয়, এই অদ্ভুত জীবগুলো আসলে ফেডারেল ব্যুরো অফ্ ইনভেষ্টিগেশনেরই চর—তারা তাকে আবার আমেরিকা-বিরোধী কার্যকলাপ সমিতির সামনে দাঁড় করাতে চায়।

রেডিও ষ্টেশন থেকে শুবার্তের অসমাপ্ত 'সিম্ফনি' প্রচারিত হচ্ছিল। হঠাৎ গান বন্ধ হয়ে গেল। শ্রোতাদের সাবধান করে বক্তা বলে উঠল : শুবার্ত যদি শুধু হোর্স কোম্পানীর ওটমিল খেতেন সিম্ফনিটা শেষ করার মতো সবল তিনি হতে পারতেন। হোর্স ওটমিল খেয়ে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে নৃশংস যোদ্ধা হোন।'

প্রচারবেদী থেকে নিরপেক্ষ ধর্মযাজকের দৈববাণীর কণ্ঠ বেজে উঠল : 'প্রস্তুত হও! মানুষজাতি আর কখনও শেষ দিনের এত কাছাকাছি হয় নি।'

জ্যাক প্যাটারসনের কবরখানার ক্ষয়িষ্ণু দশা। গলিতে গলিতে ঘাস বেড়ে উঠেছে। কবরে কবরে ঝোপঝাড়ের অরণ্য থেকে ঝুরি নেমেছে, সম্ভাবনাপূর্ণ আমেরিকার মাটির আদিবাসীদের লম্বা দাড়ির মতো। শাশ্বত বিশ্রাম উদ্যানের নিস্তব্ধতা শুধু নাইটিঙ্গেলের গানেই ব্যাহত হয়। কিন্তু কি তাদের গান কিংবা কড়াক্কড়িভাবে-লালবিহীন

নিয়মগুলি জীবিত কি মৃত কারোরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। জ্যাক প্যাটারসন এবার ধ্বংসের সম্মুখীন হল। তার জীবনের তিনটে প্রধান অবলম্বন—ঈশ্বর, ডলার এবং বিজ্ঞাপন শিল্প—চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। তার মনে হল একটা ভয়াবহ অতলস্পর্শ গহ্বরের কিনারায় সে দাঁড়িয়ে।

ঈশ্বর তার প্রতি উদাসীন। ডলার তার হাত থেকে উবে গেছে। আর বিজ্ঞাপন শিল্প, লাল বিপদ, কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র, বলশেভিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে করতে তার উত্তেজিত মস্তিষ্কে অগ্নি-বর্ষণ করে চলেছে।

এক বাদল অপরাহ্নে জ্যাক প্যাটারসন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে কবরখানায় পৌঁছল। চেহারা উস্‌কোখুস্‌কো, টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া তার পোশাক-পরিচ্ছদ। ঘাসে-ছাওয়া গলি দিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল। কোন অদৃশ্য শত্রুকে তাড়াবার জন্যেই বুঝি নুড়ি কুড়িয়ে কবরগুলোর দিকে ছুঁড়তে লাগল। তারপর জ্যাক প্যাটার-সন তার পিতৃব্য হার্ব চেম্বার্সের স্মৃতিসৌধের পাশে বসল। হঠাৎ কবরখানার নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে অদ্ভুত কণ্ঠে ইয়াংকী ডড্‌লের আনন্দ-গান গেয়ে উঠল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। জ্যাক প্যাটারসন গান গেয়েই চলল :

ইয়াংকী ডড্‌ল নগরে এসেছে
টাট্টু ঘোড়ায় চেপে
আহা যত মৃতদেহ দেখেছে কেবলি সকলি লাল।
আর জীবনের পথ কৃত্রিম তার।

জ্যাক প্যাটারসনের মুখে খেলে বেড়াচ্ছিল একটা পাগলামির হাসি। সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

অনুবাদ। আভা সিংহ

ভালোবাসা

টিবোর ডেরি





মার্কসীয় সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে টিবোর ডেরি আজ হাঙ্গেরীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় একটি নাম। জন্ম ১৮৯৪ সালে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন এবং বৈপ্লবিক ভাবধারার জন্যে দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন, বন্দী-জীবনের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে জীবন-বোধ আশ্চর্য রকম ভাবে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর এই 'ভালবাসা' গল্পটিতে।

বন্দীকারার দরজাটা খুলে গেল।

প্রহরী কি কেন দেখিয়ে বলল 'ধরো'।

বন্দী উঠে দাঁড়াল। রুদ্ধশ্বাস অপলক চোখে সে প্রহরীর দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রহরী দু' একপা আরও এগিয়ে এল, 'তোমার জামা কাপড় পরে নাও। এখুনি দাড়ি কামাতে লোক আসবে।'

সাত বছর আগে খুলে নেওয়া জামা জুতো ছোট্ট একটা পুঁটলিতে বাঁধা। তার ওপর একটা সংখ্যা লেখা। কোঁচকানো জামা প্যান্ট, কাদা মাখা জুতোজোড়ায় ছাতা পড়ে গেছে। হাত দিয়ে জামাটা ও মসৃণ করে নিল। তারপর যখন জামা জুতো পরে প্রস্তুত হল, নাপিত এল দাড়ি কামাতে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ওরা ওকে নিয়ে এল বন্দীশালার ছোট্ট অফিস ঘরে। আট দশজন বন্দী তখনও সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে, অথচ ওকেই প্রথম ডাকা হল।

টেবিলের ওপারে বসে একজন সার্জেন্ট, অন্য আর একজন দাঁড়িয়ে তার পাশে।

'এদিকে এস। তোমার নাম? মার নাম? গন্তব্যস্থল?'

'জানি না।'

'তার মানে?' সার্জেণ্ট অবাক চোখে তাকাল, 'তুমি তোমার গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কিছু জান না?'

'না। আমি জানি না ওরা এখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে।'

'ওরা তোমাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। ইচ্ছে করলে তুমি এখন বাড়ি ফিরে যেতে পার।'

বন্দী কোন উত্তর দিল না।

'ঠিকানা?'

'১৭ নং সিলফা স্ট্রিট।'

'কোন প্রদেশ?'

'বুদাপেস্ট, সেকেণ্ড।'

পাশের ঘর থেকে ওর ব্যক্তিগত জিনিসপত্তর নিয়ে আসা হল: সস্তা দামের হাতঘড়ি, ফাউনটেনপেন, চামড়ার পুরনো একটা মানি-ব্যাগ। ব্যাগটি খালি।

'এখানে সই কর', সার্জেণ্ট কাগজটা এগিয়ে দিল। আসলে ওটা ঘড়ি পেন মানিব্যাগের প্রাপ্তিস্বীকার।

'এটাও…' অন্য কাগজটা মাইনে বাবদ একশো ছেচল্লিশ ফরিনটস্-এর রসিদ। টাকাটা ওরাই গুণে টেবিলের ওপর রাখল।

বন্দী টাকাটা তার ব্যাগে ভরে রাখল। মানিব্যাগটা খুলতেই ছড়িয়ে পড়ল একটা সোঁদা গন্ধ। সবশেষে ওকে দেওয়া হল ছাড়পত্র। ডট্ ডট্ দেওয়া 'গ্রেপ্তারের কারণ' এর ঘরটা ফাঁকা।

দরজা দিয়ে ও বেরিয়ে এল। অন্য তিন জন বন্দীও ওর পাশাপাশি এগিয়ে চলল। কিন্তু ওরা ফটকের কাছে পৌঁছনোর আগেই দুজন সশস্ত্র প্রহরী ছুটে এসে ওদের পথ রোধ করল। বন্দী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সদ্য কামানো মুখ তার বিবর্ণ পাংশুল। একজন প্রহরী অন্য তিন জনকে মার্চ করিয়ে নিয়ে গেল। বন্দী ওদের গমন পথের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল।

'কি ব্যাপার, কি খুঁজছ?' অন্য প্রহরী ওকে জিজ্ঞেস করল। ও কিছু বলল না, একই ভাবে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

'যাও, ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।'

বন্দী হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রথমেই ওর হাত এসে পৌঁছল পকেটে, যেখানে ছাড়পত্রটা রয়েছে। পায়ে পায়ে ও এগিয়ে চলল। প্রহরী ওকে ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিল। ফটক পেরিয়ে রাজপথ। আরও কয়েক পা এগিয়ে ওর ভীষণ ইচ্ছে হল পেছন ফিরে তাকাতে, কিন্তু নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে এগিয়ে চলল। কান খাড়া রেখে পেছনে পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। আচ্ছা, ট্রামে ওঠার সময় হঠাৎ কেউ যদি আমার কাঁধ ধরে টানে কিংবা পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডেকে ওঠে! না না, আমি তো মুক্ত! সত্যিই কি তাই? ট্রাম স্টপেজে পৌঁছতেই চকিতে ও ঘুরে দাঁড়াল। না কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। রুমালে কপালের ঘাম মুছবে বলে পকেট হাতড়াল, পেল না। ইতিমধ্যে একটা ট্রাম এসে পড়ল। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে একজন প্রহরী নামল। বন্দী কুতকুতে চোখে ওর দিকে তাকাল, কিন্তু স্যালুট করল না। প্রথম শ্রেণীর কামরায় ও উঠে পড়ল। ট্রামটা চলতে শুরু করল।

সেই মুহূর্তে, যখন ও স্যালুট করল না এবং ট্রামটা চলতে শুরু করল ঠিক তখনি পৃথিবীটা যেন সশব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর মাথার ওপর, অনেক সময় ফিল্ম কেটে গেলে যেমন হয়। মনে হল ট্রামটা অসম্ভব দ্রুত ছুটছে। তখনও মাথা ওর ঝিমঝিম করছে। যখন চোখ খুলল, দেখল টাঙ্গার তেজী ঘোড়া দুটো দুলকি চালে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল। ওদের গলার বিচিত্র ঘণ্টাধ্বনি রূপকথার পরীর নৃত্যের মতো মনে হল। রাস্তার দুধারে অজস্র ব্যস্ত মানুষ—শিশু, পুরুষ, নারী। বন্দীর মনে হল ওর চোখ যেন ওদেরই মধ্যে কাউকে খুঁজছে। কথাটা মনে হতেই ও দ্রুত কামরার মধ্যে চলে গেল। মহিলা কনডাক্টরের কোমল কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। ও টিকিট করল। এমনকি একটা

ফাঁকা আসনও পেয়ে গেল। ভাবল আর কিছু ভাববে না। নইলে নিজেকে ধরে রাখা কঠিন হবে। তাই জানলা দিয়ে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। অদূরে ভাঁটিখানার সামনে দাঁড়িয়ে কে যেন একটি তরুণীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আর একবার কপালের ঘাম মোছার জন্যে ও পকেটে রুমাল খুঁজল। একজন শ্রমিক ওর পাশের আসনে এসে বসল। খোলা ব্যাগে তার গোটা ছয়েক বিয়ারের বোতল। কনডাকটর ভদ্রমহিলা হেসে ফেলল, 'বড্ড কম হয়ে গেল না?'

'কি করব সিস্টার, আমার স্ত্রী তাঁর বৃদ্ধ স্বামীটিকে চোখে চোখে রাখতে ভালবাসেন।'

'এত ডার্ক বিয়ার দেখছি?'

'হ্যাঁ, সিস্টার।'

'কিন্তু হালকা বিয়ারই তো ভাল।'

'কিন্তু আমার স্ত্রী যে ডার্ক বিয়ারই বেশী পছন্দ করেন।'

'একটা বোতল বরং আমার জন্যে রেখে যান না।'

শ্রমিক স্তম্ভিত, 'এই ডার্ক বিয়ার নিয়ে আপনি কি করবেন?'

'বাড়িতে স্বামীর জন্যে নিয়ে যেতাম।'

'কিন্তু উনি যে হালকা বিয়ার বেশী পছন্দ করেন?'

সারা শরীরে ঢেউ তুলে সিস্টার ঝরনার মতো হেসে উঠল।

টারমিনাসে এসে বন্দী ট্রাম থেকে নেমে ট্যাক্সি ধরল।

কিছুটা এগিয়ে যাবার পর, ওকে কিছু বলতে না দেখে ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

'বুদায়।'

ড্রাইভার পেছন ফিরে ওর মুখের দিকে তাকাল, 'কোন্ সেতু দিয়ে যাব?'

বন্দী সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবল, সত্যিই তো কোন সেতু দিয়ে যাব। একটু নিস্তব্ধতার পর ও বলল, 'মারগিট ব্রিজ।'

ট্যাক্সির গতি বাড়ল। বন্দী মাথা উঁচু করে সোজা সামনের দিকে

তাকিয়ে রইল। ধুলোর গন্ধ, টাঙ্গার টুংটাং শব্দ, অকৃপণ সূর্যালোক, দু'ধারে মানুষের ছায়া, তাদের পদসঞ্চার, দোকানের সামনে একটি তরুণী, রাস্তার মোড়ে ফুলে ফুলে ছাওয়া বাদাম গাছটা ওকে যেন পাগল করে দিল।

'এখানে একটু দাঁড়ান। এক প্যাকেট সিগারেট নেব…'

একটু এগিয়ে সুন্দর সাজানো একটা সিগারেটের দোকানের সামনে ট্যাক্সি থামল। 'কি সিগারেট বলুন, আমি এনে দিচ্ছি।'

'যা খুশি। আর একটা দেশলাই…'

দু তিন মিনিটের মধ্যে ড্রাইভার ফিরে এল, 'নিন।'

বন্দী প্যাকেট খুলে ওকে একটা সিগারেট দিল, নিজেও ধরাল। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। বাঁধানো পথ ধরে গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলল।

'প্রথমে আপনাকে দেখে ভেবেছিলাম অসুস্থ, বোধহয় হাসপাতাল থেকে ফিরছেন,' ড্রাইভারই প্রথম আলাপ জমানোর চেষ্টা করল। 'কিন্তু জামা কাপড়ের অবস্থা দেখে বুঝলাম জেল থেকে ফিরছেন। কতদিন ছিলেন?'

'সাত বছর।'

ড্রাইভার মুচকি হাসল, 'নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কারণে?'

'হ্যাঁ! প্রথম দেড় বছর ছিলাম আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলে। সাত বছর পরে এই প্রথম বাইরের পৃথিবী দেখছি।'

'স্বাভাবিক। সাত বছর কারুর জীবনে কম সময় নয়।'

স্টেশনের কাছে এসে পৌঁছতে ও ট্যাক্সি থামাতে বলল। ভাবল বাকী পথটুকু হেঁটে যাবে, অন্তত স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে একটু সহজ করে নেবে। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে ভাড়া দিতে গেলে, ড্রাইভার নিতে অস্বীকার করল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই রাজী হল না, 'না কমরেড। আপনার এখন টাকার দরকার, ওটা রেখে দিন। আর শরীরের দিকে কড়া নজর রাখবেন। রোজ একটু করে মাংস আর আধ বোতল মদ কিনবেন।

'ধন্যবাদ! দীর্ঘদিন আপনার কথা আমার মনে থাকবে, কমরেড।'

'বিদায়!'

রাস্তার ওপারে কাপড়ের দোকানের সামনে লম্বা আয়নাটা দেখে ও দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। পাসারেং রোডে মানুষের ভিড় দেখে, পাহাড়ের দিকে টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া হেরম্যান অটো রোড ধরে ও এগিয়ে চলল। একদিকে খোলা মাঠ, অন্যদিকে দিগন্ত বিশারী পাহাড়। বেশ কিছুটা এগিয়ে ও ক্লান্তি অনুভব করল। বসে পড়ল সবুজ ঘাসে। সামনে বেড়া দিয়ে ঘেরা বেশ খানিকটা জমি। ফুলে ফুলে ভরে এসেছে সারা আপেল গাছটা। মোমের মতো উজ্জ্বল সাদা ফুল। এমন ঘন ঠাসা যে নিচে থেকে দেখলে আকাশ দেখা যায় না। প্রতিটি ফুলের মাঝে কোমল ধূসর পরাগ। ঘড়ির কথা ও ভুলেই গিয়েছিল। তাছাড়া দম দেওয়া হয়নি দীর্ঘদিন। ফলে সময়ের কথা ওর মনেই ছিল না। এবার উঠে পড়ল। ফুলে ফুলে ছাওয়া ফলের গাছ, রৌদ্রস্নাত সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ পেরিয়ে আধঘণ্টা পরে ও বাড়ি এসে পৌঁছল।

ওরা থাকত দোতলায়। সামনে একচিলতে ফুলের বাগান। গেটের সামনে লাইলাকের ঝোপ। সিঁড়ি দিয়ে ও ওপরে উঠে গেল। কিন্তু বেলের শব্দে কেউ সাড়া দিল না। তাই আবার নেমে এসে নিচের তলায় দ্বাররক্ষীর দরজার কড়া নাড়ল।

শীর্ণ চেহারার একজন বয়স্কা মহিলা দরজা খুলে দিল।

'সুপ্রভাত, মাদাম।'

'সুপ্রভাত। আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীকে। উনি কি এখানে থাকেন?'

'হা ঈশ্বর!' অস্ফুট স্বরে মহিলাটি চমকে উঠল।

নত চোখে ও মাটির দিকে তাকাল, 'ও কি এখনও এখানে থাকে?'

'তাহলে তুমি বাড়ি ফিরে এলে!'

'বাড়ি ? হ্যাঁ, বাড়িতেই। আমার স্ত্রী কি এখনও এখানে থাকে ?'

'প্রৌঢ় দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ, এইখানেই থাকে।'

'আর আমার ছেলে ?'

'হ্যাঁ, ও-ও। ও এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, দেখলে চিনতেই পারবে না।'

ও কিছু বলল না। মহিলা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। 'এস, ভেতরে এস। আমি জানতাম তোমার কোন দোষ ছিল না। আমি জানতাম একদিন তুমি ঠিকই ফিরে আসবে।'

'এত বেল বাজালাম, কিন্তু কেউ তো দরজা খুলল না ?'

'ভেতরে এসে বস। ওপরে এখন কেউ নেই। তোমার স্ত্রী কাজে গেছে, আর ছেলে স্কুলে। ফিরতে সেই বিকেল হবে।'

ও কিছু বলল না। একটু নিস্তব্ধতার পর মহিলা দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো দুটো চাবি থেকে একটা বেছে নিল। 'ফ্ল্যাটের চাবি আমার কাছেই থাকে। চল, তোমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিই। তোমার এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, একটু বিশ্রাম আর স্নান।'

'কিছু ভেব না, ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ফ্ল্যাটটা ছোট্ট, উত্তর মুখো। খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ে পত্রবহুল একটা গাছ। দূরে সবুজ পাইনে ছাওয়া পাহাড়ের চূড়া। পূর্বের সেই একই বহু পরিচিত ছবি, তবু কি আশ্চর্য নতুন মনে হল। সারা ঘরে অনুভব করল স্ত্রীর উষ্ণ উপস্থিতি। চিনতে পারল সব কিছুই—চেয়ার, টেবিল, কাপবোর্ড, বই রাখার সেলফ্। বিছানায় আলতো করে বসে চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। টেবিলে ছোট্ট একটা হাত আয়না, ছাইদানীর ওপর বাচ্চাদের রবারের একটা বল।

রুটি মাখন কফি নিয়ে প্রৌঢ়া যখন ফিরে এল, ও তখনও চুপচাপ

একই ভাবে বসেছিল। প্রৌঢ়া ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল, 'এইটুকু খেয়ে নাও। স্টোভে স্নানের জল বসিয়েছি।'

একটু পরেই বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে এল। পায়ে পায়ে ও নিচে নেমে এল। বাগানে গেটের কাছে আসতেই ও দূর থেকে স্ত্রীকে দেখতে পেল, সঙ্গে আরও চার পাঁচটা বাচ্চা। হঠাৎ ওর স্ত্রী কি যেন দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর ওর দিকে চকিতে ছুটে এল। ও-ও অবচেতন মনে খানিকটা এগিয়ে গেল। চিনতে পারল পশমের রঙিন পুল ওভার, যেটা গ্রেপ্তারের আগে ওকে ও কিনে দিয়েছিল। আশ্চর্য এর আগে সত্যিই কি ও এমন সুন্দর দেখতে ছিল। সাত বছর বন্দী জীবনের কল্পনার চেয়ে ও যেন আরও স্পষ্ট আরও সুন্দর! পরস্পরের আলিঙ্গনের মধ্যেই অদূরে দাঁড়ান বাচ্চাদের মুখের দিকে ও একে একে তাকিয়ে দেখল।

'কোনটে আমার খোকন?'

স্ত্রীর দুচোখ জলে ভরে এল, 'চল, আমরা ওপরে যাই।'

'কেঁদো না! বলো...' সে ওর কাঁধ ধরে নাড়া দিল, 'বলো কোনটে আমার খোকন?'

'দুষ্টুমী করে না, সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে...চলো, আগে আমরা ওপরে যাই।'

দ্রুত পায়ে স্ত্রী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। আগেরই মতো ছিপছিপে সুন্দর চেহারা। সোয়েটারের নিচে ছোট ছোট দুটি স্তনরেখা। এখন ও আর কাঁদছে না, কেবল ঘন চোখের পাতাদুটো তখনও জলে ভেজা।

'প্রিয়, প্রিয়তম আমার—' ওর আর্দ্র কণ্ঠস্বর মনে হল যেন অন্য কারুর। ঘরের ভেতর এসে তার কোলে মুখ গুঁজে অঝোর কান্নায় ও ভেঙে পড়ল। 'তোমার জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছি, প্রিয়তম আমার...দীর্ঘদিন।'

মাথাটা সে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে আদর করল। তারপর

অস্ফুটস্বরে বলল, 'হ্যাঁ, দীর্ঘদিন!'

'তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ?'

'আমি কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি?'

দুহাতে মালার মতো গলাটা জড়িয়ে ও আরও নিবিড় হয়ে এল তার বুকের মধ্যে, 'তুমি ঠিক সেই আগেরই মতো আছ, আগেরই মতো মিষ্টি আর দুষ্টু…'

'তুমি আমাকে ভালবাস?'

'বাসি! যতদিন বাঁচব, আরও নিবিড় নিবিড় করে তোমাকে ভালবাসব!'

দুহাতের স্তব্ধ করপুটে সে ওর মুখটা তুলে ধরল নিজের মুখের কাছে। 'এতদিন তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলে?'

'প্রতিদিন, প্রতিটা মুহূর্ত আমি শুধু তোমার কথা ভেবেছি! আমি জানতাম ওদের কাছে তুমি কখনও মাথা নোয়াবে না…' গাঢ় হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। আবেগে মদির ওর কণ্ঠস্বর, 'আমি জানতাম তুমি আবার ফিরে আসবে। তাই তুমি ছাড়া আমি আর কারুর কথা কখনও ভাবিনি, দুষ্টু আমার।'

'আমি অনেক পাল্টে গেছি…অনেক বুড়ো হয়ে গেছি, তাই না?'

'কিছুই এসে যায় না তাতে।' তার চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে আদর করতে করতে ও বলল, 'ভালবাসায় আমরা আবার সুন্দর হয়ে উঠব, তুমি দেখো।'

সে আর কিছুই বলল না, শুধু দীর্ঘদিন স্বপ্নে পরিচিত ওর চুলের গন্ধে মুখ গুঁজে গভীর নিশ্বাস নিল। মিষ্টি একটা আমেজে মুদে এল চোখের পাতা, 'আঃ প্রিয়তমা আমার!'

'খোকনকে এবার ডাকি?'

'না। আর একটু, শুধু আর একটু আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও, লক্ষীটি!'

অনুবাদ। অসিত সরকার

শিশু

ভান্দা ভাসিলিয়েভস্কা



দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বর্বর নাৎসী অত্যাচারের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে যে কজন সাহিত্যিক জন্ম নিয়েছেন, নিপুণ শিল্প চাতুর্য এবং জীবনবোধের নগ্ন বাস্তবতায় পোল্যাণ্ডের মহীয়সী লেখিকা ভান্দা ভাসিলিয়েভস্কা তাঁদের অন্যতম। ১৯৪৩ সালে 'স্তালিন পুরস্কার' প্রাপ্ত তাঁর 'রামধনু' এবং 'ভালবাসা' বহুভাষায় অনূদিত দুটি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস।

কার কথা যে লিখব? প্রতিদিনই তো ইতিহাসের পাতায় অজস্র বীরত্বের কাহিনী লেখা হচ্ছে। অথচ এমন অনেক কাহিনী আছে যা আগুনে বা রক্তের অক্ষরে লেখা না হলেও, তাতে রয়েছে এক দুর্জয় সাহস আর দেশের জন্যে গভীর আত্মত্যাগ।

বীরকাহিনীর এমনই একটি শিশুকে নিয়ে রচিত এই ইতিহাস।

ছেলেটির কোন নামের দরকার নেই। বছর বারো বয়েস। অন্য আর পাঁচ জনেরই মতো একজন। এই ছেলেটির কথা আমি লিখছি, যেহেতু এ একজনের নিজের চোখে দেখা।

গ্রামের সীমান্তে রাস্তার ওপর শোনা যাচ্ছে জার্মান সাঁজোয়ার শব্দ। কাছেই অরণ্য। ঘন জঙ্গলের আড়াল থেকে শত্রুদের বিপর্যস্ত করা যায় খুব সহজেই। গেরিলা বাহিনীর তরুণেরা ঢুকেছে সেই অরণ্যে। ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে। আর তাদের পেছন পেছন ছুটছে বারো বছরের একটি ছেলে। সেও ঢুকল সেই অরণ্যে, যেখানে পদে পদে ওত পেতে রয়েছে মৃত্যু।

গেরিলা হবার উপযুক্ত বয়েস তার নয়, তবু সে তরুণদের মতো যুদ্ধ করতে চায়। তার ধারণা আর সবায়ের মতো সেও বড় হয়ে গেছে, আর সবায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেও অস্ত্র ধরতে পারবে। বড়দের

তিরস্কারে তার চোখ ফেটে জল আসে। তবু সে খালি পায়ে ধুলো রাস্তায় ঘোড়ার পেছন পেছন আপ্রাণ ছোটে।

শেষে একজন অশ্বারোহী কি ভেবে থমকে দাঁড়ায়। জিন থেকে নিচু হয়ে তার হাতে কি যেন একটা দেয়, 'এই হাত-বোমাটা রাখ। সাবধানে গ্রামে ফিরে যাও। চোখ কান খোলা রাখো। বিশেষ কিছু চোখে পড়লে আমাদের খবর দিও। আর তেমন যদি বিপদ বোঝ, এটাকে ব্যবহার কোর।'

নরম আঙুলে ছেলেটা হাত-বোমাটা চেপে ধরল। চোখের জল তখন তার উধাও। হ্যাঁ, এখন তার আর কোন দুঃখ নেই, এখন সে বড় হয়ে গেছে। গেরিলাদের মতো তার হাতেও হাত-বোমা। বোমাটা জামার নিচে লুকিয়ে সে গ্রামে ফিরে এল এবং নির্দেশ-মতো সীমান্তে সতর্ক দৃষ্টি রাখল।

জার্মানরা সমস্ত ব্যাপারটা তখনও ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারেনি। তাই গ্রামের প্রান্তেই ছাউনি ফেলে রয়েছে।

ছেলেটা তাকিয়ে দেখল রাস্তার পাশেই একটা ছাউনিতে ওদের সদর দপ্তর। দরজায় সশস্ত্র প্রহরী। কতকগুলো জার্মান কর্মচারী ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ছেলেটার বুকটা একবার কেঁপে উঠল। তবু সে হাত দিয়ে দেখল, ওটা ওখানে ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। মনে মনে সংকল্প করল সোজা ঢুকে পড়বে ছাউনির মধ্যে, যাতে ওরা আর কখনও গ্রামের মধ্যে অবাধে লুটপাট, হত্যা, গৃহদাহ আর নরকের কদর্যতা সৃষ্টি করতে না পারে।

পায়ে পায়ে ছেলেটা ছাউনির দিকে এগিয়ে গেল। বুক এতটুকু কাঁপল না, চঞ্চল হল না চোখের পাতা। হাতের আকার ইঙ্গিতে সে সান্ত্রীকে বুঝিয়ে দিল সদর দপ্তরে একটা জরুরি খবর দিতে এসেছে, কর্মচারীদের সঙ্গে তার এখুনি একবার দেখা হওয়া দরকার।

বাইরে বেরিয়ে এল একজন সামরিক কর্মচারী। ভাঙা ভাঙা ইউক্রেনিয়ান ভাষায় জিগ্যেস করল ও কি চায়। ছেলেটার গলা

একটুও কাঁপল না। সোজা সে ওর চোখের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ঠিক তাই, সে খবর দিতে এসেছে কোথায় গেরিলারা লুকিয়ে আছে।

সামরিক কর্মচারী তাকে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে এল। বড় একটা টেবিল ঘিরে ছ'জন কর্মচারী মাথা নিচু করে কি যেন একটা মানচিত্র দেখছে আর চাপা গলায় ফিসফিস করে কি সব আলোচনা করছে। মানচিত্র থেকে চোখ তুলে ওরা ছেলেটার দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, সে কিছু গোপন খবর নিয়ে এসেছে যা ওদের কাজে আসতে পারে। কিন্তু সারাক্ষণ সে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল ঘরের চারদিকে। ছ'জন পদস্থ কর্মচারী, কাঁধে ওদের সামরিক পদমর্যাদার নিদর্শন। নিঃসন্দেহে ওরা উঁচু দরের অফিসার।

জামার নিচে ছেলেটা অনুভব করল হাত-বোমার সেই হিমেল ধাতব স্পর্শ, তার চোখেও স্পর্শ লাগল সেই হিম শীতলতার। মনে মনে সে হিসেব করে নিল, কোথায় কি ভাবে দাঁড়ালে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সফল হবে। এরই ফাঁকে ফাঁকে বুদ্ধিমানের মতো সতর্ক দৃষ্টি রেখে সে জবাব দিচ্ছিল—হ্যাঁ, না না···অমুক আর অমুক, হ্যাঁ··· ওরা সবাই গ্রাম ছেড়ে গেরিলার দলে যোগ দিয়েছে।

অস্থির উত্তেজিত হয়ে কর্মচারীরা তাকে আরও অজস্র প্রশ্ন করে, আর সে নিরুদ্বিগ্ন শান্ত গলায় তার কাটা কাটা জবাব দেয়। গল্প বলার ভঙ্গিতে এমন সব খুঁটিনাটি বর্ণনা টেনে আনে, যাতে অল্প কিছুটা সময় অন্তত হাতে পাওয়া যায়, আর ওরা ঘুণাক্ষরেও যেন সন্দেহ করার কোন অবকাশ না পায়।

সামরিক কর্মচারীরা প্রায় সবই বুঝতে পারল, জানতে পারল কারা কেমন করে গেরিলা হয়েছে। শুধু জানতে পারল না আসল কথাটাই। তাই সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে যিনি প্রধান, যিনি টেবিলের মাঝখানে এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন, এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'ওরা এখন কোথায় ?'

ছেলেটা পায়ে পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। এখন সে

ছ'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। শান্ত অথচ চাপা গলায় সে গর্জন করে উঠল, 'গেরিলারা সবখানে।'

কথাটি বলেই বিদ্যুৎ গতিতে জামার তলা থেকে বোমাটা বার করে সে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। লাফিয়ে ওঠার আগে, আর্তনাদ করে ওঠার আগে, কি ঘটছে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করার আগেই—ছ'জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আর সেই সঙ্গে বারো বছরের ছেলেটাও। একজনের বিনিময়ে ছ'জন। বড়দের মতো মুখে কঠিন রেখা। মৃত্যুতেও অম্লান কপালে বীরত্বের একটা দীপ্তি।

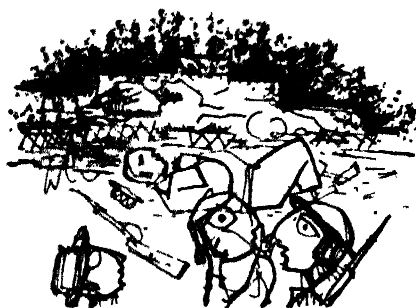
কোন কবরই এখন আর তাকে বন্দী রাখতে পারবে না। জ্বলন্ত মশালের মতো তার আত্মা সোনালী শিখায় জ্বলে উঠবে ইউক্রেনের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে, আওয়াজ তুলবে : প্রতিশোধ।

তাই বলছিলাম ছেলেটার নামের কি দরকার? যখন মাঠে মাঠে প্রজাপতির পেছন ছুটত ওর মা কি নাম ধরে ডাকত, কি হবে তা জেনে? তারই মতো এ পৃথিবীতে রয়েছে আরও কত অজস্র শিশু, বড়দেরই মতো যাদের দুর্জয় সাহস, যারা বোঝে, ভালবাসে, বড়দেরই মতো সগৌরবে যারা মরতেও জানে।

অনুবাদ। সন্ধ্যা সরকার

বন্দরে বিদ্রোহ

আলেকসান্দর সাহিয়া



রুমানিয়ার অন্যতম সংগ্রামী লেখক আলেকসান্দর সাহিয়া। জন্ম ১৯০২ সালে, সাধারণ এক কৃষক পরিবারে। কঠোর সংগ্রাম করে তিনি লেখাপড়া শেখেন, পরে ক্রাইওভা সামরিক কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৭ সালে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়েসে মারা যান।

জেটির ধারে জাহাজগুলো মাল বোঝাই হয়ে অপেক্ষা করছিল। সঙ্কেত জানানো হচ্ছিল, লোকজন চেঁচামেচি করছিল, কিন্তু জেটির দিকে কেউ এক পাও এগিয়ে আসছিল না। পাহারাদার সৈন্যরা আর বন্দরের দু'একজন কর্তাব্যক্তি পাগলের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিল।

শ্রমিকেরা কিন্তু ডকের বাইরে এসে অপেক্ষা করছে।

কোন হুকুমই আর পালিত হচ্ছিল না, বন্দরের পতাকা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। যখন কাজই বন্ধ হয়ে গেছে তখন পতাকার আর প্রয়োজনই বা কি!

'কমরেড মিখাইল, তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের ইচ্ছে অনুসারে তাকে কবর দিতে দেবে?'

যাকে প্রশ্ন করা হল, সে চুপ করে থাকল। লোকটি বেশ লম্বা, চওড়া পিঠ আর হাত দুটো বলিষ্ঠ; সে তার সামনের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে ছিল, তার নিচের ঠোঁটটা অবিরাম কাঁপছিল।

'কমরেড মিখাইল, আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, কারণ তোমার মতামত আমার জানা দরকার। বোধহয় তুমিই সবচেয়ে সাচ্চা লোক যে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারো। তুমি তো বহু বছর ধরেই

আমাদের ট্রেড-ইউনিয়নের নেতা। আর গ্যালাসিউক আমাদের খুব ভালো কমরেড ছিল।'

কমরেড মিখাইল কিন্তু উত্তর দিল না। চোয়ালের হাড় শক্ত করে সে ঠোঁটের কাঁপন বন্ধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। একটু নিস্তব্ধতার পর সে বলল, 'সিমিঅন, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমি জানি সেটা তোমার পক্ষে খুব কষ্টকর, কিন্তু তুমি যদি বরাবরের জন্যে কিছু পেতে চাও, তোমাকে আগে নিজেকেই চিন্তা করে নিতে হবে, নিজেকেই আগে দাঁতে চিবিয়ে দেখতে হবে। আমি বলতে চাইছি যে তুমি অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবে, তোমার বুকের মধ্যে ক্রোধের পাহাড় জমা করবে। তা ছাড়া তুমি এটা অন্য ভাবেও করতে পারবে না। একদিন বড়ো লড়াই লড়তে হবে, এবং তখন আর দীর্ঘ সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না।' রোগা আর ছোট খাট চেহারার মানুষ সিমিঅন স্থির চোখে মিখাইলের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত ভাবে অথচ থেমে থেমে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই, বড়ো লড়াই আসবে। কুড়ি বচ্ছর ধরে আমি আমাকে কামড়াচ্ছি আর ক্রোধে জ্বলছি, কিন্তু আর একটুও এটা আমরা ফেলে রাখবো না।'

'কমরেড সিমিঅন, আমি বুঝতে পারছি আর আমিও মানি যে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যে কোন বিদ্রোহের আন্দোলনই কেবল প্রলেতারিয়েতদের আদর্শের সহায়ক হতে পারে। শুধু, আমাদের সংগঠিত হতে হবে। যত সুন্দর ভাবে আমাদের লড়াইকে সুসংগঠিত করতে পারবো, ততই আমাদের জয় তাড়াতাড়ি এবং সুনিশ্চিত হবে। যেমন, এক্ষেত্রে আমরা গ্যালাসিউককে নিজেরা কবর দিতে চাই— যাতে সামান্য দু' এক ঘণ্টা কাজ বন্ধ রাখতে হবে। আমরা জিততে পারবো না: আমাদের মাত্র দু'শ অস্ত্র আছে, অন্যদিকে শহরের ওপারে কামান নিয়ে পুরো একটা সেনাবাহিনী আমাদের আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের আদর্শের সহায়ক হবে এমন কোন পন্থা আমার অবশ্যই ত্যাগ করবো না। আমি জানি আমাদের

কিছু জনের মৃত্যু হবে। কিন্তু তাদের মৃত্যু প্রলেতারিয়েতের আদর্শের জন্যেই আত্মত্যাগ, এলিজাবেতা গ্যালাসিউকের জন্যে আত্মত্যাগ, গ্যালাসিউকের সন্তানদের জন্যে আত্মত্যাগ।'

ডানিয়ুবের ওপরে এক ফালি লাল সূর্য দেখা দিল। রঙটা ঠিক যেন রক্তের—জ্বলন্ত লাল, যা প্রতীকের অর্থে মাটি ও জলকে রাঙিয়ে দিল। সাদা গাঙ্‌চিলেরা মাস্তুলের চূড়ায় ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল আর ডানিয়ুবের স্থির জলে তাদের ছায়া পড়ল।

বন্দরের মধ্যে চারজন ডকশ্রমিক ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটির তরফ থেকে কয়েক ঘন্টা ধরে গ্যালাসিউককে সমাধিস্থ করার প্রসঙ্গে কথা-বার্তা চালাচ্ছিল। শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে ছুটি চেয়েছে এবং তাদের কমরেডের শবানুগমন করে সমাধিক্ষেত্র পর্যন্ত যেতে চেয়েছে।

কিন্তু শহরের কর্তাব্যক্তিরা গোঁয়ারের মতো শ্রমিকদের দাবীর বিরোধিতা করেছে। এটা হতে দিলে মনে হবে যেন শ্রমিকদের মিছিল বেরিয়েছে, যা কিনা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ একজন ডক-শ্রমিককে কবর দেবার জন্যে কাজ বন্ধ করতে দিতে পারে না, বিশেষতঃ যখন পাথর বোঝাই জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছে গেছে।

বিকেল তিনটেয় মিছিল শুরু হবার কথা। বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের অনুমতি প্রত্যাহার করেছে, যেকোন রকম কাজ বন্ধ করা তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কিন্তু শ্রমিকরা তাদের নিজেদের তৎপরতায় কাজ বন্ধ করেছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের দিক থেকে শ্রমিকদের দিয়ে আবার কাজ শুরু করানোর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

খুব ঘটা করে ভয় দেখানো, জরিমানা করা, শিফ্‌টের কাজ বাতিল করা ইত্যাদি চলল। কিন্তু কেউই কাজে ফিরে এল না।

শ্রমিকদের প্রয়োজনের দিকে বন্দর কর্তৃপক্ষের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার প্রতি শ্রমিকদের যে অসন্তোষ, শ্রমিকদের এই সিদ্ধান্তে সেই প্রতিবাদ

প্রকাশ পেল। কেননা, গ্যালাসিউক হচ্ছে সেই ষষ্ঠ ব্যক্তি যে একটা সেতু ভেঙে যাওয়ায় জলে ডুবে মারা গেছে। শ্রমিকদের বহু অভাব অভিযোগ, যা বন্দর কর্তৃপক্ষ কোনদিনই পূর্ণ করেনি। তাদের অতি সহজ যুক্তি আরও শক্ত সেতু তৈরি করতে গেলে বেশী টাকার দরকার।

একটা কাঠের ছাউনির নিচে একগাদা খালি থলের ওপরে রাখা নতুন তৈরি একটা কাঠের কফিন, তার মধ্যে গ্যালাসিউক শায়িত অবস্থায় অপেক্ষা করছে। জলে ফুলে গেছে, ঠোঁট দুটো নীলচে, তাকে বেশ মোটাসোটা আর সুখী দেখাচ্ছে।

মাঝে মাঝে তার বউ এলিজাবেতা গ্যালসিউকের মুখের ওপর পাখার বাতাস দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, আর অঝোরে কাঁদছে। ও কান্না থামাতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না। হঠাৎ ও বলে উঠল, 'আমরা যদি আজ কবর দিতে না পারি রাত্তিরের জন্যে নতুন মোমবাতি দাবী করবো।' তারপরেই ও আবার কাঁদতে সুরু করল।

একদল শ্রমিক কয়লার গাদার ওপর বসেছিল, তাদের মধ্যের একজন গভীর স্বরে বলল, 'ইউনিয়ন দেবে, ট্রেড-ইউনিয়নে আমাদের সঞ্চয়ের টাকা আছে।'

এলিজাবেতার দুপাশে গ্যালসিউকের দুই ছেলে, আব্রাম ও মারকু, দুজনেই রোগা, আর চুলগুলো বেশ সুন্দর। তারা তাদের বাবার ফুলে ওঠা পেটটার দিকে তাকিয়ে ছিল আর কোত্থেকে যে তাদের বাবা অত খাবার খেয়েছে, তা বুঝে উঠতে পারছিল না।

হঠাৎ খুব জোরে কারা যেন চিৎকার করে উঠল। বাইরে শপথ নেওয়া আর ক্রমেই বেড়ে চলা একটা চিৎকার শোনা গেল।

ছাউনির নিচে বসে থাকা শ্রমিকেরা লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড়ে গেল। গণ্ডগোলে ভয় পেয়ে এলিজাবেতা তার বাচ্চা দুটোকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল আর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে মৃত গ্যালাসিউকের কাছ ঘেঁসে সরে এল, যেন সে তার কাছেই নিরাপত্তা আশা করে।

একটু পরে শ্রমিকরা দলে দলে কফিনের দিকে এগিয়ে এল এবং

মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলল।

'এলিজাবেতা, কেঁদ না, তোমার ভয়াবহ অবস্থার কথা আমরা বুঝি। যে দুর্ভাগ্য তোমার ওপর নেমে এসেছে, তা যেকোন শ্রমিক বউ-এর ওপরেও এসে পড়তে পারে।' ভিড়ের মধ্যে থেকে মিখাইল সামনে এগিয়ে এল এবং উঁচু মতো একটা জায়গা বেছে নিল। 'এখন আমরা তোমার কাছে আরও দুঃখের খবর নিয়ে এসেছি। যে বারোজন কমরেড গ্যালাসিউকের শবযাত্রার অনুমতি আনতে গিয়েছিল, তারা অনুমতি পায়নি। অবশ্য তা না পেলেও আমাদের কিছু এসে যায় না। আমরা তোমাকে কিছুতেই একা যেতে দেব না। তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে পার।'

এলিজাবেতা তার চারপাশে জমায়েত ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পড়ল। শিশু দুটো ভয় পেয়ে মার পা শক্ত করে চেপে ধরল।

ছ'জন মানুষ এগিয়ে নিজেদের কাঁধে কফিনটা তুলে নিল। পথে আরও শতাধিক শ্রমিক সেই মিছিলে যোগ দিল। ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বন্দর আর শহরের মাঝের রাস্তাটা এখন সরু একটা সাদা ফিতের মতো পড়ে রয়েছে সামনে। দু'ধারে উইলো-ঝোপের আড়ালে ল্যাম্পপোস্টগুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। শান্ত পায়ে মিছিল এগিয়ে চলেছে—মৌন, মূক। এমন কি গ্যালা-সিউকের বউও এখন আর কাঁদছে না। এতক্ষণ দু'জন শ্রমিকের হাতে ভর রেখে সে হাঁটছিল, এবার অশ্রুসজল চোখ দুটো মেলে দিল, 'কমরেডরা শুনুন, আমাদের একজন পাদ্রীর প্রয়োজন। আমি চাই না গ্যালাসিউকের শেষ কাজ পুরুত ছাড়াই হোক।'

'নিশ্চয়ই!' একজন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল, 'ব্যস্ত হয়ো না, পথেই আমাদের সঙ্গে পুরুতের দেখা হয়ে যাবে।'

কথাটা মুখে বললেও, সত্যি সত্যি পাদ্রীর কথা কিন্তু কেউই ভাবেনি। গত দু'বছর ধরে নিঃশেষিত বন্দর শ্রমিকেরা পুরুত ছাড়াই

তাদের মৃত সহকর্মীদের কবর দিচ্ছে। অবশ্য মৃত গ্যালাসিউককে নিয়ে শ্রমিকদের এই যে মিছিল, এর মর্যাদাই আলাদা।

অন্ধকার গাঢ় হতে তখন আর বাকী নেই। জায়গায় জায়গায় ম্লান আলোর রেখা অন্ধকারকে বিঁধছে। মিছিলের সারিটা নিস্তব্ধ আর বিষণ্ণ। বর্তমানে তারা মৃত এক কমরেডের সহযাত্রী। কিন্তু সকলেই তার নিজের নিজের পারিবারিক দুঃখ কষ্টের কথা ভাবছিল।

এলিজাবেতা তার বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভয়ে তারা কোন উত্তর দিতে পারছিল না, শুধু মার কাপড়টা শক্ত করে চেপে ধরে ছিল।

'বুঝতে পেরেছি, তোদের ক্ষিদে পেয়েছে।' কান্নায় মার গলা বুজে এল, 'আর একটু অপেক্ষা কর, তাড়াতাড়িই কাজটা মিটে যাবে।' কিন্তু সত্যিই কিভাবে যে ওদের ক্ষিদে মেটাবে সে নিজেও জানে না।

হঠাৎ সামনের রাস্তায় দ্রুত দৌড়ে আসা লোহার নাল লাগানো জুতোর শব্দ শোনা গেল। কেউ যেন চিৎকার করে উঠল, 'থামো।' সবাই থমকে উদ্বিগ্নভাবে শোনার চেষ্টা করল। পায়ের শব্দ আরও জোরে শোনা গেল এবং সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল। সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। সেই একই গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'সৈন্যরা আসছে, থামো।' সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। আতঙ্কে কে যেন ওদের গলা চেপে ধরেছে। তারপরে সকলেই দৌড়ে এসে কফিনের সামনে দাঁড়াল, যেন একটা বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করল। শুধু পেছিয়ে পড়ল এলিজাবেতা আর তার বাচ্চা দুটো।

শ্রমিকরা আর এগোল না। তারা শুধু সৈন্যদের উপর লক্ষ্য রেখে অপেক্ষা করে থাকল এবং লড়াই-এর প্রস্তুতি নিল। জলেডোবা মৃত একজন শ্রমিককে রক্ষা করবার জন্যে প্রত্যেকেই ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সৈন্যরা এখন তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে শুধু কয়েক পা-এর তফাৎ। রাস্তায় লড়াই বেধে গেছে। সৈন্যরা উন্মত্তের মতো মারছে, গালাগালি দিচ্ছে, আর তাদের দাঁতে

দাঁত ঘষার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বন্দুক থেকে একঝাঁক গুলিবৃষ্টি সমস্ত কিছুকে নরকে পরিণত করেছে। শ্রমিকদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। মিখাইল তখনও চিৎকার করে চলেছে, 'কেউ রাস্তা ছেড়ে যেও না, সামনে এগিয়ে যাও।'

কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। যে সব শ্রমিকদের আত্মরক্ষার জন্যে হাতে একটা ইট পর্যন্ত নেই, তাদের বন্দুকের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড ভাবে পেটানো হল। অনেকেই মাটিতে পড়ে গেল। সৈন্যদের ভারি বুটের তলায় পিষে গিয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। শ্রমিকরা চারিদিক থেকে আটক পড়ে প্রচণ্ড মারের মুখে শহরের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য হল।

যখন তারা লড়াই-এর জায়গা থেকে অনেকটা দূরে, যতই তারা দূরে সরে যেতে লাগল, ততই তাদের গালাগালগুলো এলোমেলো হয়ে পড়তে লাগল, শেষ পর্যন্ত লড়াইএর পুরো জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আর শহরের দিক থেকে ভেসে আসা সমস্ত গোলমালও থেমে গেল। রাস্তার বাঁ-ধারে পরিখার পাশে গ্যালা-সিউকের কফিনটাকে এলিজাবেতা আর তার বাচ্চা দুটো পাহারা দিচ্ছিল।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে দুটো মূর্তি বেরিয়ে এল, একজন মিখাইল অন্যজন সিমিঅন। গ্যালাসিউকের কাছে দুজনেই হাঁটু গেড়ে বসল।

এলিজাবেতা কাঁদছে। শ্রমিক দু'জন কাঁদছে না। তারা শুধু তাদের কপাল থেকে ঘাম আর রক্ত মুছে ফেলল।

'কমরেড এলিজাবেতা, চলো, আমরা বন্দরেই ফিরে যাই।' এলিজাবেতা কিছুই বলল না। সে অন্যমনস্ক ভাবে উঠে দাঁড়াল এবং এতক্ষণে প্রায় অসাড় আভ্রাম এবং মার্ক্‌কে টানতে টানতে নিয়ে চলল। শ্রমিক দু'জন কফিনটাকে তাদের কাঁধে তুলে নিল।

মিছিলটা এখন অন্ধকারে ফিরে চলেছে। কেউ চিৎকার করছে না।

গ্যালাসিউকের চারপাশে সত্যি কি ঘটে চলেছে, সে-সম্পর্কে

এলিজাবেতা অচেতন। তার হাত ধরে যে বাচ্চা দুটো চলছে, তারা কাঁদছে কি চুপ করে আছে, সে কিছুই জানে না। সে দু' একটা প্রশ্ন করছে, কিন্তু তার প্রশ্নের কেউ জবাব দিচ্ছে না। হয়ত তার কথা কেউ শুনতে পায়নি অথবা তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো কিছু নেই।

ছোট্ট মিছিলটা থামল। মিখাইল বুঝতে পারল সিমিঅন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারা একটু জিরিয়ে নেবার জন্তে কফিনটাকে আবার নামাল।

সিমিঅন ক্লান্ত গলায় বলল, 'যাই হোক না কেন, লড়াই বাধলে লড়তেই হবে। আজকের ব্যাপারে তোমার মন কি ভেঙে পড়েছে?'

মিখাইল কোন উত্তর দিল না এবং সিমিঅনও আর কোন প্রশ্ন করল না।

পাথর বোঝাই জাহাজ দুটো উন্মত্তের মতো বাঁশী বাজাচ্ছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আগামীকাল তারা বন্দর ছেড়ে যেতে পারবে না।

অনুবাদ। সুজিৎ ঘোষ, শাশ্বতী ঘোষ

একটি শিশু ও অনেক শিশুর জন্যে এই পৃথিবী

এল. জে. ডাভেন্ট্রী



একজন সাধারণ মানুষ, নিতান্তই সাধারণ, যুদ্ধকে সে ঘৃণা করে। অথচ যুক্তি দিয়ে বিচারকদের বোঝাতে পারে না কেন সে যুদ্ধে যেতে চায় না, কেন যুদ্ধকে ঘৃণা করে। তাই তার শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতকে অস্বীকার করে কালই তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যুদ্ধে যাবার আগের এই মুহূর্তটিকে তাই সে আনন্দ উৎসবে স্মরণীয় করে রাখতে চায়।

দুঃস্বপ্ন থেকে ঘুম ভাঙল ওর। যুদ্ধ করায় নাকি অনেক সম্মান। সাহস দেখাও, মর, শুকনো হাততালি কুড়োও। ব্যাস। ও হাসল স্বপ্নের কথা ভেবে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছাড়ল। ঘড়িটার টিক টিক শব্দ ওকে ফিরিয়ে দিল দুঃস্বপ্নের রাজ্য থেকে বাস্তব পৃথিবীতে।

বাইরে শীত। ঘন বরফ মেশানো কুয়াশায় ফুটপাতগুলো ঢেকে গেছে। ভীরু চড়ুই পাখিগুলো লুকিয়েছে বাড়িগুলোর চালের নিচে, তারা অপেক্ষা করছে লাল সূর্যটার জন্যে।

কালই চলে গেছে ওর বউ হাসপাতালে। বউয়ের কথা ভেবে ও আবার হাসল। মনে পড়ল কাল সন্ধ্যেবেলার কথা। ওর বউ বলেছিল, 'জানো, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তবে কি যে ঘটেছিল তা মনে করতে পারছি না বাপু। শুধু মনে হয়েছিল আমরা খুব সুখী। আর আমাদের দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই, এই পৃথিবীটা সত্যি কত সুন্দর! চোখের ওপর থেকে চুলের

গুচ্ছটা পেছনে ঠেলে দিয়ে আনন্দোজ্জ্বল চোখ দুটি মেলে মেয়েটা তারপর নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ যে ট্রাইব্যুন্যাল, এরপরও এ পৃথিবীতে সব কিছু ঠিক-ঠাক চলছে তা কি বলা যায়? মরুকগে, সবকিছুকে সহজ করে গ্রহণ করাটাই ভালো। তৈরি হয়ে নিয়ে ও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে ভিজে স্যাঁতসেঁতে রাস্তা। আশপাশের বাড়িগুলো যেন মৃত-প্রায়ের মতো ঝিমচ্ছে। বেড়াশূন্য রিক্ত বাগানগুলো বসন্তের প্রতীক্ষায় উন্মুখ। সবকিছুই কেমন যেন বিষণ্ণ, অসহ্য।

মুখের সিগারেটে আগুন জ্বেলে নিয়ে রাস্তায় টেলিফোন করার জন্যে ও থামে। এই মুহূর্তে হাসপাতালে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে ওর বউ, তবে সন্ধ্যেবেলা রোজকার মত ও যখন হাসপাতালে যাবে তখন একটি শিশুর সঙ্গে বউকে দেখতে পাবে এ আশ্বাসও ওকে দেওয়া হয়েছে।

স্বপ্নের মধ্যে যেন ও এগিয়ে চলল। আশ্চর্য, নতুন এক শিশুর জন্ম হবে এই সুসভ্য পৃথিবীতে। কিন্তু ভালো আছে তো ওর বউ? আশঙ্কায় পকেটের ভেতর ঢোকানো দুটো হাত ও মুঠো করে আবার খোলে। সামনেই একটা দোকান। দোকানের জানলায় দাঁড় করানো রয়েছে একটা পেরাম্বুলেটার। আশ্চর্য, এই জিনিসটাই এই মুহূর্তে ও চাইছিল নাকি? বিস্ময়ে ও থামল, তারপর দোকানে ঢুকে পড়ল।

'সুপ্রভাত স্যার। কি চাই আপনার?'

'মানে একটা পেরাম্বুলেটার চাই। কত দাম হবে?'

'দশ পাউণ্ড থেকে শুরু, যত দাম পর্যন্ত চাইবেন···' আগ্রহে বুড়ো দোকানী বলল। কিন্তু একটা পেরাম্বুলেটার কেনার সঙ্গতি কোথায়, সঙ্গতি কোথায় ছোটদের ঐ দোলনা খাটটা কেনার।

ক্রেতার অবস্থা বুঝে বিক্রেতা অসন্তুষ্ট হল, ওর পছন্দমত দরে জিনিস কেনার পক্ষে সস্তা দোকানের শরণাপন্ন হবার কথাই ওকে বলল।

ঠিকই বলেছে বুড়ো। আমার বাচ্চার জন্যে যে কোন পুরোন জিনিসেই চলে যাবে, মনে মনে ও ভাবল। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে স্টেশনের পথে পা বাড়াল।

কোর্টরুমের লাগোয়া অপেক্ষা করার ঘরটায় এসে ও পৌঁছল। একটু পরে ওর নাম ডাকা হল, ট্রাইব্যুনালের সামনে ও হাসি মুখে এসে দাঁড়াল।

তিনজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর দু'জন মহিলা। প্রৌঢ়দের মধ্যে একজনের কাঁধটা সামনের দিকে ঝোঁকানো, একজনের থ্যাবড়ানো নাক। তৃতীয় ভদ্রলোক হয়তো এদের মধ্যে প্রধান, কুঁজো চেহারা, বুরুশের মত খোঁচা খোঁচা গোঁফ।

তৃতীয় ভদ্রলোকই বললেন, 'হুঁ', তাহলে মানুষকে হত্যা করতে আপনার বিবেকে বাধে, কেমন?'

'ঠিক বলেছেন,' খুশি খুশি গলায় ও বলল।

সঙ্গীদের দিকে চাইলেন প্রধান বিচারক, সঙ্গীরা ফিরে তাকালেন ওর দিকে।

প্রধান বিচারক ধীরে ধীরে বললেন 'নিজের দেশের জন্যে লড়াই করার ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস নেই শুনলুম! কেন বলুন ত?'

'আমার দেশ বা যে কোন দেশ সারা পৃথিবীর একটা তো নগণ্য অংশ মাত্র।'

'বুঝিয়ে বলুন,' ক্লান্ত ভঙ্গি বিচারকের।

'এর আবার বোঝাবুঝির কি আছে! মানুষ একটা দেশে শুধু বাস করে না, মানুষ বাস করে এই পৃথিবীতে। নিজেরই মতো একজন মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার অর্থ তার নিজের অস্তিত্বের কারণকেই অস্বীকার করা।'

'হুঁ', ধর্মটর্ম করেন বুঝি?' পাদরী বিচারক বললেন।

'না, বিশেষ কোন অর্থে নয়।'

'তাহলে আপনি বলতে চান যে আপনার এই সিদ্ধান্ত কোন

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ?'

'শুনুন, কোন সিদ্ধান্ত আমি ভেবেচিন্তে খাড়া করেছি এ ধরনের কথা ভেবে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কেননা আমি বেঁচে আছি ; আমি বেঁচে থাকতে চাই, কেননা আমি এই জীবনকে ভালবাসি।'

প্রধান বিচারক নিজের আসনে অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নড়ে চড়ে বসলেন। তিনি মিষ্টি গলায় বললেন, 'তাহলে আমরা বুঝব যে ভুল। আপনি পছন্দ করেন না, কারণ আপনার মনে হয়েছে যুদ্ধ করা ভুল। যুদ্ধের কোন ব্যাপারে আপনি অংশ গ্রহণ করতে চান না।'

এক ভদ্রমহিলা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি কখনও ভেবেছেন যদি কোন জার্মান আপনার মা বা বউয়ের গায়ে হাত দেয়, তখন আপনি কি করবেন ?'

'আশ্চর্য, এর কি উত্তর দেব। সেই শয়তানকে আমি খুন করব।' থেমে যায় ও, তারপর বলে, 'হ্যাঁ তা সে যেই হোক, ইংলিশম্যান হোক বা আর যে কেউ হোক। লিখে নিতে পারেন আমার কথাটা।'

খাঁদা-নাক বিচারক এবার বলে উঠলেন, 'এই আপনি বলছেন একটা মানুষকে হত্যা করাটা অন্যায় আবার অকপটেই স্বীকার করছেন যে কোন বিশেষ ঘটনার চাপে আপনি হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এই দুটো বিপরীত বক্তব্য আপনি কি করে মেলাবেন ?'

আবার ও অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বউয়ের কথা ভেবে। এখন কেমন আছে ও ? প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ পরে তাই ও বলল, 'শুনুন, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি। অন্য জন্তুর চেয়ে মানুষকে মাত্র একটি জিনিস বড় করে তুলেছে, আর সেই জিনিসটা হল যুক্তিবোধ। যৌক্তিকতা থেকে মানুষ তার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে তার সংস্কৃতি। যুদ্ধ হল এই যৌক্তিকতাকে ভেঙে দেওয়া, যুদ্ধ মানে সর্বাঙ্গীন হত্যা। যুদ্ধ করার পেছনে সমগ্র মানবসমাজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া না। আমার নিজের কথাই বলি। আমার যুক্তিবোধ এই হত্যাকে কখনই

অনুমোদন করে না। শুধু আমি কেন, মানুষ কখনও যুদ্ধ চায় নি, যুদ্ধ চায় না।'

আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় ও। কেমন আছে ও হাসপাতালে? ওর অন্যমনস্কতা ভাঙল প্রধান বিচারপতির কথায়।

'আপনার যুক্তিগুলো অর্থহীন। যুদ্ধ ছাড়া কোন উপায় নেই, আসলে আপনি পালিয়ে বাঁচতে চান। সামরিক জীবনই আপনার রোগের একমাত্র ওষুধ। ঘুরে আসুন একবার। হ্যাঁ, আরও শুনুন, মিলিটারীতে না ঢোকবার জন্যে অনুমতি চেয়ে যে ওজর তুলেছেন তা আমরা গ্রাহ্য করতে পারলাম না। যান।'

প্রধান বিচারক যখন কথা শেষ করলেন, ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হঠাৎ নিজেকে ওর কেমন যেন অসুখী বলে মনে হল।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে ও টেলিফোন করল।

'খুবই দুঃখিত আমি আপনাদের আবার বিরক্ত করছি, আমার স্ত্রী এখন কেমন আছে বলতে পারেন?'

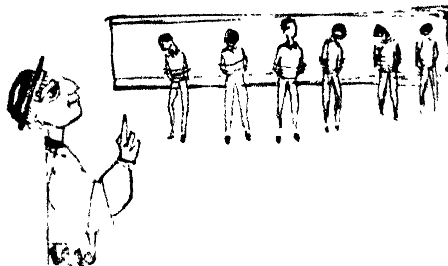
টেলিফোনের ভেতর থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। নার্সটি বলল, 'আপনার স্ত্রীর একটি মেয়ে হয়েছে। দুজনেই ভালো আছে।'

আচ্ছন্নের মতো ও টেলিফোনটা ছেড়ে বেরিয়ে এল। সারা রাস্তা ধরে ও চলে আর বিড় বিড় করে বলে, আমার মেয়ে হয়েছে। এই পৃথিবীতে নতুন এক প্রাণের জন্ম হয়েছে। জন্ম নিয়েছে সুন্দর একটি শিশু। কাল যাই হোক না কেন, আজ পৃথিবীর উৎসব, আজ উৎসব আমার নিজেরও। এখন এই মুহূর্তে কিছু পান করে ওর জন্যে আমি উৎসব করব।

অনুবাদ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

ছন্দ

চার্লস চ্যাপলিন



স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই অতুলনীয় গল্পের লেখক চার্লস চ্যাপলিন আজ বিশ্ববিশ্রুত একটি নাম। সম্ভবতঃ এইটিই বাংলায় প্রকাশিত তাঁর একমাত্র গল্প, প্রথম প্রকাশ হয় পরিচয়'এ।

কেবলমাত্র ভোরের প্রথম আলো এই ছোট্ট স্প্যানিশ কারা প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিল। ভোর! মৃত্যুর বার্তাবাহী! তরুণ লয়্যালিস্ট তখন দাঁড়িয়ে আছে বধ্যভূমিতে, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ। অফিসারদের ছোট্ট দলটি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুদণ্ড দেখবার জন্যে। ঠিক এই মুহূর্তটি সমস্ত দৃশ্যটিকে এক করুণ স্তব্ধতায় ছেয়ে দিল।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা আশা করেছিল স্টাফ-অফিসার মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের আদেশ পাঠাবেন। দণ্ডিত মানুষটি তাদের আদর্শের বিরোধী, কিন্তু স্পেনে সে ছিল জনপ্রিয়। একজন চমৎকার ব্যঙ্গরসিক সে, তার লেখা সহকর্মীদের মনকে অনেকখানি আনন্দে উৎফুল্ল করত। ফায়ারিং স্কোয়াডের অফিসার-ইন-কম্যাণ্ড তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। গৃহযুদ্ধের আগে ওরা ছিল বন্ধু। মাদ্রিদ য়ুনিভারসিটি থেকে ওরা দুজন এক সঙ্গেই ডিপ্লোমা পেয়েছে। দুজনে এক সঙ্গে রাজতন্ত্র ও গির্জার ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্যে সংগ্রাম করেছে। একই সঙ্গে তারা মদ খেয়েছে, কাফেতে রাত কাটিয়েছে, হেসেছে, পরিহাস বিনিময় করেছে এবং সারাটা সন্ধ্যা ভরে দিয়েছে নানারকম কূট-তর্কে। অনেক সময় তারা বিভিন্ন ধরণের সরকার সম্পর্কে ঝগড়াও করেছে। তাদের মতবিরোধও ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই সারা স্পেনে ডেকে আনল অশান্তি আর বিক্ষোভ।

তারাই এখন তার বন্ধুকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে কী লাভ? যুক্তি বিচারেরই বা কী দরকার? গৃহযুদ্ধ সুরু হবার পর যুক্তির আর কী প্রয়োজন আছে? নিস্তব্ধ কারা প্রাঙ্গণে অফিসারের মনে এ সমস্ত প্রশ্ন অতি দ্রুত ভিড় করে এল। না! অতীতকে অবশ্যই নির্মূল করে দিতে হবে। একমাত্র ভবিষ্যতই এখন বিচার্য। ভবিষ্যৎ? এ এমন একটি পৃথিবী যেখানে অনেক পুরনো বন্ধুদের আর দেখা যাবে না।

যুদ্ধ শুরু হবার পর এই একটি বিশেষ সকাল যখন তারা প্রথম আবার মিলল। কোন কথাই বলেনি, শুধু কারা প্রাঙ্গণে ঢোকার সময়ে তারা মৃদু হাসি বিনিময় করেছিল। এই করুণ সকাল কারার দেওয়ালে রক্তিম আর রূপোলী আলো ছড়িয়ে দিল। সর্বত্রই একটা স্তব্ধতা, এমন প্রশান্তি যার ছন্দের সঙ্গে এই কারা প্রাঙ্গণের ছন্দ একসূত্রে গাঁথা, এমন নিঃশব্দ তুরুতুরুনির ছন্দ যা বুকের স্পন্দনের মতো। এই নৈঃশব্দের মধ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের অফিসার-কমাণ্ডিং-এর কণ্ঠস্বর কারা প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হল: "এ্যাটেনশন!"

এই আদেশ শুনে ছ জন নিম্ন পদস্থ সৈনিক রাইফেল চেপে ধরল, তাদের শরীর কঠোর হয়ে উঠল। এই আদেশের পর খানিকটা বিরতি। দ্বিতীয় আদেশ এই সময়েই আসার কথা।

কিন্তু এই বিরতির সময়ে একটা কিছু ঘটল, যা ছন্দপতন ঘটাল। দণ্ডিত মানুষটি কাশল, গলাটা পরিষ্কার করে নিল। এই বাধা সমস্ত ঘটনার পারম্পর্যকে অদল-বদল করে দিল।

অফিসারটি ফিরে তাকালেন বন্দীর দিকে। সে কথা বলবে বলে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু সে কোন কথা বলল না। আবার নিজের সৈনিকদের দিকে ফিরে তিনি দ্বিতীয় আদেশ দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হঠাৎ তার মনে কী একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল, যেন স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেলেন।

তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সৈনিকদের সামনে। কী

ঘটছিল? কারা প্রাঙ্গণের এই দৃশ্য তাঁর কাছে ঝাপসা মনে হল। তিনি আর কিছুই দেখলেন না, বাস্তব দৃষ্টিতে শুধু একটি মানুষ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনে ছয়জন মানুষ এবং পাশে দাঁড়ানো এই লোকগুলোকে বোকা বোকা দেখাচ্ছিল, যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ির মতো। কেউ নড়ছে না! যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। এই সমস্তই একটা স্বপ্ন!

অস্পষ্টভাবে ক্রমশ তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে এল। কতক্ষণ ধরে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে? কী হয়েছে? ওহো, তাই তো! তিনি একটা আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় আদেশটি কী?

'এ্যাটেনশন!' বলবার পর 'সোল্ডার আর্মস্' তারপর 'প্রেজেন্ট!' এবং সবার শেষে 'ফায়ার!' তাঁর অবচেতনে এ সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। কিন্তু যে কথাগুলো উচ্চারণ করতে হবে সেগুলোকে মনে হতে লাগল অনেক দূরের, অস্পষ্ট এবং তাঁর মনের বাইরেকার।

এই বিব্রত অবস্থায় তিনি অসংলগ্নভাবে কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করলেন যার কোন মানে ছিল না। কিন্তু তিনি দেখে আশ্বস্ত হলেন যে তাঁর সৈনিকরা কাঁধে বন্দুক তুলেছে। তাদের নড়াচড়ার ছন্দ তাঁর মস্তিষ্কে আবার ছন্দ জাগিয়ে তুলল। তিনি হাঁক দিলেন। সৈনিকরা রাইফেল বাগিয়ে প্রস্তুত হল।

কিন্তু এরপরে যেটুকু বিরতি সে-সময়ে কারা প্রাঙ্গণে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। অফিসারটি তখনই জানতে পারলেন, মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের আদেশ। তৎক্ষণাৎ তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। প্রাণপণ শক্তিতে ফায়ারিং স্কোয়াডকে চিৎকার করে জানালেন, 'স্টপ্!'

ছয়টি ম'নুষ রাইফেল বাগিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল। ছয়টি মানুষকে একই ছন্দে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তাই ছয়টি মানুষ, চিৎকার শুনল, 'ফায়ার।'

ছুটে বেরিয়ে গেল ছটি গুলির শব্দ।

অনুবাদ। কৃষ্ণ ধর

প্রতিরোধের গল্প

গুইলারমো ক্যাবরেরা ইনফান্তে



কিউবার ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার গুইলারমো ক্যাবরেরা ইনফান্তের জন্ম ১৯২৯ সালে। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'এসি এন লা পাজ কোমো এন লা গুয়েরা' প্রকাশের সাথে সাথে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এছাড়াও তাঁর বেশ কিছু গল্প নানান সংকলন ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এবং ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়।

১৯৬৪ সালে 'ভিস্তা দেল এমানেসার এন এল ট্রোপিকো' উপন্যাসটির জন্যে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। কিছুদিন একটি সংবাদ পত্রের সম্পাদক এবং 'ব্রুসেলস'এ কালচারাল অ্যাটাচি রূপে কাজ করেন।

চিত্র ১

জোসে আপনমনে নিজের হাতে লেখা ইস্তাহারটা পড়ছিল আর ভাবছিল রচনাশৈলী দেখে লেখাটা মার্টির বলে ভুল হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ, মার্টির উনিশ বছর বয়সের লেখা বলে। জোসে পড়ে চলে। নিজের অজান্তেই অপর তিন সঙ্গীর নাক-ডাকার আওয়াজ শোনে। পড়তে পড়তেই একসময় ঘুম-ঘুম ভাব টের পায়। ভাবল একে এই গরম তার ওপর আবার একই ঘরের মধ্যে চারজনে আটকা পড়েছে। এই জন্যেই ঘুম পাচ্ছে। কাগজ হাতেই জোসে ঘুমিয়ে পড়ল। গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো স্বপ্নের মধ্যে ভেসে ওঠে। ভাখে প্রকাশ্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, কিন্তু চুলে কলপ দেবার এমনই গুণ যে কেউই ওকে চিনতে পারছে না। ঘুমিয়ে না পড়লে জোসে দেখতে পেত কেমন আস্তে আস্তে চাবিটা ঘুরছে, দরজাটা খুলে যাচ্ছে। হঠাৎ টের পেল কে যেন ওর চুলের গোছা

ধরে টানছে। ঘুম না ভেঙে উপায় আছে। লোকগুলো ওকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে। তাছাড়া আশপাশ দিয়ে গুলি ছোটার শব্দ কানে আসছে। জোসে বুকের ওপর একটা আঘাত অনুভব করল। কেউ লাথি কসিয়েছে মনে হল। তারপরেই লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। এবার বুঝতে পারল আঘাত নয়, বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে শরীর। মাথার মধ্যে বর্বর কোলাহলে জ্ঞান হারাবার আগেই জোসে দেখতে পেল একটা মুখ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ঠোঁটের প্রান্তে ক্রুর একটা হাসি। আর দেখল একটা পা, পরক্ষণেই যেটা ওর মুখের ওপর এসে সজোরে আঘাত করল।

জোসে এখনও মরেনি। মরেনি কিন্তু কিছুই আর অনুভব করতে পারছে না। কয়েকজন ওকে পাদুটো ধরে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনতলা থেকে একটা সিঁড়ি দিয়ে ওরা ওকে নিচে নামাল। জোসের মাথা প্রতিটি ধাপের সঙ্গে এক একবার করে ঠোক্কর খেল। মার্বেল পাথরের একটা ধাপে রয়ে গেল চুল সমেত জোসের মাথার খুলির ওপরের চামড়াটা। চুলের ডগার দিকগুলো সাদা আর গোড়ার দিক কুচকুচে কালো। রাস্তায় পৌঁছে জোসেকে ওরা ফুটপাতের ওপর আছড়ে ফেলল। তারপর আবার তুলে লরীটার ওপর ছুঁড়ে দিল। মরবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ওর মনে পড়ল গত সপ্তাহে লেখা ইস্তাহারের শেষ কটা কথা: 'হয় আমরা স্বাধীনতা আনব, না হয় মরবো। তখন সারা বুক তারায় ভরা আকাশের মতো বুলেটে বুলেটে ক্ষত-শোণিত হয়ে থাকবে।' এই অংশটাই একটু আগে জোসে পড়ছিল।

চিত্র ৫

বিদ্রোহী নাবিকদের একজন তার জামাটাকে পতাকা বানিয়ে জানলার সামনে ধরে নাড়তে লাগল। যুদ্ধবিরতির ইঙ্গিত। ওদের আত্মসমর্পণের শর্ত—প্রাণে মারা চলবে না, আর বিচারের জন্যে সামরিক আদালতের সামনে হাজির করতে হবে। কিন্তু যেই ওরা

বেরিয়ে এল, পার্ক থেকে পঞ্চাশ সাইজের তিনটে মিশিনগান ওদের নির্মূল করে দিল। একশো নাবিক আর অন্যান্য মৃত নাগরিকদের একসঙ্গে একটা কবরের মধ্যে সমাধিস্থ করা হল।

প্রথমে ওরা দুটো বুলডোজার এনে গর্ত খোঁড়া শুরু করল। দূর থেকে দেখে রাস্তা নির্মাণের গতানুগতিক কাজ চলছে বলেই মনে হবার কথা। একমাত্র দর্শকরাই হাড়েহাড়ে কাজটার স্বরূপ উপলব্ধি করল। পঞ্চাশ মিটার লম্বা, ছ'মিটার চওড়া আর তিন মিটার গভীর একটা গর্তের জন্ম দিল বুলডোজার দুটো। কাজ শেষ হলে আবর্জনা ফেলার লরীটা লাশগুলোকে গর্তে নিক্ষেপ করল। কয়েকটা মৃতদেহ গর্তের বাইরে পড়ে গিয়েছিল, সৈন্যরা সেগুলোকে ঠ্যাঙ ধরে ভিতরে ছুঁড়ে দিল। সবকটা লাশ গর্তের মধ্যে জমা হলে যন্ত্রটা মাটি চাপা দিতে শুরু করল। চার শ' মৃতদেহ ঢাকা না পড়া অবধি কাজ চলল। লরী, বুলডোজার আর রাস্তা নির্মাণের কাজে নিযুক্ত যে রোড-রোলারকে ওরা নিয়ে এসেছিল—সব কটা মিলে সন্থনিক্ষিপ্ত মাটির ওপর চলে-ফিরে জায়গাটা সমান করে দিল। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ হল। তবু ভোরবেলায় চারপাশের পোড়ো জমির মধ্যে এক ফালি মাটি দীর্ঘ এক ক্ষতচিহ্নের মতো জেগে রইল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে যে বিদ্রোহের শুরু হয়েছিল এখন তার সমাপ্তি ঘটল।

চিত্র ৬

পাথরের তাস দিয়ে তৈরি ভয়ঙ্কর দুর্গটার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলেন এক নিগ্রো বৃদ্ধা। ওপরে ওঠার পথে একজন পুলিস চোখে পড়ল। বুকের কাছে উদ্যত মেশিনগান। অস্ত্রটিকে দু'হাতে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। মহিলাটি তাঁর আসার কারণ জানালেন। পুলিসটি এবার বৃদ্ধাকে কেন্দ্রে রেখে নির্দেশের নানান জাল বেছাল। তারপরে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। দরজার কাছে একধার ঘেঁসে একটা কাঠের টুল দিল বসতে। একঘণ্টা বসেই কাটল। শেষে

একজন সেনাধ্যক্ষ্য এসে জানাল যে বৃদ্ধা তাঁর ছেলেকে দেখার অনুমতি পেয়েছে। পুলিসটা ওনাকে বাড়ির পেছনের দিকে নামমাত্র আলোকিত একটা কারা কুঠরিতে নিয়ে এল। অন্ধকার বলে প্রথমটায় ছেলেকে চিনতে অসুবিধে হল। দেখলেন মাথাটা দেওয়ালের ওপর ঠেসিয়ে রয়েছে, একটা হাঁটু টুলের ওপরে। এই টুলটিই কুঠরির একমাত্র আসবাব। ছেলের নাম ধরে ডাকলেন। শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। আবার ডাকলেন। মুহূর্ত খানেক পরে ও মাথা নাড়ল। কাউকে লক্ষ্য করে নাড়েনি, মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশ শুধু সামান্য একটু নড়ে উঠেছিল। তৃতীয়বার ডাকার পর ছেলেটি গরাদের কাছে এল। বৃদ্ধা মা কোন রকমে কান্না সামলে নিলেন—এ ছেলে তাঁর ছেলে নয়! সারা শরীর ফুলে উঠেছে, এক চোখ বন্ধ, থেঁতলানো, জামায় রক্তের দাগ। দুজনের কেউই কোন কথা বলল না। রুমালের ভেতর থেকে তিনটে দোমড়ানো এক পেসোর নোট বার করে উনি ছেলের দিকে এগিয়ে দিলেন। ছেলেটি অবাক চোখে তাকাল। তারপর হাত বাড়িয়ে নিল। শুনতে পেল মা বলছেন কিছু কিনে খাবার জন্যে। খাওয়া হয়নি জেনেই দিয়েছেন।

বৃদ্ধা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ছেলেকে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কি পরিমাণ অত্যাচার করেছে।

ছেলেটি কোন জবাব দিল না।

উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

ছেলেটি তবু নিশ্চুপ। শেষে যখন বলবে বলে ইচ্ছে হল, মাকে সব বোঝাতে চাইল, যন্ত্রণাটা আবার চাগিয়ে উঠল। মুঠোর মধ্যে নোটগুলোকে ও শুধু আরও শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। নিজেই বুঝতে পারল যে এতক্ষণে কথা বলার মতো অবস্থা ফিরে পেয়েছে।

'মাগো, ওরা আমার ভেতরে একটা লাল টকটকে গরম রড পুরে দিয়েছিল।'

মা প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেননি। পরে লোহার গরাদের ওপর তাঁর আঙুলগুলো চেপে বসল। বিস্ফারিত চোখে আর্তনাদে ফেটে পড়তে চাইলেন। দুঃস্বপ্ন! কিন্তু ছেলের কণ্ঠস্বর আবার ওঁর কানে এল। থেঁতলানো ঠোঁট দিয়ে কথা প্রায় ফুটতেই চায় না, তবু তা অস্বাভাবিক রকম স্পষ্ট। বৃদ্ধা দুঃস্বপ্ন দেখছেন ঠিকই, কিন্তু স্বপ্ন নয়।

'মাগো, জ্বলন্ত রডটা ওরা ভেতরে পুরে দিয়েছিল। আবার দেবে। মাগো, আমি আর সহ্য করতে পারবো না।'

বৃদ্ধা আবার আর্তনাদে ফেটে পড়তে চাইলেন, কিন্তু তা আর হল না। পুলিসটা ফিরে এল। জানাল এবার ওনাকে ফিরে যেতে হবে। সময় হয়ে গেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে উনি ফিরে চললেন। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে মায়ের হাতে একবার হাত ঠেকাল।

বৃদ্ধা তাঁর ছেলেকে শেষ দেখা দেখে গেলেন। রাত্রে ওরা আবার জিজ্ঞাসাবাদ চালাল। ছেলেটি দেখল কেবল ঘুঁষি মারা, ঘুমতে না দেওয়া আর চোখ ঝলসানো আলোর মধ্যে বসিয়ে রাখাটাই ওরা যথেষ্ট বলে মনে করছে না। শুনতে পেল ওরা আবার ওকে পেটাবে। যে ভাবেই হোক ওদের হাত ছাড়িয়ে ও আচমকা ছুটে গেল একটা মেশিনগানের দিকে। কিন্তু অস্ত্রটা কাড়া হল না। মেশিনগানটা দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠায় আওয়াজটা ও শুনতে পেল না, জানতে পারল না বুলেটগুলোর ওর শরীর ভেদ করে যাওয়ার কথা। পা দুটো শুধু দুমড়ে নুয়ে গেল। ছেলেটা আঙুল দিয়ে জানু চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

চিত্র ১৫

মেঝের কাছে দেওয়ালটার ওপর কিসের একটা ছোপ। রক্তের নাকি? অন্ধকার বলে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব নয়। ছাদটায় মাকড়সার জাল আর ময়লা। বোধহয় ঝুলও রয়েছে। দেওয়ালময় আঁকড়ি-মাকড়ি কাটা, জলের ছোপের মাঝে মাঝে কয়েকটা কথা শুধু পড়া যাচ্ছে: 'মাগো মা, আমি তোমাকে দারুন ভালবাসী—প্রদেসনিও।'

প্রুদেসনিও কে ? সে এখন কোথায় ? আরও উঁচুতে আরেকটা জায়গায় একেবারে শুদ্ধ বানানে লেখা : 'অত্যাচারীর দিন যে ফুরিয়ে আসছে সেটা তার অত্যাচারের মাত্রা বাড়ানো দেখেই বুঝতে পারছি। হত্যাকারী যখন ভয় পায়, অত্যাচারের আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন তার গতি থাকে না।' আন্দাজে শেষ লেখাটার মানে করতে হয়। পুরোটাই প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে, তবু পড়া যায়।

'মাগো, আমি মরতে যাচ্ছি, কিন্তু ভয় আমি পাইনি।' (হাতের লেখা কুৎসিত কিন্তু লেখার ভঙ্গিটি ইচ্ছাপ্রণোদিত।) 'সময় হয়েছে এবার খুব…' পরিপূরক শব্দটা আন্দাজ করতে অসুবিধা আছে কি ? কিছু একটা ঘটেছিল নিশ্চয় যার জন্যে লেখা শেষ করতে পারেনি। ভাবলে একটা ভয়ানক সম্ভাবনার কথাই মাথায় আসে।

'২৬শে স্টারাইক্।' লেখক বোঝাতে চেয়েছিল '২৬শে স্ট্রাইক।' চেষ্টার কসুরও করে নি। এই কটি কথা লিখতেই তাকে কত খাটতে হয়েছে কে জানে। (অথচ দেখে মনে হয় কোন বিষণ্ণ ব্যক্তির লেখা।)

'বিবা কিউবা লিবরে !' লেখাটা কোন পরিণত বয়স্কের বলে না ভেবে উপায় নেই। মনে হয় ভদ্রলোক এমন একজন যে তরুণদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেনি অথচ একই আদর্শের জন্যে বন্দী হয়েছে, অত্যাচার সয়েছে, মৃত্যুবরণও করেছে।

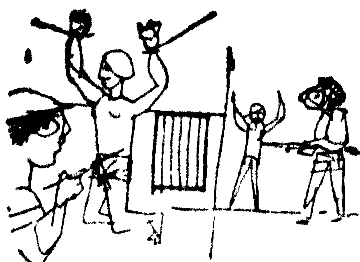
'আমার স্ত্রী থাকে ১৫ নং পাসাজে রোমেতে। যদি পারো ওকে জানিও যে কোন ঘরে তার স্বামী অ্যানটনিও পেরেজকে অত্যাচার করা হয়েছিল আর সে মরেছে মানুষের মতো মাথা উঁচু করে।' লেখাটার ওপরেই একটা অশ্লীল চিত্র, আর তার ওপরে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ—'বাতিস্তা।' আরেকজন চেষ্টা করেছিল অত্যাচারের বর্ণনা দিতে, কয়েকটা আঁচড়ও কেটেছিল।

আরও আলো থাকলে বাকী লেখাগুলোও পড়া যেত। কিন্তু এই যথেষ্ট। একেই বলে খাঁটি বিপ্লবী সাহিত্য।

অনুবাদ। সিদ্ধার্থ ঘোষ

এল বিয়ার ক্যাম্পে

হেনরী অ্যালেগ



হেনরী অ্যালেগ আলজেরিয়া কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও রিপাবলিকান পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৫৭ সালে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বন্দী শিবিরে ফরাসী ফ্যাসিস্টরা তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। এই কাহিনী তিনি 'দি কোশ্চেন' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। বর্তমান কাহিনীটি সেই মানসিক নির্যাতনেরই একটি অংশ।

সোমবারের বিকেলের দিকে ঈর আমার সেলে ঢুকল। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। ঈর আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলল। সারা শরীর তখন আমার ব্যথায় টন টন করছে। আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। ঈর-এর সঙ্গে দুজন প্যারাট্রুপার্স এসেছিল। তারা আমার দুদিক শক্ত করে ধরে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি কোন মতে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম।

ঈর এবং তার সঙ্গী দুজন প্যারা আমাকে নিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। নিচে তারা আমাকে বেশ বড় একটা হল ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ঘরটার চারিদিকে আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম, ঘরটা বেশ খোলামেলা। চারদিকেই অনেক দরজা-জানালা। ঘরটার মধ্যে সারি সারি বিছানা পাতা রয়েছে। এ সবগুলোই রোগীদের জন্যে। হল ঘরটার মধ্যে বেশ বড়সড় একটা টেবিল পাতা, তাতে নানারকম ওষুধ আর ডাক্তারী সরঞ্জাম। কিন্তু সেগুলো এলোমেলো, ছড়ানো।

হল ঘরটার মধ্যে শুধু একজন ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়েছিলেন। বোধহয় তিনি একজন সামরিক ডাক্তার। বয়সে তরুণ। দীর্ঘাকৃতি। গায়ের রঙ তামাটে। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। তাঁর সামরিক পোশাকের

এখানে ওখানে ছিঁড়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে কোন রকম সম্ভাষণ না জানিয়েই সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি খুব ভয় পেয়েছেন?'

তার কথার মধ্যে ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলের একটা টান ছিল।

আমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, 'না, আমি ভয় করি না।'

ডাক্তার বেশ অমায়িক কণ্ঠে বললেন, 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার ওপর আমি কোন রকম অত্যাচার করব না। বিশ্বাস করুন আপনার কোন অনিষ্ট হয় তা আমি চাই না।'

উর এবং তার সঙ্গীরা আমাকে একটি বিছানায় প্রায় জোর করেই শুইয়ে দিল। ডাক্তার আমার বিছানার কাছে এগিয়ে এসে আমার ওপর ঝুঁকে পড়লেন এবং আমার হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্টেথিস্কোপ দিয়ে আমার বুক পিঠ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার ঈরকে বললেন, 'এবার আমরা কাজ শুরু করতে পারি। ইনি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।'

এ কয়দিনের মধ্যেই আমি এদের কর্মধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছি। আমি ইচ্ছে করেই নিজেকে সম্পূর্ণ শিথিল করে দিয়েছিলাম যাতে ডাক্তারের মনে হয় আমি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি। একটু পরেই বুঝলাম আমার অভিসন্ধি কত কাজে লেগেছে। তারা পরীক্ষামূলকভাবে আমার উপর 'ট্রুথ ড্রাগ' প্রয়োগ করল। বেশ কয়দিন আগে চা-র কথোপকথন থেকে জানতে পেরেছিলাম 'ট্রুথ ড্রাগ' বন্দীদের উপর প্রয়োগ করে কথা বের করা হয়। বন্দীদের ওপর এ এক ধরণের 'বৈজ্ঞানিক উপায়ে' অত্যাচার।

গতকাল কি ঘটেছিল এবং এখন কি ঘটতে চলেছে সব কিছুই আমি মনে করার চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পেনটোথাল সম্পর্কে আমি কিছু কিছু লেখা পড়েছিলাম। 'যদি রোগীর ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে তবে কোন ভাবেই তার কাছ থেকে একটা কথাও বের করা সম্ভব হয় না।'

আমি মনে মনে বার বার এই কথাগুলি উচ্চারণ করলাম এবং নিজের ইচ্ছাশক্তিকে অটুট রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। এতক্ষণ ধরে আমার মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, এখন আমি তা বেশ কিছুটা প্রশমিত করলাম। নিজের মনোবল ফিরিয়ে এনে ঠিক করলাম, কোন রকমেই নিজেকে নিঃশেষিত হতে দেব না। আমি কিছুতেই ওদের কাছে মাথা নোয়াবো না।

তারা ডাক্তারের সহকারীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এসে পড়ল। তাকে দেখে আমি বুঝতে পারলাম সে সবে ব্যারাক পরিদর্শন করে ফিরছে। কারণ তখনও তার পরণে এই বিশেষ কাজের পোশাক ছিল। ঘরে ঢুকেই সে তার স্টেনগান এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ঘরের এক কোণে রাখল। এবং তারপর আমাকে তীব্র চোখে দেখে নিল।

ডাক্তার ঈর এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সে 'ওষুধ' প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছিল। আমি কান উঁচিয়ে তাদের কথাবার্তা আঁচ করতে চেষ্টা করলাম। শুনলাম ডাক্তারের সহকারী বলছে, 'ওষুধ প্রয়োগের পরেও কোন কোন লোক নিজেকে সচেতন রাখতে পারে। কোন রকম প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হয় না।' আমি বুঝতে পারলাম সে কি বলতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঠিক করে ফেললাম আমার ভবিষ্যত কর্তব্য। ঠিক করলাম এমন ভাব দেখাব যাতে তারা কিছুতেই মনে করতে না পারে যে আমি তীব্র মানসিক প্রতিরোধ দিচ্ছি। যেমন করেই হোক ওষুধের পরিমাণ যাতে আমার উপর বেশী প্রয়োগ না হতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

আমি ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম। আমার গায়ের প্রায় সমস্ত জামা-কাপড়ই তারা খুলে নিয়েছিল। নির্যাতন চালানোর জন্যে অনেক আগেই তারা আমার পরণের সার্ট খুলে নিয়েছিল। এখন পর্যন্ত সেই সার্ট আমি আর ফেরত পাইনি। হয়তো আমার সেই সার্ট কোন প্যারা এখন গায়ে চড়িয়েছে।

একজন প্যারা আমার দিকে একটা কম্বল ছুঁড়ে দিল। তারপর সে পায়ে পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার ডান হাতটা সে খুব জোরে চেপে ধরল। এক টুকরো রবার দিয়ে হাতটা শক্ত করে বেঁধে দিল। ডাক্তারের সহকর্মী সিরিঞ্জটা তার হাতে তুলে নিল।

কম্বলের নিচে রাখা বাঁ হাতটা আমি শক্ত করে নিলাম। তারা যাতে না দেখতে পায় খুব সতর্কতার সঙ্গে বাঁ হাতটা দিয়ে আমার উরু জোরে চেপে ধরলাম। এইভাবে নিজের শক্তিকে যথাসম্ভব ঠিক রাখার চেষ্টা করলাম।

ডাক্তারের সহকর্মী আমার ডান হাতের শিরায় স্যুচটা ঢুকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিতে লাগল। সিরিঞ্জে যে ওষুধ ছিল তা ফোঁটায় ফোঁটায় আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম সমস্ত শরীর আমার ঝিম ঝিম করছে। কেমন যেন একটা তন্দ্রার ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ডাক্তার আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'খুব ধীরে ধীরে ঠিক এমনিভাবে গুনুন—এক···দুই···তিন।'

আমি গুনতে শুরু করলাম, 'এক....দুই···তিন।' দশ পর্যন্ত গুনে আমি থেমে গেলাম। আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি শিরা-উপশিরা তখন কেমন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন অচেতন হয়ে পড়ব। ডাক্তার আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, তারপরে বলে যান, থামবেন না।'

আমি আবার বলতে শুরু করলাম, 'চোদ্দ···পনেরো···ষোল···।' ইচ্ছে করেই মাঝের দুটি সংখ্যা ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'উনিশ।' তারপরে বেশ কিছুক্ষণ সময় পরে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলাম, 'কুড়ি···একুশ।' একুশ বলতে বলতে আমি একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম আর কোন মতেই বেশী ওষুধ নেয়া উচিত নয়। আমি ইচ্ছে করেই ঘুমের ভান করলাম।

ডাক্তার খুব আলতো ভাবে আমার চিবুকটা ধরে একটু ঝাঁকুনি

দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হেনরী, হেনরী আমি মার্সেল কথা বলছি। আপনি কেমন আছেন? ভালতো?'

আমি চোখ খুললাম। তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম কি ঘটেছে। সমস্ত ঘরে তখন অন্ধকার থমথম করছে। সামনের মানুষকেও ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। সেই থমথমে অন্ধকারের মধ্যেও আমি দেখলাম আমাকে ঘিরে অফিসার আর প্যারারা বসে আছে। তারা প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে আমার প্রতিটি কার্যকলাপ এবং মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করছে।

ডাক্তারের হাতে এক টুকরো সাদা কাগজ। তাতে কিছু প্রশ্ন লেখা। এই প্রশ্নগুলিই আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করা হবে। এবং তারা উত্তর লিখে নেবে।

ডাক্তারের কণ্ঠস্বর আমার কাছে আর অপরিচিত মনে হচ্ছিল না। যেন আমার কোন বন্ধু আমার সঙ্গে আলাপ করছে। 'আপনি কি অনেক দিন থেকেই আলজেরিয়ান রিপাবলিকানের সঙ্গে জড়িত?'

প্রশ্নটা প্রথমে আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম। আমার মনে হল এটা কোন ক্ষতিকারক প্রশ্ন নয়। আমি অনায়াসেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। উত্তর না দিলেই বরং তারা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। আমি বেশ উৎসাহের সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের ঝামেলা যে কত সে সম্পর্কে বলতে লাগলাম। কিভাবে পত্রিকার প্রতিটি পাতা সাজানো হত তাও আমি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। আমি এমনভাবে বলে চলেছিলাম যেন আমার পরিবর্তে আমার কথাগুলো অন্য কেউ বলে চলেছে। নিজেই নিজের নিপুণ অভিনয় দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলাম। জানতাম পশুরা আমার উপর অনবরত যে অত্যাচার চালাচ্ছে, তারা আমার প্রতিটি অসতর্ক মুহূর্তকে কাজে লাগাবে। আমার কাছ থেকে তাদের যা জানার তা বের করে নেবে। আমাকে আমার বন্ধুদের কাছে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করাবে।

শুনতে পেলাম ডাক্তার ফিস ফিস করে তার সহকর্মীকে বলছেন, 'ওষুধ তাহলে বেশ কাজে লেগেছে, কি বল ?'

সহকর্মী ঘাড় নাড়িয়ে তাকে সমর্থন করল। ডাক্তার হঠাৎ আমাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে অত্যন্ত গভীর আবেগে বললেন, 'হেনরী, আপনার বন্ধু এক্স-এর পরিবর্তে আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করার জন্যে বলা হয়েছে। এখন কি করা যায় বলুন তো ?'

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ডাক্তার আমাদের কথাবার্ত্তার মোড় কোন দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে চান। এই একই প্রশ্ন আমাকে অন্তত এবার নিয়ে বার কুড়ি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। আমার চোখের সামনে অসংখ্য পরিচিত ছবি ভেসে উঠল। পার্কে রাস্তায় ট্রেনের কামরায় সর্বত্রই আমার সঙ্গে সঙ্গে মার্সেল। মার্সেল, মার্সেল আর মার্সেল। বার বার সেই একই প্রশ্ন, গ্রেপ্তারের আগের রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে ? কার বাড়িতে ছিলে ?

আমি এদের জালে কখনই পা দেব না। আমি নিজেকে দৃঢ় করে নিলাম। প্রাণপণে নিজের সমস্ত মনোবলকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। এবং তা নিজের উপর প্রয়োগ করলাম। অবসন্ন পেশী-গুলোকে সচেতন করে তুললাম। স্বপ্নাবিষ্ট চোখ দুটি ধীরে ধীরে মেললাম। নিজেকে আবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনলাম।

ডাক্তার আমাকে আস্তে একটু ধাক্কা দিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক্স এখন কোথায় ?'

'আপনার প্রশ্ন শুনে খুবই বিস্মিত হচ্ছি। আপনি কি তাকে আমার সাথে দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন ? আমি জানি না, সে কোথায় !'

ডাক্তার আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এক্স আপনার সাথে কখন কোথায় দেখা করতে চেয়েছিল ?'

আমি বেশ জোরের সঙ্গে ডাক্তারকে জবাব দিলাম, 'তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, বুঝতে পারছি না তার সাথে দেখা করে আমার কি হবে !'

'হ্যাঁ, আপনার হয়তো প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে। সে আপনার সাথে দেখা করতে চায়। কোথায় কি ভাবে আপনার সাথে তার দেখা করা সম্ভব হবে।'

'সে যদি আমার সাথে একান্তই দেখা করতে ইচ্ছুক তবে সে চিঠি লিখল না কেন? আমি অবশ্য কোন প্রয়োজনই অনুভব করছি না।'

আমি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ হয়ে উঠেছি। প্রশ্নগুলোর জবাবও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম। যদিও আমার ভেতরে ওষুধের প্রক্রিয়া চলছিল, তবুও আমি এই জানোয়ারগুলোর বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করে চলেছিলাম।

ডাক্তার আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হেনরী, আমার সাথে এক্স-এর একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। যদি আপনার সঙ্গে তার দেখা হয় তবে আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দেবেন কি?'

'না, আমি আপনাকে কোন কথা দিতে পারছি না। আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছি কেন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'মনে করুন হঠাৎই আমার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল, আমি কি তখন তাকে আপনার কথা বলব? কোন জায়গায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলে সুবিধা হয়?'

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

'ছাব্বিশ নম্বর রু মিথেলেট। চারতলার ডান দিকের ঘরে।'

'ঠিক আছে। আমি আপনার ঠিকানা মনে রাখব।'

'আমি তো আমার ঠিকানা আপনাকে দিলাম। আপনি আপনার ঠিকানাটা আমাকে দিন। আপনার কিন্তু আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা উচিত।'

আমি তাকে বললাম, 'বেশ, আপনি যাদ তাই ভাল মনে করেন, তবে আমরা আজ থেকে চোদ্দ দিন পরে ঠিক ছ'টার সময় পার্ক দ্য গ্যালাগু রেল স্টেশনে দেখা করতে পারি। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা ঠিক পছন্দ করি না।'

'আপনি কি পার্ক ভ গ্যালাণ্ডের কাছে কোথাও থাকেন ?' একটু থেমে ডাক্তার আবার বললেন, 'আপনার ঠিকানাটা আমাকে বলুন।'

প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। স্থির করলাম আর বেশীক্ষণ এভাবে চলতে দেয়া উচিত নয়। আমি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। রূঢ়তার সঙ্গে ডাক্তারকে বললাম, 'আপনি অযথা আমার সময় নষ্ট করছেন। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

ডাক্তার কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। ডাক্তার কাকে যেন ডাকলেন। ফিস ফিস করে তাকে বললেন, 'এর চেয়ে বেশী আর কিছু ও বলতে নারাজ।'

ঘরের মধ্যে আমি হাঁটা চলার শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম এতক্ষণ ধরে যারা আমাকে ঘিরে বসেছিল তারা এক এক করে উঠে যাচ্ছে। কেউ একজন ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল। এক মুহূর্তের মধ্যে ঘরের অন্ধকার খান খান হয়ে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও চোখ খুললাম। দেখলাম, সবাই এক এক করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধু ঈর এবং চা আমার দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছে। আমি ঈর এবং চা-কে চিৎকার করে বললাম, 'তোমরা তোমাদের বৈদ্যুতিক চুম্বক নিয়ে এস। আমি আর তোমাদের ভয় করি না। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

ডাক্তার তার ছোট্ট ব্যাগটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তার সহকারীকে বললেন, 'মনে হচ্ছে ও এখন একটু অসুবিধায় পড়বে। ওকে কিছু ট্যাবলেট খাইয়ে দাও।'

যে প্যারাট্রুপার্স দুজন আমাকে সেল থেকে এখানে নিয়ে এসেছিল তারা আবার আমাকে আমার সেলে নিয়ে চলল। তাদের মধ্যে একজন প্যান্টের পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেট বের করে আমার হাতে দিল। বলল, 'খেয়ে ফেল।'

আমি ট্যাবলেট দুটো হাত বাড়িয়ে নিলাম। ট্যাবলেট দুটো জিভের নিচে রেখে ঢকঢক করে এক মগ জল খেয়ে নিলাম।

প্যারাট্রুপার্স দুজন আমার সেলের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতেই আমি ট্যাবলেট দুটো মুখ থেকে বের করে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেললাম। যদিও আমার মনে হচ্ছিল এটা এ্যাসপিরিন ছাড়া আর কিছু নয়। সম্ভবতঃ ডাক্তার ব্যথার জন্যে এই ট্যাবলেট দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমি কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না, সবকিছুই আমি সন্দেহের চোখে দেখছিলাম।

আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিল। প্রতিটি শিরা-উপশিরা দপ দপ করে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বর এসে যাবে।

বারবার মনে হচ্ছিল, আজকে আমার 'মার্সেলের' সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। পেনটোথালের অশরীরী আত্মা আমার দেহের প্রতিটি রক্তকণা আর পেশীর সাথে মিশে আমাকে এক অজ্ঞাত রহস্যপুরীতে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি ওদের কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অজেয় হয়ে বেরিয়ে এসেছি। এর পরেও কি আমি এমনি ভাবে এই জানোয়ারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে রক্ষা করতে পারব?

আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না জেগেই আছি। মনে হচ্ছিল আমি আর এই জগতে নেই। যেন স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করছি। নিজেকে পরীক্ষা করার জন্যে নিজের গায়েই খুব জোরে চিমটি কাটলাম। না, আমি স্বপ্ন দেখছি না। কোন ওষুধই আমার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমি এখনও অজেয়।

অনুবাদ। কমলেশ সেন

কার্তুজের খোল

জ জ্যামিয়ান



মঙ্গোলিয়ার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক জ জ্যামিয়ানের জন্ম ১৯১৪ সালে। মাত্র পনেরো বছর বয়েস থেকে লিখতে শুরু করেন এবং স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। আজ পর্যন্ত তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস এবং গল্পসংগ্রহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর এই গল্পটি প্রথম অনুবাদ হয় 'পরিচয়' আন্তর্জাতিক সংখ্যায়।

চল্লিশ সালে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে আমার মা মারা যান।

তিনি প্রায়ই উলান-উনডুর পাহাড় যেখানে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে বেরুলেন নদীর দিকে নেমে গেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। সেই পাহাড়ের শুঁড়িপথের ধারে, উলুখাগড়ায় ঢাকা একটা শিবিরের দিকে তাকিয়ে আমাকে বলতেন ওরই কোনখানে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার বাবা যেখানে নিহত হয়েছিলেন সেই দারভালজিন্ পাহাড়ের দিকে জলভরা চোখে তাঁকে প্রায়ই তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। মার মন থেকে সেই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো কিছুতেই মোছেনি। সারাজীবন তিনি সেগুলোকে মনে রেখেছিলেন।

তিরিশ সালের কোন এক শান্ত, নির্মল হেমন্তের সন্ধ্যায় আমি আর মা দারভালজিন পাহাড়ের বাঁ দিকের ঢালুতে শুকনো গোবর কুড়োচ্ছিলাম। কুয়াশায় আর্দ্র গোবরে কানায় কানায় ভর্তি ঝুড়িটা তুলতে মার কষ্ট হচ্ছিল। একটু হাঁফ ফেলার জন্যে দাঁড়িয়েই তিনি চিৎকার করে উত্তেজিত গলায় আমাকে ডাকলেন। আমি দৌড়ে গেলাম। মা একটা মরচে পড়া কালো রঙের গুলির খোল হাতে নিয়ে

স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জাপানি কার্তুজের সেই পুরনো খোলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মা খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'এটা তোর কাছে ভালো করে রেখে দিস।'

মা আর কোন কথা বলতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের রঙ কালো হয়ে আসছিল। ঠোঁট কাঁপছিল। অনেক দূরের কোন কিছুকে তিনি যেন চোখ দিয়ে ধরে রাখতে চাইছিলেন।

একটু পরেই মা নিজেকে সংযত করে নিয়ে, আমাকে আমার বাবার মৃত্যুকাহিনী শোনালেন।

এই কার্তুজের খোলটা গ্যামিনদের (জাতীয়তাবাদী চীনা)। ওই পাথরের ঢিবির ওধারে তোর বাবাকে শেষবারের মতো দেখেছিলাম। তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে, কিন্তু সেই ঘটনাগুলো এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হবার পর ধারে-কাছে কোন অফিসার বা সৈন্যকেও দেখিনি। কালো আকাশে একটাও তারা ছিল না। পশ্চিমের কোনখান থেকে আমাদের বুড়ো কুকুর নয়ানগাড় চিৎকার করছিল। সেই আর্ত চিৎকারে মাঝে মাঝে রাত্রির নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো হচ্ছিল। কখনও রাত্রির পেঁচার ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম।

তুই তখন একটুখানি। সবে হামাগুড়ি দিতে শিখেছিস। স্থানীয় অ্যারাটস্‌দের সঙ্গে তোর বাবা ঘোড়াগুলো পাহাড়ের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রেখে গ্যামিনদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। প্রায় তিরিশ জন শত্রুকে ওরা খতম করেছিল। মাসখানেক সে পাহাড়ে পাহাড়েই কাটিয়ে ছিল।

একদিন বিকেলের দিকে দু-তিনজন লোকের সঙ্গে তোর বাবা ফিরে এল। তখনও পোশাক পাল্টানো হয়নি, চারদিক থেকে হঠাৎ গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। হঠাৎ গ্যামিনরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তোর বাবা আর তার সঙ্গী দুজনকে তারা বেঁধে

মারতে মারতে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। আমাকে কিছুতেই বাসা থেকে বের হতে দিল না। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়েই ওরা তোর বাবাকে মারছিল।

: বল ঘোড়াগুলোকে কোথায় রেখেছিস্?

: লাল কুত্তা এখানে লেজ নাড়তে এসেছিস কেন?

আমি তাদের তীক্ষ্ণ ঘৃণ্য কণ্ঠস্বর আর অশ্লীল গালিগালাজ শুনতে পাচ্ছিলাম। লুভসাম লামার কণ্ঠস্বর চিনতে আমি ভুল করিনি। সেই-ই গ্যামিনদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

অত পিটিয়েও ওরা তোর বাবার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারেনি। একবার শুধু সে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

: আমি কিছুতেই আমার ঘোড়া দেব না।

তোর বাবার কাছ থেকে কিছুতেই কিছু আদায় করতে পারবে না দেখে, ওরা তোর বাবাকে শেষ করে দেবে ঠিক করল। তাকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেল। যাবার আগে চিৎকার করে আমাকে বলল : আমার ছেলেকে মানুষের মতো গড়ে তুলো। আমার ছেলেই এর প্রতিশোধ নেবে···। আমি আর কিছু শুনতে পাইনি।

তার গলা শুনে তুই চিৎকার করে কেঁদে উঠলি। যেন তুইও কিছু বুঝতে পেরেছিস্। আমি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজা খুললাম। তোকে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে আমি বাইরে এলাম।

তোর বাবা আর একজন হাত বাঁধা অবস্থায় ছোট পাহাড়ের ওধারে দাঁড়িয়েছিল। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় তোর বাবার দীর্ঘ ছায়া এই গ্রাম অবধি ছড়িয়ে পড়ল। তিনজন অফিসার সহ প্রায় কুড়িজন গ্যামিন দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম।

প্রথমে আমার ভয় করছিল। তারপরেই সাহসে ভর করে আমি তাদের দিকে দৌড়ে গেলাম। তোর বাবার পরনে একটা নীল রঙের পোশাক ছিল। ওটা আমি তার জন্যে তৈরি করেছিলাম। তোর বাবা খুব লম্বা ছিল। বাতাসে সেই নতুন পোশাক পত পত করে উড়ছিল।

তোর বাবার পাশে গ্যামিনদের খুব ছোট দেখাচ্ছিল।

একটা ছোট পাহাড়ের উপর উঠে একজন অফিসার সাদা একটা রুমাল নাড়ল। তোর বাবা চিৎকার করে ওদের কি যেন বলল। তারপরই প্রচণ্ড একটা শব্দ।

আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। উঠতে গিয়েও পারলাম না। অনেক দূরে উত্তরের দিকে এলোমেলোভাবে গুলি চলছিল। ঘর-এর সামনে গরুটা বাছুরকে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছিল। সারাটা রাত যে কী কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছিলাম।

আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে সকালে নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। অবশেষে গাড়ির চাকা ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত গাঁ খাঁ-খাঁ করছে। একটু দূরে কাকতাড়ুয়ার মূর্তির কাছে, বুড়ো কুকুর নয়ানগাড় পেছনের পায়ের ওপর বসে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাকিয়ে কাঁদছিল। গরুটা কাতর স্বরে ডাকছিল। তার গলার দড়িটা গাড়ির চাকার সঙ্গে টান করে বাঁধা। এটা সেই লেজকাটা খয়েরি রঙের গরু—আমার বিয়ের পণ। বাছুরটা মাটির ওপর নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে।

তোর কথা আমার মনেই ছিল না। হঠাৎ মনে পড়তেই আমার ভীষণ ভয় হল। দৌড়ে ঘর-এর মধ্যে ঢুকলাম। ঘরের দরজা থেকে টেবিল অবধি ভেতরের সব কিছু এলোমেলো হয়ে রয়েছে। বারখানের (ভগবানের) মূর্তিটাও উল্টানো। দুধের পাত্রটা উপুড় হয়ে আছে। সমস্ত জায়গাটায় দুধ ছড়িয়ে আছে। তোকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। খয়েরি রঙের যে কাপড়ের টুকরো দিয়ে তোকে খাটের পায়ায় বেঁধে রেখেছিলাম সেটা টান হয়ে আছে। চৌকির তলায় উঁকি দিয়ে দেখি তুই শান্ত হয়ে মুখে আঙুল দিয়ে ঘুমিয়ে আছিস। তোকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একটু সুস্থ হয়ে, গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। গরুটা মরা বাছুরের গা চাটছে। বাছুরটা জমাট বাঁধা কালো রক্তের মধ্যে পড়ে

রয়েছে। মাথায় ছোট্ট একটা বুলেটের গর্ত।

চারদিকে একটা জনপ্রাণীও দেখতে পেলাম না। তোর বাবাকে যেখান ওরা মেরেছিল, সেখানে একদল কাক ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের সবাই পাহাড় থেকে ফিরে এল। সবাই মিলে তোর বাবাকে দারভালজিন্ পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালু জায়গায় কবর দিলাম। মৃত অবস্থাতেও তোর বাবাকে যেন জীবন্ত দেখাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চাপা, মুখে চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

'বাছা রে। এই গুলির খোলটা তুই ভাল করে রেখে দে। হয়তো এই গুলিটাই শত্রুর বন্দুক থেকে বেরিয়ে এসে তোর বাবাকে খুন করেছিল। এটাই তোর বাবার শেষ ইচ্ছার কথা মনে করিয়ে দেবে।' মা একবার চোখের জল মুছে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন:

'তোদের জনগণতান্ত্রিক সরকার বেঁচে থাক। তোর বাবার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আমি তার ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করেছি।

'পরে জানতে পেরেছিলাম লুভসান লামা তোর বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে-ই তোর বাবাকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল! কুয়োমিনটাঙ দল আমাদের ঘিরে ফেলার আগে সে দোরজির উপরের দিকে ছিল। তোর বাবা বাড়িতে ফিরতেই সে দক্ষিণের দিকে ছুটে গিয়েছিল। কেউ-ই তাকে সন্দেহ করেনি। কিন্তু হঠাৎ গুলি চলা শুরু হল, গ্যামিনরা এল। আর আমাদের দুর্ভাগ্য শুরু হল। কিন্তু জনসাধারণ লুভসানের ওপর তোর বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিল।'

মা সেই পাথরের স্তূপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। যেন তাঁর জীবনের সব দুঃখ কষ্ট ওখানেই একত্র হয়েছে। একটু থেমে মা বলতে লাগলেন:

'জীবনের শেষদিন অবধি এই ভয়ংকর ঘটনা আমার মনে থাকবে। আমার সন্তানরা, এবং তাদের ভাবী সন্তানেরা ঘৃণার সঙ্গে এই ঘটনা

স্মরণ করবে। এখন আবার হিটলারী দস্যুরা পৃথিবীর শান্তি ভেঙে ফেলার স্বপ্ন দেখছে। যে-দস্যুরা তোর বাবাকে খুন করেছিল এরা তাদের থেকেও অধম। কিন্তু পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই, যা সত্য আর শান্তির জন্যে সংগ্রামী মানুষদের হারাতে পারবে।'

অনুবাদ। সমরেশ বসু

উদ্বাস্তু শিবির

ইহ্সান আব্দেল কুদ্দুস



জীবনের এক চরম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের এক আশ্চর্য শক্তিশালী তরুণ কথাশিল্পী ইহ্সান আব্দেল কুদ্দুস আমাদের যে 'উদ্বাস্তু শিবির'-এর কাহিনী শোনালেন তা আমাদের দীর্ঘদিন স্মরণ থাকবে।

আমি? আমি প্যালেস্তাইনের এক উদ্বাস্তু।

কেউ উদ্বাস্তু শুনলেই তোমার মতো লোকেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তোমাদের বোধহয় মনে পড়ে যায় সংগ্রাম, ক্ষুন্ন সম্মান আর আরব জগত পুনরুদ্ধারের জন্যে লড়াই চালাবার কথা। অথচ খিদে কাকে বলে, দারিদ্র আর ভবঘুরেদের জীবনটা যে কি তার তোমরা কিছুই বোঝ না। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ তুমি আর তোমার মত যারা ওই সৌখিন অফিসগুলো আলো করে বসে থাক, তারা কোনদিন খিদের জ্বালা টের পাওনি, ভবঘুরের মতো জীবন যাপন করোনি। তা তুমি না জানতে পার এবং না-জানার মধ্যে যথেষ্ট কারণও থাকতে পারে, কিন্তু আমি···আমি উদ্বাস্তু শিবিরে এসেছি বারো বছর বয়সে, আমি আর আমার ন' ভাইবোন মিলে আমাদের মাকে আঁকড়ে। মৃত স্বামীর শোকে, গৃহ হারানোর দুঃখে আমাদের ক্রন্দনরতা মাকে আঁকড়ে। আরও হাজারো মানুষের মতো আমিও বছরের পর বছর বাস করেছি ক্ষুদ্র জীর্ণ তাঁবুতে। ঠাণ্ডার রাতে পরস্পরে জড়াজড়ি করে শীত কাটিয়েছি।

একের পর এক দিন কেটে গেছে। আমাদের করণীয়ের মধ্যে কেবল ত্রাণকর্মী আর দর্শককুলের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকা। হেন

জায়গা নেই যেখান থেকে দর্শক আসে না। ওরা এমন করুণ-করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে যে দেখে মনে হয় আমরা যেন বিশেষ এক ধরণের খাঁচার মধ্যে পোরা বিচিত্র সব জীব। আমাদের দুঃখে গলে গিয়ে ওরা ঘাড় নাড়ে, অভয় দিতে দু' চারটে কথা বলে, আশার বাণী শোনায়। তারপর বিদায় নিয়ে পালায়, আমাদের কথা ভুলতে একটুও দেরী হয় না।

তা হোক, ওরা অর্থাৎ আমাদের ত্রাণকর্তারা কিন্তু আমাদের চারটে কম্বল দিয়েছিল। মানে প্রতি তিনজন পিছু একটা করে। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকের জন্যে বরাদ্দ হয়েছিল ময়দা, চিনি আর বিন। সর্বসাকুল্যে মাথাপিছু ঠিক পনেরো শ' ক্যালোরি।

ক্যালোরি কাকে বলে জানো তো? জানা কথা, জানো না। তোমার মতো লোকেরা যখন খেতে বসে, কত ক্যালোরি পেটে যাচ্ছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। কিন্তু সত্যিই কি তুমি জানো না ক্যালোরি বস্তুটি কি? আমরা কিন্তু আবার এ বিষয়ে পণ্ডিত। শুধু প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একজন স্বাভাবিক মানুষের প্রয়োজন দৈনিক তিন হাজার ক্যালোরি। এবার বুঝলে তো?

তবে এই সমস্যা মোকাবিলা করারও একটা উপায় আমরা বার করেছিলাম। ওরা আমাদের যেটুকু আটা দেয় তার সবটাই আমরা এক ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিই, আর তার বদলে নিই যবের ছাতু। খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে হলে এরকম করতে হবে বৈকি···আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে এমন ব্যবসায়ীও আছে যারা আমাদের পেটের জ্বালার সুযোগ নিয়ে বেশ দু' পয়সা কামায়। এই ধরনের লেনদেনে যাকে বলে ওরা একেবারে পোক্ত।

কিন্তু যবের ছাতুও মানুষের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে পারে না। অনেককেই যবের ছাতুর বদলে গুঁড়ো নিতে হয়। জানি, তুমি ঠিক জানতে চাইবে গুঁড়োটা আবার কি? গুঁড়ো হল পাঁউরুটির টুকরো, ভোজন-অন্তে তোমার টেবিলে যেগুলো পড়ে থাকে, আর

তোমার চাকর যেগুলো আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। আমাদের পাঁউরুটির টুকরো বেচা-কেনার বিরাট একটা বাজার আছে। আমরা এর নাম দিয়েছি গুঁড়োর বাজার। আধ টুকরো, সিকি টুকরো, এমন কি পাঁউরুটির গুঁড়ো অবধি এখানে বিক্রি বা বিনিময় হয়। যার দরকার কিনে নিয়ে যেতে পারে।

ফের যদি বুঝতে অসুবিধে হয় তাই আগেভাগেই একটা কথা জানিয়ে রাখছি, উদ্বাস্তুদের কেনাকেটার সঙ্গে অর্থের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক থাকবে কি করে? আমাদের হাতে টাকাও নেই আর টাকা রোজগারের কোন উপায়ও নেই। উদার মানুষের বদান্যতাই আমাদের টিকিয়ে রেখেছে, কাজ-টাজ আমরা কিছুই করি না।

ধরো স্কুলে লেখার জন্যে আমার একটা পেন্সিলের দরকার পড়ল। মায়ের কাছ থেকে সিকি টুকরো রুটি চেয়ে নিয়ে সোজা চলে এলাম 'গুঁড়োর বাজারে'। রুটির বদলে পেন্সিল পেয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ—আমি স্কুলে পড়াশোনা করতে যেতাম। শিবিরের সব ছেলেরাই যেত। তা বলে আমাদের কেউ জোর করে স্কুলে পাঠাত না, বাধ্যতামূলক শিক্ষা গোছের কোন ব্যাপারও ছিল না। তবু আমরা স্কুলে যেতাম, কারণ এই স্কুলে যাওয়া ছাড়া করবার আর কিছুই ছিল না। তাছাড়া সব কিছুই আমরা বিনামূল্যে পেতে অভ্যস্ত। হয় বিনামূল্যে না হয় হরেক রকম দাক্ষিণ্যের আনুকুল্যে। কাজেই বিদ্যার্জনেই বা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় কেন! উত্তরটা ঠিক মনে ধরল না তো? বেশ, তাহলে না হয় আরেকটা কারণ শোনাই। আমরা বিদ্যালয়ে যাইতাম কারণ বিদ্যাই সেই একমাত্র অস্ত্র যাহা আমাদিগকে বহন কারতে দেওয়া হইত। এবার খুশী তো?

আমাদের ক্যাম্পের স্কুলটা কিন্তু আর পাঁচটা স্কুলের মতো নয়। শুধু আমাদের মতো পড়ুয়ারাই এখানে পড়তে আসবে জেনে এটা তৈরি। এক-এক টুকরো পাথরের ওপর ছাত্ররা বসে আর মাস্টার-মশায় বসেন তাদের সামনে অন্য আরেক টুকরো পাথরের ওপর।

শিক্ষকদের লেখার জন্যে সাধারণতঃ ব্ল্যাকবোর্ড থাকে, কিন্তু আমাদের যা লিখতে দেবার মাস্টারমশাই পাঁচচালা রাস্তার ওপরেই খড়ি দিয়ে লিখে দিতেন।

এই আমাদের স্কুল এবং এই স্কুলেই আমি দিনের পর দিন হাজিরা দিয়েছি, যতদিন না প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে হাতে মানপত্র পেয়েছি।

আমাদের শিবিরের বাসিন্দাদের অনেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছে। কিন্তু মজা হচ্ছে মানপত্রটি হাতে পাওয়া মাত্র শুরু হয় এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া—তীর্থ যাত্রার লগ্ন আসবার প্রতীক্ষায় দিন গোনা। সঙ্গে সঙ্গে এদের আত্মীয়স্বজনরাও উঠে পড়ে লাগে কিছু টাকা সংগ্রহ করে দেবে বলে। অনেক সময় দেখা যায় কারু কারুর মা-বোনের কাছে দু চারটে গয়না রয়ে গেছে। যেগুলো বিক্রি করে খুব সহজেই কিছু টাকা পাওয়া যায়। তারপর সেই ভাগ্যবান তীর্থ দর্শনের নাম করে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

পাড়ি দেবো বললেই অবশ্য পাড়ি দেওয়া যায় না। এর জন্যে সারা বছর ধরে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আসতে হয়। দিনে পাঁচবার প্রার্থনা, রমজানের উপবাস ও যাবতীয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সবই পালন করতে হয়। তারপর সুযোগ মিললে, সেই ভাগ্যবান যখন সৌদি আরবে এসে পৌঁছয়, তার প্রথম কাজই হয় চাকরির সন্ধানে দোরে দোরে ধন্না দিয়ে ঘুরে বেড়ানো। তা একজন গৃহহীন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রথমেই 'কাবা' প্রদক্ষিণ করে বেড়াবে এটা স্বয়ং আল্লাও দাবী করবেন না নিশ্চয়ই।

এই ভাগ্যবান উদ্বাস্তুদের কেউ যদি সত্যিই একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলতে পারে সে তখন বাড়িঘর গুছিয়ে বসে, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে এবং উদ্বাস্তু শিবিরে নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাছে প্রয়োজনে সময় সময় টাকাও পাঠায়।

আমিও ঠিক করেছিলাম সৌদি আরবে যাব। তাই আশায়

ছিলাম কবে তীর্থযাত্রার দিনটা আসবে। ইচ্ছে ছিল সৌদি আরবে বা অন্য যে-কোন আরব রাজ্যে পালাবার, গিয়ে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবার। কিন্তু আল্লার অসীম দয়া, তার আগেই একটা চাকরি মিলে গেল। তাও আবার এই শিবিরেরই মধ্যে। তাই আর চেনা-পরিচিত-দের ছেড়ে কোথাও যেতে হল না। শিক্ষক হিসেবে কাজে নিযুক্ত হলাম। ইতিমধ্যে আমাদের স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, একটা গোটা বাড়ি স্কুলের হেফাজতে এসেছে। মাসে পনেরো পাউণ্ড করে মাইনেও পেতে লাগলাম। আহা, জীবনে এই প্রথম আমি টাকা স্পর্শ করলাম। এর আগে দূর থেকেই যা টাকা দেখেছি, ছোঁবার উপায় ছিল না। সত্যি বলতে কি আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আমার মা ও ন' ভাইবোনেরা সবাই খুশি হয়েছিল।

কিন্তু এই আনন্দ বেশী দিন উপভোগ করা গেল না। জানতে পারলাম যে আইনানুসারে কোন পরিবারের কর্তা যদি মাসে পনেরো পাউণ্ড রোজগার করে তাহলে সেই পরিবারটি আর ত্রাণসামগ্রী পাবে না। আমাদের ত্রাণকর্তারাই এই আইন বানিয়েছেন। এখন আমাদের পরিবারের কর্তা বলতে আমি এবং সেই আমি মাসে পনের পাউণ্ড করে আয় করছিলাম। বলা বাহুল্য এরপর ত্রাণসামগ্রী আসা বন্ধ হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে যে পনেরো শ' ক্যালোরি আঁকড়ে আমরা প্রাণরক্ষা করছিলাম, তাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

তারপর তুমিই বল না এক্ষেত্রে একজনের করণীয় কি? না হয় উদ্বাস্তু শিবিরেই আছি, তা বলে পনের পাউণ্ড সম্বল করে এগারোটি প্রাণীর তো আর দিন চলতে পারে না। অনাহারে ও শীতে জমে অবধারিত ভাবে মরতে হবে। কাজেই মাথা ঘামাতে শুরু করলাম।

দেখলাম উপায় বলতে একটাই আছে। আমি আমার পরিবার ত্যাগ করেছি এবং স্বতন্ত্র একটি পরিবারের কর্তা হয়ে বসেছি বলে যদি দাবী জানাই, সংক্ষেপে যদি একটা বিয়ে করে ফেলি, তাহলে আমার মা ও ন' ভাইবোন আগের মতোই ত্রাণসামগ্রীর ওপর নির্ভর

করে প্রাণরক্ষা করতে পারবে।

আমার কিন্তু বিয়ে করার কোন ইচ্ছেই ছিল না। আমি চেয়েছিলাম মা আর ভাইবোনদের সঙ্গে বাস করতে, উপার্জনের প্রতিটি কপর্দক ওদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বিয়ে করা ছাড়া আমার আর কোন পথই ছিল না। তাই ঠিক করলাম বিয়েই করব, কোন রকমে আইনের চোখে ধুলো দেওয়াটাই আসল কথা।

আমাদের শিবিরে একটা পাগলী বুড়ি ছিল। সারাদিন সে এ-তাঁবু ও-তাঁবু করে বেড়াত। কি যে বিড়বিড় করে বকতো কেউই বুঝতাম না। একদিন পাগলীটাকে গিয়ে ধরলাম আমাকে ও বিয়ে করতে রাজী কিনা। আল্লার কসম্, একটুও মিথ্যে বলছি না—বিয়ের পাত্রী একটা পাগলী বুড়ি হলে কি হবে, তার কাছেও বিয়ের প্রস্তাব রাখাটা অত সোজা ব্যাপার নয়।

ওই পাগলী বুড়িও হঠাৎ সুস্থ হয়ে বিয়ের পণ দাবী করে বসল। তারপর কোত্থেকে আবার উড়ে এসে জুড়ে বসল আরেক দাবীদার, জানা গেল ওই লোকটি নাকি বুড়ির ভাই। লোকটা আমার সঙ্গে পণের টাকা নিয়ে জোর দর কষাকষি শুরু করে দিল। খলিফা লোক তো বটেই। আমার উদ্দেশ্য ও আঁচ করতে পেরেছিল আর সেই বুঝেই দরাদরি চালিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমাকেই নতি স্বীকার করতে হল, ছ' কিস্তিতে দশ পাউণ্ড দেব বলে স্বীকার করলাম।

অবিলম্বে বিয়ের পাটও চুকে গেল। আমার মা ভাইবোনদেরও আর তাদের বরাদ্দ পনেরো শ' ক্যালোরি হারাতে হল না। আর আমার স্ত্রী, সেও যথারীতি আপনমনে প্রলাপ বকতে বকতে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কোন বাধা দিইনি। 'বৌ' কথাটার সত্যিকার অর্থ ধরলে ওই পাগলীকে কোনমতেই আমার 'বৌ' বলা চলে না। আমাদের মধ্যে ও-ধরণের কোন সম্পর্কই ছিল না।

বিয়ের পর থেকেই একটা সোজা পথে আমার জীবনটা গড়িয়ে চলছিল। কোন অসুবিধের সম্মুখীন হইনি। ক্যাম্পের মধ্যে আমি

তখন এক রীতিমতো ধনী ব্যক্তি। কিন্তু তিনমাস বাদে পাগলী বুড়িটা গেল মরে, একেবারে হঠাৎ করেই মরে গেল। পণের টাকাটাই আমার শুধু শুধু গচ্চা গেল। শুধু তাই নয়, কবর দেবার খরচটাও আমার ঘাড়ে এসে চড়ল।

কালবিলম্ব করলেন না আমাদের ত্রাণকর্তারা, আগুন ছড়িয়ে পড়ার মতোই হুকুম জারী হয়ে গেল। আমার পরিবারবর্গকে আবার ওই পনেরো শ' ক্যালোরি থেকে বঞ্চিত করা হল।

এর পরের খবরটাও দিয়ে রাখি। প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় আমাকে তোমরা আমার স্ত্রীর গোরস্থানের কাছে দেখতে পাবে।

কবরখানার সামনে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি আর নীরবে ঝরে পড়ে চোখের জল।

লোক-কাহিনী

লু শুন



আধুনিক চীনা সাহিত্যের জনক লু শুন (জন্ম ১৮৮১) তাঁর দুর্লভ এই কাহিনী দুটি প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন: '১৭ই ফেব্রুয়ারীর' 'ডয়েচে সেণ্ট্রাল ৎসাইটুঙ'-এ দেখলাম হাইনের আশীতম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণার্থে লেখা উইলি ব্রেডেলের 'একটি লোক-কাহিনী'। এই নামটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে তাই নিজেই এবার এমনি লোক-কাহিনী লিখছি।'

বহুকাল আগে এমন একটি দেশ ছিল যেখানে ক্ষমতাসীনরা দেশবাসীকে চূড়ান্তভাবে নিষ্পেষিত করার পরেও তাদের চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত। মনে করত এদের ল্যাটিনীয় ধাঁচের অক্ষরগুলো মেশিনগান, আর কাঠ-খোদাই গুলো ট্যাঙ্ক্‌। বিজয়ী হয়েও তারা যথাযথ স্টেশনে ট্রেন ছেড়ে নামত না। পৃথিবীর ওপর থাকাটা নিরাপদ বলে মনে না হওয়ায় তারা আকাশে বেড়াত। আর তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা এতই কমে গেছল যে আপতকালীন সময়ে তারা ফ্লু আক্রান্ত হল, মন্ত্রীদেরও তার ছোঁয়াচ লাগল। অতঃপর সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

এরা ঢৌংকা ঢৌংকা অভিধান ছাপিয়েছিল বেশ কয়েকটা। কিন্তু তার কোনটাই কাজে লাগেনি। আসল অবস্থাটা বুঝতে হলে এমন একটা অভিধানের কথা পাড়তে হয় যা এখনো ছাপা হয়নি। এর মধ্যে একেবারে মৌলিক নানা সংজ্ঞার সাক্ষাৎ মেলে। 'মুক্তি'র অর্থ 'প্রাণদণ্ড'। 'টলস্টয়ের দর্শন' মানে 'পৃষ্ঠ প্রদর্শন'। 'চাকুরে'র সংজ্ঞা 'আত্মীয়, বন্ধু এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্রীতদাস'। 'শহর'-এর বর্ণনা—'ইষ্টক নির্মিত উচ্চ ও মজবুত দুর্গপ্রাচীর যা ছাত্রদের আনাগোনা বন্ধ করে'। 'নৈতিকতা' হল 'মহিলাদের নগ্ন বাহু প্রদর্শন

নিষিদ্ধ করা'। আর 'বিপ্লব' মানে 'জমিজমায় প্লাবন বওয়ানো, 'ডাকাত'দের ওপর বোমা ফেলা'।

এরা বহু খণ্ডে বিভক্ত আইন সংক্রান্ত বৃহদাকার গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। বিদ্বান ব্যক্তিদের তো এইজন্যেই এরা বিদেশে পাঠায়। বিভিন্ন দেশের আইন-কানুন দেখে শুনে তার মধ্যে থেকে সেরা অংশটুকু বেছে বেছে বিদ্বানরা এমন একটা সর্বদিক পরিব্যাপী সঙ্কলন তৈরি করে দেবে যেমনটি আর কোন দেশেই নেই। কিন্তু একেবারে গোড়ার দিকে একটা খালি সাদা পাতা ছিল। অপ্রকাশিত ঐ অভিধানটা যারা পড়েছে তাদের পক্ষেই কেবল এই সাদা পাতাটির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব। এখানে তিনটি শর্তের উল্লেখ আছে। এক, কোন কোন ঘটনা সহিষ্ণু ভাবে বিচার করতে হবে। দুই, কোন কোন ঘটনা নির্দয়ভাবে বিচার করতে হবে। তিন, সর্বক্ষেত্রেই যে এই শর্ত-দ্বয়ের যেকোন একটি কার্যকর হবে তা নয়।

এই দেশটিতে আদালতও ছিল বৈকি। তবে কিনা যেসব বন্দীরা ঐ সাদা পাতাটা পড়বার সুযোগ পেয়েছে তারা কখনও আদালতে প্রতিবাদ করেনি। কারণ একমাত্র দুষ্কৃতকারীরাই প্রতিবাদ করে এবং যারাই প্রতিবাদ করে নির্দয় ভাবে তাদের শায়েস্তা করা হয়। তা সেখানে একটা প্রধান বিচারালয়ও ছিল বৈকি। কিন্তু যারা ঐ সাদা পাতাটা পড়তে পেয়েছে তারা কখনও আবেদন জানায়নি। কারণ দুষ্কৃতকারীরাই কেবল আবেদন জানায় এবং যারাই আবেদন জানায় নির্দয়ভাবে তাদের শায়েস্তা করা হয়।

একদিন সকালে একদল সশস্ত্র পুলিস একটা শিল্প শিক্ষায়তন ঘিরে ফেলে। চীনা আলখাল্লা পরা কয়েকজন লোক আর কয়েকজন পশ্চিমী বেশধারী স্কুলের মধ্যে ছোটাছুটি লাগিয়ে দেয়, তন্নতন্ন করে সব খুঁজে ভাখে। পুলিসরা তাদের পেছনে পেছনে আসে, সবার হাতেই পিস্তল। অতঃপর বহুশয্যা বিশিষ্ট শয়নকক্ষে পশ্চিমী বেশধারীদের মধ্যে একজন বছর আঠেরোর একটি ছাত্রকে পাকড়াও করে।

'সরকারের তরফ থেকে এসেছি খোঁজ করে দেখতে। তুমি কি…'

'বেশ তো দেখুন না।' ছেলেটি অবিলম্বে বিছানার তলা থেকে নিজের সুটকেসটা টেনে বার করে।

বহু বছরের অভিজ্ঞতা এখানকার বুদ্ধিমান তরুণদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে সন্দেহভাজন হবার মতো কোন কিছু কাছে রাখবে না। কিন্তু ছেলেটা যে মাত্র আঠেরো বছরের বালক। তাই একটা টানার মধ্যে কয়েকটা চিঠি আবিষ্কৃত হল। ওর মা কি দুরবস্থার মধ্যে মৃত্যু বরণ করেছেন এগুলোতে সেই বিবরণই ছিল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও পোড়াতে পারেনি। একজন পশ্চিমী বেশধারী ভদ্রলোক সতর্কভাবে প্রত্যেকটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিঠিগুলো অধ্যয়ন করতে থাকেন। ভুরু তুলে তিনি তাকান, যখন চোখে পড়ে '…পৃথিবী একটা ভোজসভা যেখানে মানুষ মানুষকে খায়। তোমার মায়ের মতোই এই পৃথিবীর অসংখ্য মায়েদের খেয়ে ফেলা হচ্ছে…' একটা পেন্সিল বার করে এই অংশটার তলায় দাগ দিয়ে নেন।

প্রশ্ন করেন, 'এর মানে কি?'

ছেলেটি নিশ্চুপ।

'কে তোমার মাকে খেয়েছে? এই জগতে কি মানুষ মানুষকে খায়? আমরা তোমার মা'কে খেয়ে ফেলেছি নাকি?' লোকটার দুচোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

'না, নিশ্চয়…ঠিক তা নয়…' ছেলেটা বিচলিত বোধ করে।

চোখ দিয়ে ওকে গুলি না করে ভদ্রলোক তার বদলে চিঠিটা পাট করে একটা পকেটের মধ্যে গুঁজে রাখলেন। তারপর ছাত্রটির কাঠ-খোদাই, ছুরি, ছাপা ছবি, 'লৌহ নদী', 'ধীর প্রবাহিনী ডন্' এবং সেইসঙ্গে কিছু খবরের কাগজের ছাঁটাই একত্রিত করে একজন পুলিসকে বললেন, 'এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'কি ব্যাপার!' ছেলেটা জানত ব্যাপারটা খারাপ দাঁড়াচ্ছে। তবু না জিজ্ঞেস করে পারে না, 'এগুলো নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

পশ্চিমী বেশধারী ভদ্রলোক ওর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তারপর ছেলেটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আরেকজন পুলিসকে বললেন, 'ধরে নিয়ে যাও একে।'

পুলিসটি বাঘের মতো ছেলেটার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। দরজার বাইরে আরও দুজন একই বয়সী ছাত্র দাঁড়িয়েছিল। শক্ত হাতে পুলিসগুলো তাদেরও ঘাড় চেপে ধরল। চারপাশে তখন শিক্ষক আর ছাত্ররা ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

আরেকটি লোক-কাহিনী

এর একুশদিন বাদের কথা। একটি পুলিস থানায় সকালবেলার জেরার কাজ চলছিল। একটা ছোট অন্ধকার ঘরে দুজন সরকারী কর্মচারী বসেছিল। একজন ডানদিকে, অন্যজন বাঁয়ে। ডানদিকে যে তার গায়ে চীনা কুর্তা, বাঁদিকের লোকটির পশ্চিমী পোশাক। শেষোক্ত জন আশাবাদী। এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষ খায় একথা অস্বীকার করেন। জবানবন্দী লিখে নিয়ে যেতে এসেছেন। চেঁচাতে চেঁচাতে, গালিগালাজ করতে করতে পুলিসেরা একটি আঠারো বছরের ছাত্রকে ভেতরে টেনে নিয়ে আসে। বিবর্ণ মুখ, জামা-কাপড় নোংরা। ছেলেটি ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। চীনা সরকারী কর্মচারী, ওর নাম, বয়েস আর জন্মস্থান জেনে নিয়ে তারপর জেরা শুরু করে।

'তুমি কি 'কাঠ-খোদাই' সংঘের সদস্য?'

'হ্যাঁ'

'এটা কে চালায়?'

'চেয়ারম্যান চো আর ভাইস-চেয়ারম্যান শু··'

'এরা এখন কোথায়?'

'জানি না—এদের দু'জনকে আগেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'নিজের স্কুলে গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করছিলে কেন?'

'মানে!' ছেলেটা অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

'হুঁ!' চীনা কুর্তা ওকে একটা কাঠ-খোদাই দেখায়, 'এটা তুমি করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'ইনি কে?'

'একজন লেখক।'

'নাম কি?'

'লুনাচার্স্কী।'

'লেখক নাকি? কোন দেশের?'

'জানি না।' নিজেকে বাঁচাতে ছেলেটা মিথ্যে বলল।

'জান না।' আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করো না। রাশিয়ান না? লাল ফৌজের একজন অফিসার নিশ্চয়? রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের একটা বইয়ে আমি এঁর ছবি দেখেছি। কথাটা তুমি অস্বীকার করতে পারো?'

'মিথ্যে কথা।' ছেলেটা এতটা আশা করেনি। হতাশায় চেঁচিয়ে ওঠে।

'না, না হওয়াটাই তো উচিত। একজন প্রলেতারীয় শিল্পী হিসাবে লাল ফৌজের একজন অফিসারের ছবি আঁকাটাই স্বাভাবিক।'

'না, আমি বলছি তো যে আমি কখনও…'

'তর্ক করো না। অত একগুঁয়েমি ভালো নয়। আমরা জানি যে পুলিস থানায় তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এখন যা জান তাই তোমার খুলে বলা উচিত। আমরা তাহলে তোমাকে শাস্তি দিতে আদালতে পাঠাবো। জেলে অনেক আরামে থাকবে।'

ছেলেটা কিছুই বলল না। জানে, কথা বলা বা চুপ করে থাকা দুই-ই সমান অর্থহীন।

'কথা বল্!' চীনা কুর্তা খেঁকিয়ে ওঠে, 'তুই 'সি, পি' না 'সি. ইউ,' (কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য না কমিউনিস্ট ইউথ্ লীগের সদস্য) কোনটা?'

'কোনটাই নয়। আপনি কি বলতে চাইছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আ-চ্ছা। লালফৌজের অফিসারের ছবি আঁকতে পারিস্ অথচ 'সি. পি,' ও 'সি. ইউ' কি জানিস না? এই বয়সেই এত ধূর্ত! গেট্ আউট।' ইঙ্গিতে বহিষ্কারের নির্দেশ পেয়ে বহু দিনের অভ্যাসলব্ধ নিপুণতায় একজন পুলিস ওকে টেনে বার করে নিয়ে গেল।

এগুলি যদি আর লোক-কাহিনীর মতো না শোনায় তাহলে আমার মাপ চাওয়াই উচিত। কিন্তু এগুলিকে যদি লোক-কাহিনী না বলি তো কি বলব? সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তা আমি বলতে পারি। ১৯৩২ সালে।

প্রহরী

ইয়োসিয়ো অ্যাবে



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে কজন জাপানী শিল্পী সাহিত্যিক পালিয়ে গিয়ে বিদেশে আশ্রয় নেন, ইয়োসিয়ো অ্যাবে তাঁদের অন্যতম। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প পরপর 'মেন স্ট্রিম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্প বলার ভঙ্গিতে, আঙ্গিকে এবং বিষয় বস্তুর নিপুণতায় প্রহরী গল্পটি নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বাংলায় সম্ভবত এইটি তাঁর প্রথম অনূদিত গল্প।

রাতের কালো পর্দার আড়ালে শহরের সেই ছোট্ট গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। থিকথিকে তরল কর্দমাক্ত রাস্তায় বুনো হাঁসের পায়ের চিহ্ন, বৃষ্টির টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ। নোংরা বস্তির গলি থেকে আচার বা কড়াইশুঁটি, পচা মাছ, মরা ইঁদুরের কটুগন্ধ ভেসে আসছে। সবকিছু ছাপিয়ে আসছে মলমূত্রের দুর্গন্ধ। বিশ্রী গন্ধে নাকটা আপনা থেকেই কুঁচকে এল।

অন্ধকার রাত। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ঠিকানাটা খুঁজে নিতে বিশেষ অসুবিধে হল না। আলোকিত ছোট্ট রাস্তাটার পেছনে নুয়ে পড়া দেশলাই-বাক্সের খোলসের মতো দোতলা বাড়িটা দেখতে পেলাম। নর্দমা পেরোতেই সামনে জাফরি-কাটা দরজা। একজন বয়স্কা মহিলা ভেতরে দাঁড়িয়ে, যেন আমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে কোনরকম ভূমিকা করতে না দিয়েই উনি বললেন, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'দোতলার ভদ্রলোক কি আছেন?' অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিলাম। সাহসটা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলাম।

'পাশের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। পুলিসকেই খবর দেব না আপনাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। যাক ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ, এতক্ষণে একটু স্বস্তি পেলাম। ওপরে আসুন। আপনার বন্ধু মারা গেছেন। আমার স্বামী ওখানে বসে আছেন।'

অজান্তেই গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আমি দু'পা পেছিয়ে এলাম। উনি কিন্তু আমার হাতটা ধরে ফেললেন। 'না না, আমাদের এই মৃতের কাছে ফেলে রেখে যাবেন না। তাঁকে নিয়ে আমরা কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।'

'আমি, আমি বরং তার আত্মীয়দের খবরটা দিয়ে দিচ্ছি।' মুখে বললেও আমি যে কি করব নিজেই বুঝতে পারলাম না। মরি আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলো প্রায় গুলিয়ে গেল। মহিলার পেছনে একটা নিষ্প্রভ আলো দেখা যাচ্ছিল। এখন আমার কেবলই মনে হচ্ছে, কি করে এঁর হাত থেকে পালানো যায়।

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। ওঁর আত্মীয়দের সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু তার আগে আপনার এই বন্ধুটির প্রতি আপনার শ্রদ্ধা জানিয়ে যাওয়া উচিত। ওঁর কোন আত্মীয় কি এই শহরেই থাকে? সত্যিই, খুব আশ্চর্য লাগছে। উনি একবারও কিন্তু তাদের কথা বলেননি। এমন কি তাদের কেউ দেখা করতেও আসত না। সব সময় উনি একাই থাকতেন। হয়তো সবাই ওঁকে আলাদা করে দিয়েছিল। তাঁর এই নিঃসঙ্গ জীবন বড্ড অদ্ভুত ঠেকে।'

এক ঝটকায় মহিলাটিকে সরিয়ে দিয়ে আমি বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। তাঁর কণ্ঠস্বর তখনও আমার পেছনে ছুটে আসছে। মরির বন্ধুর সঙ্গেই দেখা করার জন্যে এখানে এসেছিলাম। দুদিন হল তাঁর দেখা নেই। মোড়ের মাথায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসেননি। আর এখন, এই ব্যাপার! এই লুকোচুরির খেলায় আমি সম্পূর্ণ নবাগত। এতে কি বিপদ আছে জানি না, ঝুঁকি নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। গ্রেপ্তার হওয়া, পুলিসের নির্যাতনের বলি হওয়া বা জেলে যাওয়া, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হওয়াও সম্ভব। আর এখন, বলতে গেলে মানুষটা আমার চোখের ওপরেই

মারা গেলেন। আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসছে। বাড়িতে থাকলেই ভালো হত। মরির সঙ্গে শুধু একটা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু মরি! উনি তো আমার জীবনে একজন আগন্তুক মাত্র। আমাদের এই অস্পৃশ্যদের বাড়িতে এসে একদিন রাতের খাবারে ভাগ বসিয়েছিলেন শুধু।

পূর্ব নির্ধারিত মুডলের সেই দোকানটায় মরির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমি যে গ্রেপ্তার হইনি এতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁকে দেখে খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হল না। তাহলে সত্যিই কি মরি ভেবেছিলেন আমি ধরা পড়ে যাব!

'মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে তুমি ফিরে এলে? কেন, ভয়ে?'

'না, তা নয়। ভাবলাম আগে আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

'আমি তোমাকে বলে দিলাম যদি সে গ্রেপ্তার হয়, তার ঘরটা ভালো করে খুঁজে দেখতে। নথিপত্র কিছু পেলে নষ্ট করে ফেলতে। অবশ্য সে নিজেও প্রামাণ্য কিছু রাখবে না। কিন্তু তুমি ঘরটা ভালো করে দেখে বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে তার গ্রেপ্তার হওয়ার ব্যাপারটা জেনে নেবে, এজন্যেই তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। এটা জানা বিশেষ প্রয়োজন। খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

বৃষ্টির মধ্যে সেই পরিত্যক্ত গলিটার স্মৃতি ভেসে উঠল আমার মনে। একটা লোকও নেই রাস্তায়। আমি একা। শুধু সেই কটু গন্ধটা গলির ভিতর থেকে ভেসে আসছে। সেই বয়স্কা মহিলা মৃত্যুর মতো হিমেল হাত দিয়ে আমাকে ক্রমাগত টানছেন তাঁর দিকে।

আমার গলার স্বর কেঁপে উঠল। বললাম, 'আমি · মানে··· আমাকে একটু বাড়ি যেতে হবে।'

মরি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

'আমার ঠিক ভালো লাগছে না।'

মরি রেগে উঠলেন, 'না, তা হবে না। এটা আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।' হঠাৎ গলার স্বর নেমে এল, যেন নিজের সঙ্গেই কথা

বলছেন, 'কলেজে ও আমার সিনিয়র ছিল। ওই আমাকে বাস্তব জগৎটাকে দেখবার চোখ দিয়েছে। অথচ আজ সে মারা গেল…'

মুড়লের খালি পাত্রটা সামনে পড়ে আছে। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে। আর আমাদের বন্ধু মৃত। এখন কি এই লোকটাকে একলা ফেলে চলে যাওয়া সম্ভব!

'আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, কারণ সকালে গরুর গাড়িতে করে মৃতদেহ নিয়ে যেতে হবে।'

বাড়ি গেলাম। মাকে বললাম রাতে এক বন্ধুর কাছে থাকব। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সেই অন্ধকার গলিটায় আবার ফিরে এলাম।

পায়ের নিচের সিঁড়িগুলো কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ করে যেন ককিয়ে উঠল। সদ্য মৃত সেই মানুষটার ঘরে উঠে এলাম। নিচে, দরজার সামনে সেই বয়স্কা মহিলার ঘ্যান্ ঘ্যানানি শুনতে পাচ্ছি, 'ভয়ঙ্কর, উঃ কি ভয়ঙ্কর রাত! ভাগ্যিস্ আমি সব্জীওয়ালার মেয়েটার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করিনি। হার্টের রুগী, ও তো এমনিতেই মরে যেত।'

ভেতর থেকে গোয়েন্দা দপ্তরে নির্যাতিত মানুষের চাপা আর্তনাদের মতো একটা স্বর কানে এল। অন্ধকারের মধ্যে কে যেন, সম্ভবত ঐ মহিলারই স্বামী, চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ কর।'

ঘরের মধ্যে একজন তরুণীকে দেখলাম। ভেবেছিলাম মরি একলাই সারারাত মৃতদেহ পাহারা দেবেন। মেয়েটি কাঁদছে। মরি আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। বিছানাটার পায়ের দিকে বসে আমি অন্যমনস্ক হয়ে ঘরটা দেখছিলাম। একটা ছোট্ট লেখার টেবিল ছাড়া ঘরে প্রায় কিছুই নেই। নিরুত্তাপ নির্জন হিমশীতল শূন্যতার মধ্যে যে মানুষটা চলে গেল তার কথাই চিন্তা করছিলাম। কান্নার স্বর ঘরের প্রতিটি শূন্য কোণ স্পর্শ করে বোধহয় সান্ত্বনা খুঁজছিল, যা এই মৃত মানুষটি কখনও এখানে খোঁজেননি, কিংবা খুঁজেও পাননি। বুকের ওপর চিবুক রেখে মরি সেই কান্নাই শুনছিলেন এক মনে, হয়তো বা কিছু ভাবছিলেন। সারা জীবনই

হয়তো এঁর কেটেছে রাস্তায়, শুধু ঘুমোবার জন্তেই ফিরে আসতেন এই খুপরিতে। নিঃশব্দে আমি তাকিয়ে রইলাম মেঝের দিকে।

একটা মানুষের ছবি ভেসে উঠল আমার মনে, যে মানুষটা নিজের জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে শুধু মানুষের সুখ শান্তির জন্তে সংগ্রাম করে গেলেন। আর অন্য কিছুই কি তিনি চাননি? চোখের সামনে ক্রমশ মেঝের নকশাটা অস্পষ্ট হয়ে এল। ভেবেছিলাম বুঝি আমিই একমাত্র শক্তিমান। কিন্তু এই তো, এখানেই শায়িত আমার চেয়েও অনেক বেশী শক্তিমান একজন পুরুষ, এখন মৃত।

'তুমি এখন চলে যাও। অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল চিন্তা করা যাবে।'

প্রথমে মনে হল আমাকেই বুঝি কেউ বলছে। কিন্তু না, মেয়েটি মৃতদেহের পাশ থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

'বাবাকে বলবে আমি সব সময়ই তাঁর কথা চিন্তা করি। আমি যে তাঁর সঙ্গে দেখা করছি না, এর কারণ এই নয় যে আমি প্রমাণ করতে চাই আমিই সঠিক, আর এজন্তে তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। এটা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমাদের লক্ষ্য আরও অনেক বড়। পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করতে হবে, যাতে আমরা সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারি।'

'ওই চীনাগুলোর স্বপক্ষে তোমার কথা বলার কি কারণ আছে? তুমি নিজে জাপানী আর···'

'হ্যাঁ, আমি জাপানী। জাপানকে ভালবাসি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না একমাত্র সেই কারণেই এই বিশ্বাসঘাতকগুলো অর্থ আর বর্বরতাকে যতটা ভালবাসে, তার চেয়ে আমি অনেক বেশী ভালবাসি আমার দেশের মানুষকে? আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই ইসামের মৃত্যুর অর্থ খুঁজে পেয়েছ?'

এই প্রথম আমি মৃতের নাম শুনলাম।

'তুমিই ইসামকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছ। তুমিই

তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী।'

'সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু আরও বেশী দুঃখ পাচ্ছি এই ভেবে যে তুমিও এই কথা ভাবতে পারলে। আমি আর কিছু বলতে চাই না, কারণ এই মৃত্যু আমার কাছে মর্মান্তিক এবং অনেক বড় ক্ষতি। বাড়ি যাও। চিন্তা করে দেখো তার মৃত্যুর তাৎপর্য কি। আর মনে রেখো সে মরেনি, সে বেঁচে আছে আমাদের মাঝে।'

'কি দুঃসহ, কি নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেছে সে!'

'আমাদের এই বন্ধন এই সম্পর্ক, যার জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা তুমি খালি চোখে কখনই দেখতে পাবে না। তোমাকে এই জীবন যাপন করতে হবে যদি এই জীবনকে স্পর্শ করতে চাও, অনুভব করতে চাও। সে আমাদের মধ্যেই মারা গেছে। সে এখনও আমাদের মধ্যেই বেঁচে আছে।'

বৃষ্টির ধারার মতো মরির কণ্ঠস্বর আমাকে সিক্ত করল। আমি মরির দিকে তাকালাম। মেয়েটির দিকে তার চোখ ছিল না, সরাসরি আমার দিকে তাকিয়েই সে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল।

'এবার চোখের জল মোছ। নিজের যত্ন নিও আর মার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো। চলো, বাস-স্টপ পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'না না, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব। ইসাম তো একাই চলে গেল।' মেয়েটি এক মুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবল. 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে? মা তোমাকে খুব দেখতে চায়। তুমি তো জানোই, তাঁর শরীর আজকাল খুব একটা ভাল যাচ্ছে না।'

'চলো, বাইরে বেরিয়ে কথা বলা যাবে।' মরি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'মন খারাপ করো না, আমি এখুনি ফিরে আসছি।'

ওঁর কথা যেন আমার কানেই ঢুকল না। মনে হচ্ছিল ওঁরা যেন অনেক আগেই বেরিয়ে গেছেন। মৃতের পাশে আমি একা। একটা নতুন ভয় আমাকে পেয়ে বসল। এধরণের জীবনের সঙ্গে পরিচিত

হবার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। একটা সিগারেট ধরিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করলাম। ধোঁয়ার আড়ালে টুকরো স্বপ্নগুলো যেন দানা বাঁধছিল। বাইরে তখনও বৃষ্টি ঝরছে। মরি যখন ফিরে এলেন তখন আমার তৃতীয় সিগারেটটিও শেষ হয়ে গেছে।

'কেন আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কি করে সে এই নোংরা গলির মধ্যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেল। অথচ অনায়াসে আমরা একটা শান্তি আর আরামের জীবন উপভোগ করতে পারতাম। আমাদের এই গোপনীয়তার কত প্রয়োজন তাও সে বুঝতে পারছে না।' পচা কাঠের উপর শামুক যেভাবে আটকে থাকে তাঁর সেই বিষণ্ণ দৃষ্টিটা আমার ওপর ঠিক তেমনি ভাবে স্থির হয়ে রইল। সমস্ত মুখ মণ্ডল জুড়ে আমি দেখতে পেলাম তাঁর হারিয়ে যাওয়া কেবল একটা চোখ।

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না,' আমি বললাম। আসলে তাঁকে খুঁচিয়ে এর উত্তরটা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, এই দীর্ঘ নীরবতার মধ্যে যা আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। 'আমি নিজেও জানি না কেনই বা আজ রাতে এখানে এলাম।'

'কারণটা তুমি ভালোভাবেই জান, কিন্তু প্রকাশ করতে চাও না।'

আমি বললাম, 'সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না, কেন এখানে মৃতদেহের পাশে বসে এই ভীষণ রাত্রি আমাকে অতিবাহিত করতে হবে। আমার নিজের বাবা যখন মারা যান, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করতেন তিনি, একটা মাচা ভেঙে পড়ে যান। সমস্ত পৃথিবীর ওপর তখন বিতৃষ্ণা এল। আমাদের জন্যে তিনি কিছুই রেখে যেতে পারেননি।' এই কথাগুলো বলতে একটু ইতস্তত বোধ করলাম। মরি কি জানেন আমি এক অস্পৃশ্য পরিবারে জন্মেছি? তবু আমি বললাম, 'কিন্তু আমি কাঁদিনি। অথচ এখন··· জানি না কেন, নিজেকে বেশ দুর্বল মনে হচ্ছে। আমার বাবার

মৃত্যুশয্যার পাশে বসেও আমি এতটা বিরক্ত বোধ করিনি।'

মরি এক চোখের স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। এর আগে কখনও এমন গভীর ভাবে তাকাতে দেখিনি। উনি কোন উত্তর দিলেন না, অথচ যেভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন, আমার বাবা-মার দৃষ্টিতে সেই অনুভূতি আমি কোনদিন খুঁজে পাইনি। মনে হল আমার কথা উনি বুঝতে পেরেছেন।

মরির শক্ত ঠোঁট দুটোর মধ্যে একটা অস্পষ্ট হাসির রেখা দেখা গেল। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু বিছানার দিকে চোখ পড়তেই ওঁর হাসি মিলিয়ে গেল। নিজেকে সংযত করে নিয়ে উনি ধীরে ধীরে বললেন, 'ইসান এটা ভালোমতই জানত যে আমরা তার সংগ্রামী মনোবলের উত্তরাধিকারী হব, আর সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের এই বন্ধনকে দৃঢ়তর করতে পারব। এই জন্যেই আমি বলেছিলাম সে এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত। আমরা তাঁর সংগ্রামী চেতনার উত্তরাধিকারী।'

মরি থামলেন। কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। মাটি মাখা নীল রঙের বিছানার চাদরের ওপর অস্পষ্ট ফুলকাটা নক্সার দিকে তাকিয়ে বলে চললেন, 'একবার গরমের সময় সেতো দ্বীপে আমরা মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। আমি তখন হাইস্কুলেই পড়ি। দক্ষিণ সাগর থেকে আমার কাকা তখন বাড়িতে ফিরেছেন। উনিও আমার সঙ্গে ছিলেন। বেশ আরামে ছুটির দিনগুলো কাটছিল।

'আমরা যেখানে থাকতাম সেই সরাইখানায় একজন জেলে-বৌ আসত ধোয়া মোছার কাজ করতে। গ্রামের রাস্তায় মাছ ধরতে যাবার সময় আমি দেখলাম তার স্বামী মদ খেয়ে তাকে বেধড়ক মারছে। বাচ্চাগুলো কেউ চিৎকার করছে, কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার বড় ছেলেকে জোর করে সৈন্যবাহিনীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ছেলেটা তামাকের খরচের জন্যে যে সামান্য টাকা পেত, তার থেকে বাঁচিয়ে সামান্য টাকা বাড়িতে পাঠাত। জেলে-বৌ তাই

জমিয়ে রাখত। জেলে হঠাৎ আবিষ্কার করল তার স্ত্রীর কাছে জমানো কিছু টাকা আছে। এখানেই ঝগড়ার সূত্রপাত। মারতে মারতে তাকে চুল ধরে টেনে সে বালির ওপর নিয়ে এল। অবশেষে তার হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে টাকার থলিটা এক থাবায় ছিনিয়ে নিয়ে টলতে টলতে শহরের দিকে চলে গেল।

'হঠাৎ মনে হল একটা প্রচণ্ড বজ্রপাত হল। জেলেনীর সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে যেই আমি চমকে লাফিয়ে উঠলাম, কাকার মাছ ধরার বঁড়শিটা এসে বিঁধল আমার চোখে। চোখটা আমার কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল। আমি বুঝতে পারলাম না যন্ত্রণাটা আমার বুকে না এই চোখটায়। জ্ঞান হতেই কাকার গলার স্বর পেলাম, চেঁচিয়ে বলছেন, 'গাধা···গাধা কোথাকার, দিনের বেলায় বসে বসে স্বপ্ন দেখছ।' কাকা প্রচণ্ড রেগে গিয়েছেন তখন।

'সত্যিই এটা একটা মর্মান্তিক দিবাস্বপ্ন। আমি একটা চোখ হারালাম। কিন্তু কিছু পরেই আবিষ্কার করেছিলাম, আমি একটা চোখ নিয়ে একজোড়া চোখের থেকে অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেই প্রথম আমি আমার প্রকৃত সত্তার সঙ্গে গ্রামবাসীদের চরম দুর্ভোগময় জীবনের বৈষম্য উপলব্ধি করলাম। জেলে-বৌ'এর যন্ত্রণা জেলে বাপ'এর স্বপ্নভঙ্গ আমাকে এক নতুন দৃষ্টিশক্তি দিল। সেই দৃষ্টিতে আমি তখন অনেক ভালো করে বিশ্বকে দেখতে শিখলাম।'

মরি আমার দিকে তাকালেন। তার সেই দৃষ্টির সামনে আমার পিছু হঠার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেল।

'এই পৃথিবীর যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে না পারলে তুমি নিজেকে সত্যিকারের মানুষ বলে দাবী করতে পারবে না। এক চোখ হারিয়ে আমি আমার নতুন দৃষ্টি শক্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু যা বলছিলাম···সেই দ্বীপে কোন হাসপাতাল ছিল না। পরের দিন সকাল পর্যন্ত ষ্টীমারের অপেক্ষায় থাকতে হল। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে পরের দিনই ষ্টীমার পেলাম, কিন্তু তাতেও আমার চোখটা রক্ষা করা গেল

না। আমার কাকা যুগপৎ আমাকে অভিসম্পাত আর নিজের দোষের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে গেলেন। এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে আমার কলেজের পড়া সাঙ্গ করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। গ্রাজুয়েট হবার পর একটা ভালো বেতনের সম্মানজনক চাকুরী আর আমি যদি রাজী হই তবে কোন লাখোপতির মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রতিশ্রুতিও রাখতে ভুললেন না। আমার কাকার চরিত্র আমি ভালোভাবেই জানতাম, আর তাই মনে মনে তাঁকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম। তাঁর উচ্চাসন থেকে তিনি গরীব জেলেদের দারিদ্র্য অজ্ঞতাকে অভিসম্পাত করতেন, আর সরাইখানায় যারা কাজ করতে আসত সেইসব জেলে মেয়েদের সঙ্গে নষ্টামি করতেন। এখন থেকে আমি আমার কাকাকে শত্রু বলেই মনে করতে আরম্ভ করলাম। মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধবাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়াও আক্রমণকারী জাপানীদের সঙ্গে চীনকে শোষণ অত্যাচার করতে ভাগীদার হতেন। হ্যাঁ, তারপর আমি যখন কলেজে ঢুকলাম এই ইসামের কাছেই আমি মার্কসবাদের পাঠ নিতে শুরু করলাম।'

তাঁর কথা যখন শেষ হল বর্ষনসিক্ত বাড়িটার স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ ভেসে এল। আমার চোখের সামনে তখন মরির জীবনের দৃশ্যগুলো ভাসছে। হঠাৎ নীচের তলায় একটা হট্টগোলের শব্দ কানে এল। আমার চিন্তাগুলো এক নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কে যেন প্রচণ্ড রেগে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে চেঁচামেচি করছে।

খবরের কাগজ আর চটি জোড়াটি হাতে নিয়ে মরি তাড়াতাড়ি আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাও। ছাদটা খুব পিচ্ছিল, সাবধানে যাবে। কেউ না কেউ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমাদের যুদ্ধ তোমাকেই চালাতে হবে। তাড়াতাড়ি কর। বেরিয়ে যাবার আগে জানালার বাইরে অপেক্ষা করে ভালোভাবে দেখে নেবে আমাকে ওরা গ্রেপ্তার করতে পারল কি না।'

আমাকে বারান্দার দিকে ঠেলে দিয়ে দোমড়ানো খবরের কাগজ-

গুলো ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। পায়ের তলায় বারান্দার কাঠের তক্তাগুলো বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল। খুঁটি বেয়ে একটা টালির ছাদে নেমে পড়লাম। আমার একহাতে চটি, খুঁটিতে ঝুলতে ঝুলতে চারিদিকের অন্ধকারে আমি পালানোর পথ খুঁজতে লাগলাম। ছাদটা পেরিয়ে নীচের গলিতে লাফ দেব? তখন প্রায় মাঝরাত্রি। কিন্তু যেখানে ছাদটা শেষ হয়েছে সেখান থেকেই রেস্তোরাঁর একটা লাল নিয়নের আলো দেখতে পেলাম। লাল আলোটা বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ছাদের ওপর অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলে যেন আমারই ভবিষ্যত ইঙ্গিত করছে। মৃতদেহটা যে ঘরে আছে সেই ঘর থেকে বাইরে আলো পড়েছে। গুটিসুটি মেরে আলোটা এড়িয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিলাম। বাঁশের খুঁটির শেষে ছাদের কিনারে আমার প্রলম্বিত ঘাড়টা ঠেকে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফ দিতে উদ্যত হলাম।

মরির কুঁজো পিঠটা নিশ্চল। সিঁড়ি থেকে ওঠার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমাকে রক্ষা করার জন্যে মরিকে ধন্যবাদ। কিন্তু কি ছোট আমার মন। আমার কি এই মুহূর্তে পালিয়ে যাওয়া উচিত! মরি নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতে পারতেন, আমার ওঁকে সাহায্য করা উচিত ছিল। আমার চেয়ে ওঁর জীবনের মূল্য অনেক অনেক বেশী। মরি আমাদের নেতা। সংগ্রাম আর আন্দোলনে মরি অনেক বেশী ইস্পাত-দৃঢ়। কিন্তু আমি কি পারব মরি চলে যাওয়ার পর তাঁর আরব্ধ সংগ্রামকে শেষ করতে?

এখন আমি আর মরিকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম সিঁড়ির মুখে অন্ধকারে স্তব্ধ প্রহরীর মতো এখনও উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্থির ঋজু ভঙ্গিতে।

মা

পাক কে জু



সাম্প্রতিক কোরিয়ান ছোটগল্পের এক দুর্লভ প্রতিভা পাক কে জু। সংগ্রামী চেতনা এবং বলিষ্ঠ আঙ্গিকে রচনার জন্যে তাঁর গল্প তরুণদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর বেশ কিছু গল্প ইতিমধ্যেই নানান গল্প সংকলনে স্থান পায় এবং ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলায় সম্ভবত এইটিই তাঁর প্রথম অনুবাদ গল্প।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানীরা যখন কোরিয়া দখল করে নিল আমাদের এই গল্পটা সেই সময়েরই। জাপানী শাসকরা কোরীয় ছাত্রদেব যুদ্ধে 'স্বেচ্ছাসেবক' হতে বাধ্য করত। তাদের আবার একই গ্রুপে একসঙ্গে রাখা হত না। জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত। এমন একজন কোরিয়ান ছাত্র চোং তা হো। তাকেও জোর করে সামরিক বাহিনীতে ঢোকানো হয়েছিল। উত্তর চীনের যুদ্ধে পাঠানো হল ওকে। কেমন করে জানি সে পালিয়ে গিয়ে ইয়েনানে আশ্রয় নিয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হল। তা হো দেশে ফিরে এল। তারই কাছে শুনেছিলাম আজকের এই গল্পটা।

আমি মিলিটারী থেকে ইয়েনানে পালিয়ে যাবার আগেই তাই হান সাংমোর লড়াইয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের কোম্পানীতে আর একজন কোরিয়ান ছেলে ছিল, নাম কিম ইংচোল। ছেলেটা কোনদিন স্কুলের দরজাও মাড়ায়নি। গ্রামের এক বিধবার একমাত্র ছেলে। তাকেও জোর করে উত্তর চীনের যুদ্ধে পাঠানো হয়েছে।

এই ধরনের যুদ্ধে কোন সৈনিকের খ্যাতি কিংবা জয়ের গৌরবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। তার কোন ব্যক্তিগত আশা বা ইচ্ছাও না। সে শুধু সারাক্ষণ নিজের মৃত্যুর চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অন্যান্য

সৈন্যদের মতো আমারও নতুন কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তবে আমার আবেগ অনুভূতি অত সহজ সরল ছিল না। সারাক্ষণ একটা চিন্তাই আমার মধ্যে ঘুরপাক খেত—আমি আমার নিজের দেশের জন্যে লড়াই করছি না। আমাকে আমার দেশের শত্রুদের হয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আমাকে আমার দেশের মানুষ, যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে রাইফেল ধরতে হচ্ছে। আমার এই যন্ত্রণায় আমি ডাক ছেড়ে চিৎকার করতে চাইতাম। কিন্তু সেখানে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির আবেগের কোন জায়গা ছিল না।

যখন কিমের সঙ্গে একা থাকতাম, বলতাম, 'আমরা কোরিয়ান।' সে শুনত, কিন্তু যেহেতু ও নিষ্পাপ শিশুর মতই সরল, আমার কথার মানে বুঝতে পারত না। আমাকে আরও ব্যাখ্যা করতে হত, 'আমরা কোরিয়ান, একথা যেন আমরা কোনদিন না ভুলে যাই। ও কিছুটা বোঝবার চেষ্টা করত। কিন্তু কতটুকু বুঝত সন্দেহ ছিল। কিছুদিন পরে আমি আবার ওকে মনে করিয়ে দিলাম, 'ভুলে যেও না, আমাদের বিরুদ্ধে যারা লড়ছে তারা কোরিয়ার সত্যিকারের 'স্বেচ্ছাসেবী', আট নম্বর ফৌজের সৈনিক, কোরিয়ার মুক্তিযোদ্ধা।' এতদিনে সে পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝতে পারল। আর তারপর থেকেই যুদ্ধের ময়দানে আমাদের নিশানা সবসময়ই ভুল হত।

মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতাম আমি আর কিম জাপানী ফৌজ থেকে পালিয়ে আট নম্বর ফৌজে যোগ দিয়েছি। আমি আর কিম খুব সাবধানে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠছি। ঠিক যখন কাঁটা তারের সীমানাটা পেরোতে যাব, রাইফেলের শব্দ হল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। শুনলাম, 'এই, চুপ চুপ!' 'কি ব্যাপার?' চোখ মেলে দেখি কোথাও কোন পাহাড় নেই। তাঁবুর ভেতরে বাঙ্কে শুয়ে আছি। 'এই শালা শুয়োরের বাচ্চা। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিস কেন?' আমার অফিসারের গলা। আমি উঠে 'অ্যাটেনশন' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আর একবার কিম আর আমি জাপানী কম্যাণ্ডারকে গুলি করে

মেরে ফেলেছিলাম। এটাও একটা স্বপ্ন। আর একটা স্বপ্নে আমরা আট নম্বর ফৌজে পৌঁছেছিলুম ঠিকই, কিন্তু তারা আমাদের ভুল করে জাপানী গুপ্তচর মনে করে জেলে পুরে দিল। যখনই আমরা একা থাকতাম জাপানী ফৌজ থেকে পালাবার পরিকল্পনা করতাম।

কিন্তু হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তাই হান সাংমোর যুদ্ধে কিম ভয়ানক ভাবে জখম হল। ওকে কুড়ি মাইল দূরের মিলিটারী হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি আবার বিশ্রী রকম একা হয়ে পড়লাম। বাড়ি থেকে চলে আসার সময়ে বন্ধু-বান্ধব বাবা-মা-দের ছেড়ে আসার সময়ের সেই দুঃখের দিনগুলোর কথা মনে পড়ত। বোধহয় তারচেয়েও খারাপ। কেননা, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ময়দানে আমি আমার একমাত্র কোরিয়ান বন্ধুকে হারালাম, যে নাকি আমার সঙ্গে পালাবে বলেছিল।

দু'সপ্তাহ পরে যুদ্ধের বড় ধাক্কাটা কেটে গেল। আমি কিমকে একবার দেখে আসার সুযোগ পেলাম। আহা, ওকে আবার দেখতে পাব, আর ও-ও নিশ্চয়ই আমাকে দেখে খুব, খু-উ-ব খুশি হবে। যখন পৌঁছলাম দেখি কিমের দুটো চোখেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যন্ত্রণায় ও গোঙাচ্ছে। আমাকে বুঝতে পারল না, আমি কাছে গিয়ে ডাকলাম 'এই কানেয়ামা!' কানেয়ামা তার সত্যিকারের পদবী নয়। জাপানীরা কোরিয়া দখলের পর আমাদের নাম ধাম পদবী পর্যন্ত জাপানীদের মতো করে নেবার নির্দেশ দেয়। এবং বাড়ির লোকেরাও তাই তাদের পদবীকে জাপানীদের মতো করে নিতে বাধ্য হয়। এই ভাবেই তারা কোরিয়ার জাতীয়তাবোধকে ধ্বংস করতে চায়। কিমকে এই নামে ডাকতে ঘৃণা বোধ করতাম আর সত্যিকারের নামে ডাকবার সাহস না থাকায় নিজের ওপরেও ঘৃণা হত। ওর দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে আবার জোরে ডাকলাম 'কানেয়ামা!' না, এবারও কোন উত্তর নেই। আমার আওয়াজ শুনে ডাক্তার এলেন। তাঁর কাছে শুনলাম কিম শুধু অন্ধই হয়ে যায়নি, তার কানও আর কোনদিন কিছু শুনতে পাবে

না, বোমার প্রচণ্ড শব্দে ওর কানের পর্দা ফেটে গেছে। ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলাম। ও কাঁপছিল। জিগ্যেস করল, 'কে?' আমাদের জাপানী ভাষায় কথা বলার নির্দেশ ছিল। কিন্তু কিম ভুলে গেছে। কোরিয়ান ভাষাতেই ও উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমার মা, নাকি?' তারপর যখন বুঝল এটা ছেলের হাত, তখন মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'আমি, আমি মাও সুমুরা···না, না, চোং তা হো।' যদিও বুঝতে পারছি ও কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, তবু নিজের কোরিয়ান নামটা বললাম, প্রায় ভুলতে বসা একটা নাম।

কিম তখনও বলে চলেছে, 'মার কাছ থেকে কোন খবর আসেনি? উঃ কথা বলছ না কেন? মাকে লক্ষ্মীটি একবার টেলিগ্রাম করে দাও। মরার আগে মাকে একবার দেখে যাই।' কিম জানত ও আর বেশিদিন বাঁচবে না। একজন নার্স বলল, 'দিন রাত, সারাক্ষণ, যতক্ষণ ওর জ্ঞান থাকে মাকে 'তার' করে দিতে বলে।'

একদিন আমি ওখানে ছিলাম, আর একজন নার্স ওর হাত ধরেছিল। কিম চীৎকার করে উঠল, 'মা এসেছ!' মেয়েটি কেঁদে ফেলল। তারপর থেকে ওর গায়ে হাত দেওয়া বারণ। একদিন ওর হাতের কাছে একটা কাগজের টুকরো পড়েছিল। কিম ওটা ধরেই সবাইকে জিগ্যেস করল ওটা ওর মায়ের 'তার' কিনা। সবাইকে পড়ে দিতে বলল।

আমার কথা কিমকে জানাবার কোনও উপায় নেই। কিম যদি লিখতে পড়তে জানত তাহলে হয়তো ওর হাতে দাগ টেনে টেনে বোঝাতে পারতাম। বেরিয়ে আসার সময় ডাক্তারকে জিগ্যেস করলাম সত্যি সত্যি ওর মাকে 'তার' করা হয়েছে কি না। জানতাম সামান্য একটা সৈন্যের জন্যে ওরা অত ঝামেলা করবে না। কিন্তু ডাক্তার জানালেন—হয়েছে। বুঝলাম যুদ্ধে জাপানীরা মার খেয়ে খেয়ে এমন একটা জায়গায় এসেছে যে তাদের কোরিয়ার মানুষদের কাছে ভালো একটা ধারণা তৈরি করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাহলে হয়ত

কোরিয়ান ছেলেরা নিজেরাই যুদ্ধে আসবে কিংবা বাড়ির লোকেরাও রাজি হবে ছেলেদের ফৌজে নাম লেখাতে।

'কোন উত্তর এসেছে ?'

'না, এখনও আসেনি।'

সেদিন বিকেলে খাবার আর চিকিৎসার ওষুধপত্তর নিয়ে একটা মিলিটারী ট্রাক হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়াল। ট্রাকে জনাকয়েক ফৌজী অফিসার ছাড়া একজন বৃদ্ধা মহিলাও রয়েছেন। আমার কেমন যেন মনে হল ইনিই কিমের মা। অন্যেরাও তাই মনে করল। কিন্তু তাদের কাছে তিনি সামান্য একজন সাধারণ কোরিয়ান বৃদ্ধা। আর আমার কাছে তিনি নিজের মার মতন, কোরিয় মা…যদি তিনি কিমের মা নাও হতেন।

হ্যাঁ, উনি কিমেরই মা। আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারলাম না। যদিও তাঁর ছেলের আঘাতের জন্যে আমি দায়ী নই। তবু নিজেকে কেমন যেন অপরাধী অপরাধী মনে হচ্ছিল।

তাঁর সঙ্গে ডাক্তার নার্সদের নিয়ে কিমের সামনে গেলাম। যখন তিনি ওর চোখ দুটো ব্যাণ্ডেজে বাঁধা দেখলেন, প্রায় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। 'ইংচোল!' চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। কিম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। তিনি আবার বললেন, 'ইংচোল, আমি এসেছি রে, আমি তোর মা! আমি এসেছি রে।'

কিন্তু, কিম শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কে ?'

'আমি, তোর মা!'

আমি কি করে তাঁর মুখের ভাব, বুকের বেদনাকে বোঝাবো? অনেক কষ্টে নিজের কান্না চেপে রেখেছেন। আমি হলে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতাম। মার এই বেদনাভরা মুখের ভাব বোঝানো আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। কিম মায়ের হাত দুটো চেপে ধরল। জিগ্যেস করল, মার কাছে 'তার' পাঠানো হয়েছে কিনা।

'এই তো, আমি এসেছি। আমি এখানে, তোর মা! এই তো

আমি।' তাঁর হাতদুটো ওর মুখে আদর করতে লাগল। চুমায় চুমায় মুখটা ভরিয়ে দিলেন। কিম মুখটা ঘুরিয়ে নিল। শুধু মা-ই নন, আমিও ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বৃদ্ধা নানানভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

শেষে আমাদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে তাঁর জামার বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেললেন। স্তনদুটো বার করে কিমের মুখের ওপর রাখলেন। প্রথমে কিম কিছু ধরতে পারেনি, তারপর যেন এক অতি পরিচিত জিনিস হাতে পেয়েছে এমন ভাবে মায়ের বুকটা কাছে টেনে নিল, 'মা!' কিম মাকে জড়িয়ে ধরল। ব্যাণ্ডেজ ছাপিয়ে চোখের জলে মায়ের বুক ভেসে গেল, 'মা, মাগো, মা!' আমি আর কান্না চাপতে পারলাম না।

আমার গল্পের এখানেই শেষ। কাঁদতে কাঁদতে আমি ককিয়ে উঠেছিলাম, 'মা!' কিমের মায়ের মধ্যে আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার মা, যাঁকে আমি অনেকদিন আগে হারিয়েছি, আমার কোরিয়া মা, যিনি এখনও জাপানীদের হাতে লাঞ্ছিতা, সেই কোরিয়া মাকে আর কোনদিন ভুলতে পারিনি। সেদিন থেকে আমার দেশ, আমার মাকে খুঁজেছি, কোরিয়া মার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজতে চেয়েছি। আমার সেই মায়ের জন্যেই আমি জীবনকে হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছি। আজ আবার মায়ের বুকে ফিরে এসেছি।

অনুবাদ। পার্থ রাহা

একজন আমেরিকান মুক্তির আলো দেখলেন

থান গিয়াঙ এবং লু নগো



এই গল্পের দুজন লেখক থান গিয়াঙ এবং লু নগো বয়সে তরুণ। তাঁরা শুধু লেখকই নন, মুক্তি ফ্রণ্টের অন্যতম সৈনিকও বটে। লেখক হিসেবে তাঁরা এখনও প্রতিষ্ঠিত নন। এই গল্পটি তাঁরা যখন লেখেন তখন দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তাঞ্চল সবে বিস্তার লাভ করছে এবং মার্কিন ও দিয়েম চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক্রমেই সংহত ও ব্যাপক রূপ ধারণ করছে।

বেশ কিছুদিন হল জর্জেস ক্রেট বন্দী হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে অস্বস্তিকর ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একজন আমেরিকান হিসেবে সে ভিয়েতনামে এসেছিল এক মহান দায়িত্ব নিয়ে। যদিও সে উচ্চপদস্থ অফিসার নয়, তবু তার বিশ্বাস ছিল তার সঙ্গে একজন গণ্যমান্য অতিথির মতোই আচরণ করা হবে।

চ্যাপটা নাক এবং হলদে গায়ের রঙ ভিয়েতনামের মানুষ তার চোখে একটি পশ্চাৎপদ জাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে এখানে এসেছে এই পশ্চাৎপদ জাতিকে গড়ে পিটে সুসভ্য করে তুলতে। আর কি আশ্চর্য, সায়গনের অনতিদূরে সে যখন ভ্রমণ করছিল তখন তারাই তাকে বন্দী করল। সে বিস্মিত হয়ে তাদের জিগ্যেস করেছিল 'আমাকে তোমরা কেন বন্দী করলে? আমি কি কিছু ভুল করেছি? আমাকে প্রেসিডেন্ট নগোর কাছে নিয়ে চল।'

কিন্তু সে জানত না কাদের হাতে সে বন্দী হয়েছে। ভিয়েতকঙ এবং তাদের এলাকা সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। সে মনে করেছিল তার বন্ধুরাই তাকে ভুলবশতঃ বন্দী করেছে। অথচ কি আশ্চর্য তার এই বন্ধুরা নগো দিয়েন দিয়েম বাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত

মিলিয়ে গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত করে না, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয় না কিম্বা ঘাঁটি অঞ্চলে ওত পেতে উত্তরের কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ চালায় না। সে কখনও তার এই বন্ধুদের স্থানীয় মেয়েদের সাথে অশ্লীল ব্যবহার করতে দেখেনি। যখন সে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিল তখন বেঁটে খাটো লোকগুলো কত দরদী মন নিয়ে তাকে দেখাশোনা করেছে। এই নিরীহ মানুষগুলো কেন যে ঘৃণায় বিদ্বেষে আমেরিকানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা সে বুঝে উঠতে পারে না। যেদিন এদের হাতে বন্দী হল সেদিন সে একই ঘৃণার আগুন জ্বলতে দেখেছে এদের চোখে।

জর্জেস ক্রেটের চেহারার মধ্যে একটি পুরুষালী সৌন্দর্য আছে। তার কপাল বেশ প্রশস্ত। দেখলেই বোঝা যায় বেশ চালাক চতুর ছেলে। বছর সাতাশের মতো বয়েস। মাধ্যমিক স্কুলে সে পড়াশুনা করেছে। তার বেশী আর সে এগুতে পারেনি। অধিকাংশ সময়েই সে অত্যন্ত গভীর মনযোগের সঙ্গে তার স্ত্রীর ছবি দেখত। তার চোখ দুটি দেখলে বেশ বোঝা যেত সে তার স্ত্রীকে কত গভীর ভাবে ভালবাসে। তাদের ছ বছরের এক সন্তান আছে।

জর্জেস ক্রেটের বাবা একজন ফেরিওয়ালা। পথে পথে সে নানান রকম টুকিটাকি জিনিস ফেরি করে বেড়ায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে তার বাবা ক্রেটকে স্কুলে পাঠায় লেখাপড়া শেখবার জন্যে। ক্রেট কোনদিন উচ্চশিক্ষা লাভের আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখেনি। বেকার জীবন বাবাকে বাধ্য করেছিল তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে। তারপর বিভিন্ন জায়গায় তাকে খেটে রোজগার করতে হয়েছে, কোথাও ঝাড়ুদার কোথাও বা শ্রমিক হিসেবে।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সে যখন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল তখন খুশীই হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল সৈনিক হিসেবে সে অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে, তার জ্ঞান পিপাসাকে মেটাতে পারবে বিনা পয়সায় দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে। তাই সে

নিজেকে একজন সাচ্চা সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে লাগল অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্নে।

সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার খুব অল্পদিন পরেই ক্রেট একজন স্কাউট-মাস্টার হিসেবে দেশ-বিদেশ দেখার সুযোগ পেল। দু সপ্তাহ পশ্চিম জার্মানীতে কাটাল। তারপর সেখান থেকে গেল ইতালিতে। আমেরিকান বয়েজ স্কাউট হলিডে ক্যাম্প পরিদর্শন করল। ইতালিতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে মিউনিখ এবং সেখান থেকে অষ্ট্রেলিয়া, যুগো-স্লাভিয়া ও তুরস্কের ইজমির হয়ে প্রায় দু বছর পর সে দেশে ফিরল। এইসব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে চলেছিল তার এই তরুণ জীবনে।

একদিন তাকে এস. পি ৪ ইউ. এস. এ. অঙ্কিত একটি ব্যাজ দেয়া হল। আর তার সঙ্গে দেয়া হল একশ ডলার। এই একশ ডলার দিয়ে তাকে ভিয়েতনামের আবহাওয়ার উপযোগী সুতির পাতলা জামা কাপড় কিনতে বলা হল। তাকে কেন স্থানান্তরিত করা হল তা সে মোটেই বুঝতে পারল না। তার দেশের এক ক্ষুদ্র শাসক চক্র এমন এক বিশ্ব পুলিসী ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আছে যাকে অনুধাবন করার মতো চেতনা তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে নেই।

উনিশ শ ষাট সালের ৪ঠা জুলাই একটি পি. এ. বিমানে চড়ে সে টানসোনহাট বিমান বন্দরে অবতরণ করল। সঙ্গে ছিল তার আরও কয়েকজন বন্ধু এবং দুইজন ক্যাপ্টেন—ভাভেজ এবং ভাউপোজ। তার পুরনো বন্ধুরা যারা আগে এখানে এসেছিল তারা তাকে 'হোটেল মেট্রোপলে' নিয়ে তুলল। পরে তাকে এখান থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হল। স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর তাকে প্রথমে নৌ বাহিনীর ক্যানটিনে এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুটনৈতিক অফিসে কাজ করতে দেয়া হল। এখানে কিছুদিন কাজ করার পর তাকে এম. এ. এজি হেড কোয়ার্টারে সহকারী কেরানির কাজ দিয়ে পাঠানো হল।

স্থানীয় জনসাধারণের একজন সত্যিকারের হিতৈষী হওয়ার জন্যে

সে ভিয়েতনাম-আমেরিকান মৈত্রী সংঘের সদস্য পদ গ্রহণ করল। প্রতি মাসে সে মাইনে হিসেবে যে নব্বই ডলার রোজগার করত তা নিজের এবং বাড়ির জন্যে রেখে দিয়ে অন্য উপায়ে যে টাকাটা তার হাতে আসত তা থেকে হলদে-চামড়ার বন্ধুদের ইংরেজি শিখিয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে খরচ করত।

সায়গনে থাকাকালীন সময়ে নাচঘরে একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সংস্পর্শে সে আসে। এই ফরাসী ভদ্রলোক আগে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা ছিলেন। এঁর সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে ফ্রেট প্রায়ই তাঁর সাথে গল্পগুজব হাসি-তামাশা করে সময় কাটাত। মাঝে মাঝে এই ফরাসী ভদ্রলোক রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করতেন। বলতেন, পুরনো দিনের ফরাসী উপনিবেশ-বাদীদের কেন ভিয়েতনাম থেকে পাততাড়ি গোটাতে হল। ফরাসী ভদ্রলোকের এই রাজনৈতিক আলোচনা তার মধ্যে প্রতিনিয়ত আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছিল। তিনি বারবার তাকে বললেন 'বুঝলে, এখানে নিশ্চিন্তে বাস করা সম্ভব নয়। স্থানীয় কৃষকরা আমেরিকান এবং দিয়েম একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে, বিশেষ করে যখন সায়গনের বাইরে যাবে। ভিয়েতনামীরা আগের দিনে যেমন ফরাসীদের ঘৃণা করত এখন ঠিক তেমনি আমেরিকানদের ঘৃণা করে।'

কিন্তু কেমন করে এ সম্ভব। ফ্রেট ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। আমেরিকানরা তো এদের জন্যে অনেক কিছুই করেছে। তারা তাদের বন্ধু দিয়েমকে তো সমস্ত রকম সাহায্যই দিচ্ছে। যাতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার পশ্চাৎপদ নিষ্ঠুর ভিয়েতকঙদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারে। এই জন্যেই তো আমেরিকা থেকে অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, যান বাহন, পরামর্শদাতা সব কিছুই আসছে।

তার নিজের অবশ্য দিয়েমের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তার বন্দী জীবনের অনেক দিন পরে সে জানতে পারল

তার বন্ধু দিয়েম বাহিনী তাকে গ্রেফতার করেনি, ভিয়েতকঙদের হাতে বন্দী হয়েছে। এই কথা জানার পর থেকে সে আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে নিশ্চিত যে তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার প্রিয় শহর ক্যালিফোর্নিয়ার লঙ বিচ। সে আর কোনদিন দেখতে পাবে না তার সেই শান্ত-সমাহিত মাতৃভূমি। ভেসে উঠল তার প্রিয়তমা আর ছোট্ট শিশুর সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখ। কান্নায় তার চোখ ভরে উঠল। আর কোনদিন তাদের সে দেখতে পাবে না, কোনদিনই না।

কিশোর তরুণ বৃদ্ধ প্রতিটি ভিয়েতকঙদের চোখের দিকে তাকিয়ে সে ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠছিল, আর মনে মনে নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করছিল। একজন ভিয়েতকঙ একটি কঞ্চিকে চেঁচে ছুলে ধারালো করছিল, তা দেখে সে ভয়ে শিউরে উঠল। তার ধারণা হল কঞ্চির এই তীক্ষ্ণ বল্লম দিয়েই তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হবে।

ক্রেট খুব কাছ থেকেই ভিয়েতকঙদের হাব-ভাব চলাফেরা লক্ষ্য করতে লাগল। সে দেখল অধিকাংশ ভিয়েতকঙই বয়সে তরুণ। বেশ শক্ত সমর্থ তাদের শরীর আর অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী। সে তাদের মধ্যে বর্বরতা বা নিষ্ঠুরতার কোন লক্ষণই দেখতে পেল না। বরং ঠিক তার উল্টো। শিশুরা তাদের আদর করে, ভালবাসে। বৃদ্ধারা তাদের মাতৃস্নেহ দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে। প্রতিদিন ভোরে তারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে শরীর চর্চা করে। বিকেলে ভলিবল খেলে। আর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, ঘন কালো অন্ধকার নেমে আসে তখন তারা তিনজন-তিনজন করে বসে রাজনৈতিক আলোচনা করে, নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করে। তাদের এই আলোচনার বিষয়বস্তু সে বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারে না।

আলোচনা এবং মত বিনিময়ের পর তারা একটু গান বাজনা এবং হৈ-হুল্লোড় করে। তারপর তারা খাবার টেবিলে একে একে সমবেত হয়। খাওয়া দাওয়ার আগে তারা বেশ ভাল করে হাত-মুখ ধোয়।

তাদের খাবারের কাঠিগুলো তারা গরম জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে নেয়। ফ্রেট মাঝে মাঝে তাদের আলোচনা শুনে বিস্মিত হয়ে যায়। একটি অনগ্রসর জাতি কি করে তাদের মাতৃভাষায় আলোচনা চালাতে পারে। আর যে রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু তার মতো একটি উন্নত জাতির যুবক কিছুই বুঝতে পারে না।

এই ভিয়েতকঙরা এত শৃঙ্খলাবদ্ধ, অথচ এদের সম্পর্কেই তাকে কত কিই না বলা হয়েছে। তার মনে হল মুক্তি ফ্রন্ট, মুক্তিবাহিনী সঠিক পথই গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে একের পর এক অসংখ্য চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। তার মতো এদেরও প্রিয়জন আছে, এরাও তাদের প্রিয়তমাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসে।

ফ্রেট লক্ষ্য করেছে ভিয়েতকঙরা কত সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করে। কোন অতিরিক্ত আড়ম্বর নেই, সরল অথচ তাদের জীবন প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। সর্বদাই হাসিখুশী। তারা এমন এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ যাকে তারা অগ্নিশিখার মতোই পবিত্র মনে করে। আর এই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা আমেরিকা আর তাদের বন্ধু রিপাবলিকান সরকার সম্পর্কে একটি আপসহীন নীতি গ্রহণ করেছে। তারা চায় সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে। চায়, নিজেদের জন্যে স্বাধীনতা। সবচেয়ে সে আশ্চর্য হয়েছে কমাণ্ডার এবং ভিয়েতকঙদের মধ্যে সুসম্পর্ক দেখে। এদের মধ্যে সে কোন সীমারেখা টানতে পারেনি। সে দেখেছে তরুণ বৃদ্ধ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল, প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহ নিয়ে নিজের নিজের কাজ করে চলেছে। সামরিক নিয়ম কানুন এবং আদব কায়দা বজায় রাখার জন্যে তাদের মধ্যেকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক এতটুকু নষ্ট হয়নি। বরং তা আরও মধুর আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না এই আশ্চর্য মানুষদের। সব কিছুই তার কাছে এক বিরাট বিস্ময়।

প্রথমে সে উপলব্ধি করতে পারেনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের কাছে সে একজন সাংঘাতিক অপরাধী। কোনদিনই সে শোনেনি

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কথাটি। নিজেকেই সে নিজে প্রশ্ন করে, সে কি মহান আমেরিকার একজন নাগরিক নয়। সে এখানে এসেছে এক অনুন্নত দেশের বন্ধুদের ওপর কমিউনিস্টদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা তার বন্ধু দিয়েমকে বলে ফ্যাসিস্ট একনায়ক। সে নিজেও তো বেশ বুঝতে পারছে এখানকার প্রতিটি মানুষ দিয়েমের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সে প্রায়ই সায়গনে দেখেছে বড় বড় প্রতিবাদ মিছিল। তারা দিয়েমের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দিত: দিয়েম নিপাত যাক, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম ছাড়ো। সে দেখেছে দিয়েমের সৈন্যদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে। দেখেছে অসংখ্য মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে। না না, সে আর এদের অত্যাচার আর নির্যাতন সম্পর্কে কিছুই ভাবতে পারে না। এরা সত্যিই জঘন্য মানুষ। তার মনের কোণে সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ফরাসী ভদ্রলোকের কথাগুলি সে বারবার মনে করার চেষ্টা করে। তিনি কেন তাকে এসব কথা বলেছিলেন?

সে একে একে সমস্ত ঘটনাগুলোকে যাচাই করতে শুরু করল। তুরস্কের রাস্তায় রাস্তায় সে অনেক ভিখারী দেখেছে। কিন্তু তারা সায়গনের ভিখারীদের মতো নয়। তাদের চেহারার মধ্যে এখনও লাবণ্য আছে, এখনও তারা অস্থিচর্মসার নয়। তাদের গায়ে একটুকরো জামা এখনও আছে। আর এই সায়গনে? এখানে সে দেখেছে দুঃখ আর দুর্দশায় জর্জরিত অসংখ্য ভিখারি। দিয়েম সরকারের জন্যেই তাদের এত দুঃখ দুর্দশা। তবে আমেরিকানরা কেন দিয়েমকে সাহায্য দিচ্ছে? কেন তাদের সাহায্য এই নিষ্ঠুর দারিদ্র্যকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করে দিচ্ছে না? ভিয়েনামের জনগণ তো দিয়েমের এই ঘৃণ্য শাসন ব্যবস্থাকেই গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। আমেরিকানরা সত্যি কি কোন ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে, না এদের এই ঘৃণ্য কাজকেই উৎসাহিত করছে?

ধীরে ধীরে ক্রেটের সামনে যা সত্য তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে

লাগল। তার দুচোখেই ছড়িয়ে পড়ল মুক্তির আলো। দুচোখ খুলে সে সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করল। সে স্পষ্ট দেখতে পেল, আমেরিকানরাই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী। মনে হল সে নিজেও এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। নিজেকে সে বার বার ধিক্কার দিল—সেও একজন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী। মৃত্যুভয়ে সে থর থর করে কেঁপে উঠল। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হৃদয়ের স্পন্দন চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে আর কোন দিনই দেখতে পাবে না এই পৃথিবীর আলো আর বাতাস।

এই প্রাণচঞ্চল যুবকদের সঙ্গে তার বন্দী জীবনের একের পর এক দিনগুলি অতিবাহিত হতে লাগল। প্রথম দিনের সেই ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিয়ে তারা তাকে আর দেখে না, বরং তারা তার সঙ্গে আন্তরিকতার ভঙ্গিতে কথা বলে। মাঝে মাঝে তারা সুন্দর সুন্দর বুনো ফলের খাবার এনে তাকে উপহার দেয়। খারাপ আবহাওয়ার সময় যখন সে জ্বরে পড়েছিল, তারা তাকে সযত্নে সেবাশুশ্রূষা করে-ছিল। তাদের সম্পর্কে সমস্ত পুরনো ধারণাই তার এখন পালটিয়ে যাচ্ছে, শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে আসে। সে এখন বুঝতে পারছে তার দুই সঙ্গী কুইন এবং গেরুন কেন মুক্তি পেল। নিশ্চয়ই তাকেও একদিন এরা মুক্তি দেবে।

তার দুই সঙ্গী কুইন এবং গেরুন যখন মুক্তি পেল তখন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নগো দিয়েন দিয়েমকে এক বিশেষ তারবার্তায় অভিনন্দন জানিয়েছিল। সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে একটি মহান দেশের প্রেসিডেণ্ট কেন দিয়েমকে অভিনন্দন বার্তা পাঠাল।

ক্রেট স্বয়ং মুক্তি ফ্রণ্টের কাছে নিজের মুক্তির জন্যে আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি পাঠাল। চিঠি পাঠিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় সে অধীর আগ্রহে বসে রইল। অবশেষে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই তার চিঠির উত্তর এল। তার আর্জি মঞ্জুর করা হয়েছে। সে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টের কাছে যে চিঠি সে পাঠিয়েছিল তাতে সে নিজেকে এই জঘন্য কাজের জন্যে ধিক্কার দিয়ে লিখেছিল :

উনিশ শ' একষট্টি সালের চব্বিশে ডিসেম্বর আমি আপনাদের হাতে বন্দী হই। বন্দী হওয়ার আগে আমি সত্যিই একজন হতভাগ্য সৈনিক ছিলাম। জানতাম, আমি দক্ষিণ ভিয়েতনামে এসেছি এখানকার মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্যে। কিন্তু এই কমাস এখানে থেকে আমার চোখ খুলে গেছে। আমি দেখেছি এদেশের মানুষ কি দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। প্রতিটি গ্রাস অন্ন যখন আমি মুখে দিই তখন মনে হয় আমি মুনাফালোভীদের হয়ে লুণ্ঠন চালাচ্ছি। আমেরিকার বিমান যখন এদেশের আকাশে পাখা মেলে এবং যখন বন্দুকের শব্দ শুনতে পাই তখন আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি। আমি আপনাদের দেশের সেই সব দেশপ্রেমিক বীর সন্তানদের অভিনন্দন জানাই যাঁরা মার্কিন দিয়েম চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের উৎসর্গিত করেছেন।

এখন সে চেতনার এক বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়েছে। আর তার সমস্ত সত্তা জুড়ে সৃষ্টি করেছে এক প্রচণ্ড আলোড়ন। সে তার স্ত্রী আর সন্তানের কাছ থেকে আজ বিচ্ছিন্ন। সে চায় তার এই অসীম আনন্দের অনুভূতিতে তারাও উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। তার এই মৃত্যু থেকে বেঁচে আসা নতুন জীবনের আস্বাদ তারাও গ্রহণ করুক। সে চায় তাদেরও চোখ খুলে যাক। তারাও তার মতো সত্যকে উপলব্ধি করুক।

সে তার পরিবার পরিজনদের কাছে এক চিঠিতে জানাল তার দেশের মানুষেরা এখানে কত জঘন্য কি বর্বর কাজ করছে। সে অত্যন্ত দুঃখিত যে তাদের দেশের লোক এখনও এখানকার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। অবশ্য সে এখানে না এলে এবং ভিয়েত-কঙদের হাতে বন্দী না হলে কিছুই বুঝতে পারত না। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তার বন্ধুদের এবং তার দেশের সমস্ত মানুষের কাছে সত্য

উদ্ঘাটিত করে দেবে। এই জঘন্য কাজের যারা হোতা সেই সব মুনাফালোভীদের এই জঘন্য কাজকে স্তব্ধ করে দেওয়া উচিত। মার্কিন দিয়েম চক্রের এই শাসনের অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ সুখে শান্তিতে বাস করুক। সে অত্যন্ত আনন্দিত যে মুক্তিফ্রন্টের সৈনিকরা তার চোখ খুলে দিয়েছে। সে তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। সে এখন নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত এবং ঘৃণ্য মনে করছে একজন সৈনিক হিসাবে অযাচিত ভাবে এই দেশে থাকার জন্যে। তার এই ব্যথা, ঘৃণা, লজ্জা যদি ছলনাই হত তবে সে অত্যন্ত নিপুণতার সাথেই অন্তর দিয়ে অভিনয় করত।

দক্ষিণ ভিতেনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট যখন একজন জাপানী ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ একজন জার্মান এবং একজন ফিলিপাইনবাসীকে মুক্তি দিল তখন সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল আমি যেমন গভীর ভাবে সত্যকে উপলব্ধি করেছি তারা তা করতে পারেনি।

অবশেষে সে মুক্তি পেল। একটি বাসে ওঠার সময় সে মুক্তি-বাহিনীর সমবেত সৈনিকদের ভিয়েতনামী ভাষায় কিছু বলার জন্যে তোতলাতে লাগল। তার চোখ দুটি আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

> 'ভিয়েতনামের জনসাধারণের সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমি দুঃখিত।
>
> আমি জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের এবং সেই সব মানুষদের কাছে কৃতজ্ঞ যাঁরা আমার মৃত্যু-আদেশ মকুব করলেন।
>
> আমি দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসাধারণের এই সংগ্রামকে সমর্থন করি।
>
> মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং নগো দিয়েন দিয়েম চক্র নিপাত যাক।'

তোতাপাখির মতো সে এই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে গেল না। কারণ সে পাখি নয়, সে বুদ্ধিমান তরুণ। সে যা উপলব্ধি করেছে তাই সে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত করে দিল।

বাসেই যাত্রীরা এবং যারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা তাকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আবার সেই কথাগুলো বলতে অনুরোধ করল।

তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছিল—এই নিষ্ঠুর শয়তানও বিপ্লবের আগুনে পুড়ে ভালো হয়ে যেতে পারে। বিপ্লবই পারে মানুষকে ইস্পাতের মতো নমনীয় এবং দৃঢ় করে তুলতে।

গভীর আবেগে মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে সে করমর্দন করল, এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

তারপর সে বাসে উঠে বসল। মুক্তিবাহিনীর একজন সৈনিক হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল, 'আমেরিকান জনগণের প্রতি ভিয়েতনামের জনগণের শুভেচ্ছা রইল। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

বাস অনেক অনেক দূর চলে গেল। কিন্তু এখনও তার মনে হচ্ছে সে যেন টুপি নাড়িয়ে মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।

একটি শিশুর জন্যে

নুগ্রহ নটসুশান্ত



ইন্দোনেশিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক নুগ্রহ নটসুশান্ত। জন্ম ১৯৩১ সালে, ইন্দোনেশিয়ার মধ্যজাভায়। বর্তমানে জাকার্তার ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ফ্যাকালটির অধ্যাপক। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'অক'লবর্ধন' থেকে 'একটি শিশুর জন্যে' গল্পটি সংগৃহীত। বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায়।

আকাশ আলকাতরার মতো কালো। আকাশভরা আগুনের ফুলকি ও আগ্নেয় রেখা। সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের গোঙানি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে একটানা বিস্ফোরণের শব্দ।

পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছে এবার আমার নামার পালা। তাই শরীরটাকে মাটির সঙ্গে আরও মিশিয়ে নামতে লাগলাম। পাহাড়টা ছোট আর নিচু। চারদিক থেকে বোমা আর কামানের অজস্র এই অগ্নিবৃষ্টি না থাকলে পর্যবেক্ষণের কাজটা আমার পক্ষে তেমন দুরূহ হত না। একেই অন্ধকার রাত্রি, তার ওপরে আমার সামনে দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একসারি আগুনে ঝলসানো ক্যাসাভা আর ভুট্টার গাছ। কী ভালোই না লাগত এখন যদি ভাজা ক্যাসাভা বা ভাপে-সেদ্ধ ভুট্টা খেতে পারতাম!

প্রায় হামাগুড়ি দেবার মতো করে নিচে নামছি, কেননা রণক্ষেত্রের দিক থেকে যেসব 'সীসের ঝাঁক' আসছে তা আমি এড়িয়ে চলতে চাই। ডাচরা আগেই ঢুকে পড়তে পেরেছিল, ফলে আমাদের ডান বাহুর অবস্থা একটু কঠিন। তবে আমাদের বাম বাহু আপাতত শান্ত। কিন্তু এই পাহাড়ের ওপর দিককার অবস্থা যদি জানা না যায়

আর শত্রু যদি আক্রমণ করে তাহলে আমাদের বাম বাহুরও অচিরেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা।

দুম্ করে একটা আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে আমি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়লাম। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। পনেরো বার শুনলাম, তারপরে মুখ তুলে তাকালাম। ও হরি, আমার সামনে মিটার দশেক দূরে ছোট একটা নারকেল গাছ। হতভাগা গাছটা আর ঠাঁই পেল না। তবুও ভালো যে কামানের গোলা নয়, নারকেল গাছ! গাছটাকে আমি ক্ষমা করতে পারলাম, যদিও এই গাছটার জন্যেই আমাকে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়তে হয়েছিল।

এমনি সময়ে সীসের ঝাঁক উড়ে আসতে লাগল, আরও অনেক বেশি সংখ্যায়, আরও অনেক দ্রুত। অভ্যাসবশতই আমি স্টেন-গানটাকে প্রস্তুত করে রাখলাম। সামনে আকাশের পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা বাঁশের কুঁড়েঘর। কখনও অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, কখনও কামানের গোলার বিস্ফোরণে আলোকিত হয়ে উঠছে। কার্তুজের ক্লিপটা আমি হাতের তালু দিয়ে ঠিক অবস্থায় আনতে চেষ্টা করলাম, যদিও আমি জানতাম যে ওটা পুরোপুরি ঠিক অবস্থাতেই আছে। আমি দরদর করে ঘামছি। হাতটা অবশ।

পিঠের ওপরে একটু বেয়াড়াভাবে আমার থলেটা ঝুলছে। থলের মধ্যে হাত পুরে আমি গুণতে লাগলাম বাড়তি ক্লিপ কটা আছে। এক, দুই, তিন—তিনটেই। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়াল চারটি। এক একটিতে পনেরো রাউণ্ড। তাহলে সব মিলিয়ে ষাট রাউণ্ড। সংখ্যার দিক থেকে খুব একটা বেশি নয়। আচ্ছা, সবকটা ক্লিপ লাগিয়ে রাখি না কেন? স্প্রিং ঢিলে থাকাই ভাল, (অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তাই মত) তাতে প্রাণ হারাবার আশঙ্কাটা কমে। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে সপসপ করছে, যেন স্নান করবার পরে গা মোছা হয়নি। গুলি ছোঁড়ার নিয়ন্ত্রণ-চাবিটাকে প্রথমে রাখলাম 'একে একে' অবস্থায় যাতে বেহিসেবী গুলি খরচ না হয়। কিন্তু তিন সেকেণ্ড না কাটতেই

চাবিটাকে ঘুরিয়ে দিলাম 'ঝাঁকে ঝাঁকে' অবস্থায়—যাতে নিরাপদ বোধ করতে পারি। বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে, আওয়াজ শুনে মনে হয় বুকটা ধাতু দিয়ে তৈরি। বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিলাম। নিজের ওপরেই নিজের রাগ হতে লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম।

'এখানে একটা যুদ্ধ চলছে—তবুও যে কেন বাতি নিবিয়ে রাখে না!' ভাবতে ভাবতে প্রথমে আমার রাগ হল, তারপরে করুণা। কুঁড়েটা গরীবের, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। পৃথক রান্নাঘর নেই, বাঁশের তৈরি একটিমাত্র কুঠরি। জমির হিসেব যদি নেওয়া হয় তো পাক সিমিন (গৃহস্বামী) গরীব নয়; ম্বোক সিমিন (স্ত্রী)-এর বয়স কম, দেখতেও মন্দ নয়, সৈন্যদের মধ্যে থেকেও, সতীত্ব বজায় রেখেছিল—সে এখন বাচ্চাকে নিয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূরে।

আহা, এখন যদি শরীরটা গরম রাখার কোন ব্যবস্থা থাকত! ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমি কাঁপছি। বুলেট যাচ্ছে কেটে কেটে, তবে আগের চেয়ে আরও কম সংখ্যায়। কুঁড়েটার দিকে আমার যাবার ইচ্ছে, শরীরটাকে আধাআধি খাড়া করে উঠে দাঁড়ালাম। হাতের মুঠোয় স্টেনগানটা ঠাণ্ডা আর ভিজে ভিজে লাগছে। ঠিক এমনি সময়ে একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। বজ্রাহতের মতো আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। কুঁড়েটার বিপরীত দিকে একটা ছায়া যেন নড়ছে। বন্দুকের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি উঠে এল। দূরে কামানের গোলা ফাটছে। শোনা যাচ্ছে রাইফেলের আওয়াজ।

আমি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকটা ঢিপঢিপ করছে। আর কোনো আওয়াজ নেই। প্রথমে একটি পা বাড়ালাম তারপরে অন্য পা। আমার পা টলছে।

পা টলছে! আচমকা রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে শোনা গেল একটি শিশুর কান্না। আমার খানিকটা আত্মবিস্মৃতি ঘটল। ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। একটি স্ত্রীলোকের গোঙানি কানে এল। ম্বোক

সিমিন। নিশ্চয়ই প্রসব হয়েছে। আমার মনে পড়ল আমার ছোটভায়ের জন্মের সময়ে মায়ের কথা। ক্যাসাভার ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছুটে এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম খিড়কির দরজার সামনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে সতর্ক করে দিল, তাই অপরিণামদর্শীর মতো আমি আর সামনে ছুটে যাইনি। সামনেই সদর দরজা। তার সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। তারপরেই শত্রুঘাঁটি। শিশুর কান্না শুনতে পাচ্ছি। আর তার কান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমার মায়ের কণ্ঠস্বর। অস্থির হাত দিয়ে দরজাটা আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছিলাম। হাতটা নামিয়ে নিলাম। এবারে আমার হাতের বন্দুকটা তৈরি, বন্দুকের নলটা সিধে। ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনের মধ্যে আশঙ্কাটা থেকে গিয়েছিল। চারদিকে তাই চোখ রাখছিলাম। হঠাৎ দক্ষিণ দিকটায় আমার চোখ পড়ে গেল। এই দক্ষিণ দিকটা হচ্ছে আমি যে-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি তার বাঁ দিকে। ওদিকটায় বেশ আলো, কারণ ওখানে একটা বাতি জ্বলছে। ঠিক এমনি সময়ে আরও কাছে থেকে কামানের গোলা ফাটার শব্দ হতে লাগল। পাহাড়ের ওদিক থেকে আরও ঘন ঘন বুলেটের শিস শোনা যাচ্ছে। আমি অভ্যাসবশত মাঝে মাঝে মাথা নিচু করছি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে পাক সিমিন বাড়িতে নেই। সম্ভবত সে গিয়েছে ধাই ডাকতে, বা সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে। প্রসূতি ও শিশুকে অবিলম্বে অন্যত্র সরানো দরকার।

যা করতে হয়, এক্ষুনি। সময় নেই। খুব কাছেই একটা বুলেট বিঁধল। তখন মন স্থির করে নিয়ে আমি দরজাটা খুলে ফেললাম। আমার চোখে পড়ল সামনের দরজায় নীল পোশাক আঁটা সাদা একটা অবয়ব, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। একটা পাথরের মতো আমি মাটিতে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলতে লাগল, তার দিক থেকেও, আমার দিক থেকেও। দুই দরজার মাঝখানের বাতাস

খানখান হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলাম, বাতি থেকে যতটা সম্ভব দূরে। বাতির আলোটা এখন গিয়ে পড়েছে বাইরে। পিছু হটতে হটতে হোঁচট খাচ্ছি, তবু পিছু হটছি। বারুদের ধোঁয়া আমাকে গ্রাস করেছে। শুনতে পাচ্ছি শিশুর কান্না। বিশ্রী লাগছে।

পলকের মধ্যে ডাইনে-বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে নিলাম। ঈশ্বরের দয়াই বলতে হবে, আমার চোখ গিয়ে পড়ল ক্যাসাভা ক্ষেতের ধারে পড়ে থাকা চাল কুটবার একটা কাঠের মুগুরের ওপরে। ঘামে আমার চোখের দৃষ্টি আবছা হয়ে যাচ্ছিল। মুগুরটার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছলাম। তারপর চোখ রাখলাম কুঁড়েঘরের ওপাশটায়, মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে। কেননা এমনও তো হতে পারে যে ডাচ্‌ম্যানটা একপাশ থেকে এসে আমাকে আক্রমণ করে বসল। কথাটা ভাবতেই আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। আমিও তো পেছন দিক থেকে গিয়ে ওকে আক্রমণ করতে পারি? কেন নয়? কিন্তু কথাটা ভেবেও আমি আবার কাঠের মুগুরটার আড়ালেই আশ্রয় নিলাম। কুঁড়েঘরের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। শিশুটির কথা ভেবেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হল যে এখানে অপেক্ষা করাটাই ভালো। এখানে একটা আড়াল আছে—নিরাপত্তার কথাই প্রথমে ভাবা দরকার। তাছাড়া আমার গুলির নিশানা অনির্দিষ্ট নয়, একটু এদিক-এদিক হয়ে গেলে গুলি গিয়ে মা বা শিশুর গায়ে লাগবে এমন সম্ভাবনা কম। কিন্তু ডাচম্যানটার মতলব কি? কোথায় ঘাঁটি নিয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে, আমার এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যেই যেন ডাচম্যানটা ওপাশ থেকে জানান দিল। লোকটা তাহলে এখনও ওখানেই। আমি গুলির জবাব দিলাম গুলি দিয়ে। তবে আমার যদি শুনতে ভুল না হয়ে থাকে ডাচম্যানের গুলির আওয়াজ টমসনের। বাচ্চাটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বাতাসে শুধু বারুদের গন্ধ। কাঁপা-কাঁপা উঁচু গলায় মবোক সিমিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে, খুব শীত করলে মানুষের গলার স্বর যেমন হয়।

আমি তাকিয়ে রইলাম কুঁড়েঘরটার বেড়ার গায়ে একটা আয়তাকার কালো ঝোপের দিকে। এই ঝোপটার পেছনেই নড়াচড়া করছে একটি ভুতুড়ে ছায়ামূর্তি, যার লক্ষ্য আমি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ টনটন করতে লাগল।

ছেলেবেলায় আমরা লুকোচুরি খেলতাম। সেই স্মৃতি মাঝে মাঝে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। অনুভূতিটা একই ধরণের, তফাৎ শুধু যা মাত্রার। বাচ্চাটা সমানে কেঁদে চলেছে, অবস্থাটা যে কিরকম ঘোরালো তা নিয়ে ওর কোন দুশ্চিন্তা নেই। কী দরকার ছিল ওর ঠিক এই সময়টিতে জীবন শুরু করবার, যখন দুজন সৈনিক পরস্পরকে খুন করবে বলে ঠিক করেছে? আমার গায়ের গরম ঘাম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। উত্তেজিতভাবে ক্ষিপ্র হাতে আমি বন্দুকের কার্তুজ-ক্লিপটা বদলে নিলাম। চাবিটাকে ঘুরিয়ে দিলাম 'একে একে'-র দিকে, তারপরে এক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লাম। আমি চাইছিলাম আমার গুলির জবাবে ডাচম্যানটাও গুলি ছুঁড়ুক। হলও তাই। গুলির জবাবে গুলি ছুটল, গুণে গুণে তো বটেই, সুদ বাবদও কয়েকটা। গুলি ছোঁড়াছুড়ি এমনভাবে চলতে থাকলে আমার গুলির পুঁজি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের অস্ত্রাগারের কর্তা যা রাগাটাই রাগবেন। দৃশ্যটা ভাবতেই আমার হাসি পেল। আচ্ছা, আমি যদি মরেই যাই, তাহলে তো তাঁর এই রাগের কোন অর্থই থাকে না। আমার গুলির পুঁজি শেষ হয়েছে আর আমি মরে কাঠ হয়ে গেছি—তাহলে ঘটনাটা দাঁড়ায় একেবারে অন্যরকম। সেক্ষেত্রে এ-ধরণের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে পারে: 'শেষ বুলেট পর্যন্ত আত্মরক্ষা করার পর...'

'এই মরেছে!'

আরেকটু হলে ডাচম্যানটা আমার মাথা গুঁড়ো করে দিয়েছিল আর কি! কানের পাশেই প্রচণ্ড আওয়াজ! কানদুটো কটকট করছে। লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে বোঝা যাচ্ছে একেবারে

খাঁটি ডাচম্যান, হিসেব করে বুলেট খরচ করতে জানে না। আমার হাতের বন্দুকটা কাঁপতে লাগল, তারপরে হাত থেকে খসে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে আমার কেমন যেন একটা বিহ্বল অবস্থা। তারপরে কতকগুলো চিন্তা মাথার মধ্যে তালগোল পাকাতে লাগল। বুলেটটা আরেকটু নিচে দিয়ে গেলেই হয়েছিল আর কি। মাথাটা আর আস্ত থাকত না! সারা শরীরে দুর্বলতা বোধ করতে লাগলাম।

তুমি না পুরুষ মানুষ! তুমি তো আর মুরগির ছানা নও। চাপা স্বরে ধমক দিয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। তবুও আমার শরীরটা কাঁপছে। আমি আর কোন কিছু স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারছি না। বড়ো বেশি কুইনাইন খেলে যা হয়, আমার অবস্থাটাও ঠিক সেইরকম। ঘুম পাচ্ছে, ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। আবার হঠাৎ আমার মনে হল, আমি যদি বাড়ি ফিরতে পারতাম! আমার বাড়ি – যেখানে বুলেট নেই, যেখানে নেই ওত-পেতে-থাকা কোন ডাচম্যান। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম মনের এই চিন্তাটাকে দূর করে দিতে। মনের এই চিন্তাটাকে ভুলতে। ঈশ্বরই জানেন, কত মানুষকে আমি ঠকিয়েছি, এমনকি অনেক চালাকচতুর মানুষকেও। কিন্তু নিজেকে ঠকাই কেমন করে? মুগুরটার পাশে মাটিতে মুখ দিয়ে আমি পড়ে রইলাম। তখন শরীরটা সুস্থ বোধ হতে লাগল। বেশ তো, হলামই বা একটা মুরগির ছানা, ক্ষতি কি।

কামানের গোলা এবার যেন আরও এগিয়ে এসেছে। তিনজন মানুষ সমেত এই পাহাড়টাকে যেন গ্রাস করতে চায়। তিনজনই বা কেন। চারজন। আমারই ভুল, চারজন। শিশুটিকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে বৈকি। আর স্বীকার করতেই হবে, এই শিশুটির গলার স্বরই সবচেয়ে উচ্চগ্রামে। কিন্তু আর দেরী নয়, শিশুটিকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া দরকার। যেকোন মুহূর্তে এই এলাকায় সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। শিশুটির কান্না শুনে আমি বিচলিত বোধ করছি। বাড়িতে আমারও একটি ভাই আছে

যে এখনও শিশু। কিন্তু সে আছে মায়ের কোলে, নিরাপদে। কিন্তু এখানে এই শিশুটির মা পর্যন্ত নিরাপদ নয়। ওদের দুজনকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি কী করতে পারি, আমি তো নিজেও নিরাপদ নই। সব চেয়ে সহজ ব্যবস্থা একটা অবশ্যই আছে, একছুটে পালিয়ে যাওয়া এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা। কিন্তু, রণকৌশলের দিক থেকে এই পাহাড়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং শত্রুর কাছে এই পাহাড়টা হবে একটা ফাঁদ।

কোথাও কিছু নেই, কুঁড়েঘরের মধ্যে সাদামতো কী যেন একটা পড়ল। একটা সাদা রুমাল। রুমালের ভাঁজ থেকে একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল। শয়তানি! আমাকে ধোঁকা দিতে চাইছে! এ-ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তা আমার মাথায় এল না।

তবুও মনে মনে রুমালটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। ধবধবে সাদা রুমাল। কথাগুলো বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতেই ডাচম্যানটার কথা মনে পড়ল। কী মতলব ওর? সাদা কাপড়ের অর্থ সাধারণত আত্মসমর্পণ, কিংবা অন্তত পক্ষে অস্ত্র-সংবরণ। ও কি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়? দূর, এ নিতান্তই আমার মনগড়া চিন্তা! আমরা কেউ-ই কাউকে কোণঠাসা করতে পারিনি। তাহলে ধরে নিতে হয় অস্ত্র-সংবরণ। কিন্তু তাই বা কেন হবে?
জবাব পাওয়া গেল শিশুটির চিৎকারে। ডাচম্যানটাও শিশুটির স্থানান্তর চাইছে। তার আগে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া চাই। কিন্তু আমার কাছে কী চায় ও? ওর চোখে আমার দাম কতটুকু? অবশ্যই আমি ওর শত্রু, আমি ওর নিরাপত্তার বিঘ্ন। তাহলে তো ও অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা তো যাচ্ছে না। তাহলে কি আমি আর ও একই কথা ভাবছি? তাই বা কেমন করে হবে? ওর চোখে আমি তো একটা দস্যু, একটা বর্বর, জানোয়ারসদৃশ একটা জীব! আমাদের সম্পর্কে এসব কথাই তো লেখা হয় ওদের

পত্র-পত্রিকায়, যা আমরাও পড়ি। ওই কীটগুলোকে বাঁচতে দিও না—যত পার মার। কাজেই ধরে নেওয়া চলে যে পারলে আমাকেও ও খুন করত, নিষ্ঠুরভাবে খুন করত। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ছবি আমার মনে পড়ে গেল। ওদের হাতে আমাদের বন্ধুরা কি-রকম ব্যবহার পেয়েছে তারই ছবি। আর ডাচম্যানটা? এমনও হতে পারে, আমি যা ভাবছি, এই ডাচম্যানটাও তাই ভাবছে। সাহায্য করতেই ও চায়। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে ওর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমি ওর পক্ষে আশঙ্কার কারণ। তবে আমি ওর সহায়ও হতে পারি। কিন্তু আমার এই অনুমান যদি ভুল হয়? মা ও শিশুকে সাহায্য করার আগে ও যদি আমাকে খুন করে? এমন হওয়াটা যে একেবারে অসম্ভব তা তো নয়। শেষকালে কিনা নিজের বোকামির জন্যে প্রাণ হারাব! একটা কেন, হাজারটা শিশুর জন্যেও এই বোকামি নয়। কিন্তু শিশুটির কথা ভেবে আবার আমার মন নরম হয়ে গেল। এমনও তো হতে পারে, আমার মতো এই ডাচম্যানেরও ছোট ভাই আছে, কিংবা হয়তো নিজেরই ছেলে-মেয়ে। নাও যদি থাকে, শিশুদের সম্পর্কে আমার যেমন মমতা, ওরও হয়ত তাই। এমনি নানা কথা ভেবে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ও আসলে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু চাইলেই তো হবে না। একা ওর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। একা আমার পক্ষেও নয়। কিছু করতে হলে ওকে আর আমাকে একসঙ্গে হাত মেলাতে হবে। ওকে আর আমাকে! কথাগুলো আমি বারবার উচ্চারণ করলাম। ততক্ষণে আমি পকেট হাতড়াতে শুরু করেছি। পকেটে রুমাল নেই, রয়েছে শুধু একটা ঝাড়ন যেটা এককালে সাদা ছিল। কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম বিরাট বিশাল হিংস্র একটা ডাচ সৈন্য! কিন্তু কই, তবুও তো আমি কাঁপছি না! অন্ধকারে, হাতড়ে হাতড়ে বৃথাই নুড়ি খুঁজলাম। আর ঠিক এমনি সময়ে বিস্ফোরণের আওয়াজ, স্ত্রীলোকটির প্রার্থনা-উচ্চারণ ও শিশুর কান্না ছাপিয়ে শোনা গেল

একটি সুউচ্চ কণ্ঠস্বর : 'গুলি বন্ধ!' এডিস্টোন বন্দুকের চাবি টিপলে যেমন আওয়াজ হয়, গলার স্বরটি তেমনি। হালকা অথচ চড়া।

আর এমনই ঘটনার যোগাযোগ, তক্ষুনি ছুটো হাতবোমা এসে পড়ল কুঁড়েঘরটার সামনে। বিস্ফোরণের শব্দও শিশুটির কান্না থামাতে পারল না। মা কিন্তু নিশ্চুপ। আমি তাড়াতাড়ি একটা বুলেট বার করলাম, তারপরে বুলেটটাকে ঝাড়নের মধ্যে জড়িয়ে ছুঁড়ে দিলাম কুঁড়েঘরটার মধ্যে।

এবারে? ঘরের মেঝের ওপরে দু-টুকরো ময়লা ন্যাকড়া পড়ে আছে। এই তো ঘটনা! খুব একটা বিশ্বাস তৈরি হবার মত ঘটনা কি? আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসে কাঁপতে লাগল।

'বন্দুক নামিয়ে নাও! গুলি বন্ধ কর!' লোকটি হাঁক দিচ্ছে।

'একসঙ্গে যাই চলো! আমি প্রস্তাব করলাম। আমার নিজের গলার স্বর নিজের কানেই অচেনা ঠেকল।

'গুলি করবে না তো? লোকটির গলার স্বরে আমারই মতো ইতস্তত ভাব।

'গুলি বন্ধ।' জবাব দিয়ে আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম।

লোকটির ছায়া নড়তে দেখা গেল। ছায়াটা দ্রুত সরে গেল, দেওয়ালের আড়ালে। তখন আমি ভাবলাম : লোকটা নিশ্চয়ই দেওয়ালের পেছনে দাঁড়িয়েছে। এখন যদি আমি বন্দুক তাক করি তো মুহূর্তে ওর দফা শেষ! আর আমি অর্জন করতে পারি একটা ডাচম্যানকে খতম করার গৌরব।

এসব কী ভাবছি আমি! নিজের ওপরেই আমার ঘৃণা হল। মন স্থির করে নিয়ে আমি সামনের দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু দেওয়ালটার কাছাকাছি এসে আবার আমি নিচু হলাম। আবার আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে কাঁপতে লাগল।

'একসঙ্গে যাবে তো?' লোকটি প্রশ্ন করল।

আমি জবাব দিলাম, 'চলো যাই!'

'চলো।'

মনে মনে স্বপ্ন দেখছি। প্রথমে একটা টমসন বন্দুক, তারপরে সবুজ হাত, প্রথমে একটা, তারপরে দুটো। সামনে এগিয়ে এল, থামল। আমি কাঁপছি, আমার স্টেনগানটা উদ্যত। লোকটি এবার পুরোপুরি আমার সামনে। গুঁড়ি মেরে আছে, আমিও তাই, আমি আর ও মুখোমুখি।

দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। ও স্যালুট করল। জবাবে আমিও। ও এগিয়ে এল আমার দিকে। সবুজ, প্রকাণ্ড, লোমশ, একটা মানুষ। ও হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ঠিক ফুটল না। ও আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি তাকালাম ওর হাতের দিকে, ওর মুখের দিকে, তারপরে বাঁশের চৌকিতে শুয়ে থাকা ম্বোক সিমিন ও শিশুটির দিকে। তখন আমরা হাতে হাত দিলাম। আর ঠিক তখুনি একটা বিস্ফোরণে আমাদের কানে তালা ধরে গেল। খোলা দরজা দিয়ে এক দমক বাতাস ঢুকল ঘরের মধ্যে। আমরা নিচু হলাম। উবু হয়ে বসে আবার দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম। ওর চোখের ভাষা আমি পড়তে পারছি। আমার কাছাকাছি আসবার জন্যে ওকেও আমারই মতো অনেক ভয় জয় করে আসতে হয়েছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ও-ও। বাঁশের চৌকিটা আমি আঙুল দিয়ে দেখলাম। ও সায় দিল। আমরা চৌকিটার কাছে এগিয়ে এলাম। দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে, শিশুটিকে আগলে।

'ম্বোক সিমিন!' আমি ডাকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও ফিরে তাকাল আর ওর চোখ গিয়ে পড়ল পায়ের কাছে দাঁড়ানো ডাচম্যানটার দিকে। আর অমনি তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। ডাচম্যান হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা কিছুতেই ফুটল না। আমার দিকে অসহায়ের মতো তাকাল।

'ম্বোক সিমিন,' আমি আরও কাছে এগিয়ে এলাম যাতে ও আমাকে দেখতে পায়, 'আমি আমাদের সেনাদলেরই সৈন্য।'

এবার আর ওর মুখে আতঙ্কের চিহ্ন নেই, তার বদলে বিস্ময়, বিহ্বলতা। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে আমার দিকে আর আমার 'বন্ধুর' দিকে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ। আমরা আবার মাটিতে শুয়ে পড়লাম। কুঁড়েঘরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

'যাওয়া যাক।' আমি বললাম।

ডাচম্যানটাও সায় জানাল। মৃবোক সিমিনকে ও তুলল চৌকি থেকে। আমি তুললাম কাঁথুনে বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটার গায়ের গন্ধ মাছের মতো। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

'আমাদের ঘাঁটিতে যাবো তো?' ডাচম্যান জিগ্যেস করল।

'না না!' আমি শিউরে উঠলাম।

ও দাঁড়িয়ে পড়ল, 'তোমাদের ঘাঁটিতে যেতে আমার ভয় করছে।'

'চলো, তাহলে কোন প্রতিবেশীর কাছে নিয়ে যাই।'

খুশি হয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ, তাই চলো।'

পথে কোনো বিরোধী দলের মুখোমুখি আমাদের পড়তে হল না। আমরা ক্রোমোর বাড়িতে পৌঁছলাম। গোড়ায় ক্রোমো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি খুব সংক্ষেপে ঘটনাটা ওকে বললাম। কিন্তু ওর মুখ দেখেই বোঝা গেল যে আমার কথায় ও বিশ্বাস করেনি। বোধহয় ভাবছে যে আমি গুপ্তচর।

বিদায় নেবার আগে আমরা মুহূর্তের জন্যে থামলাম। তারপরে ভাবলাম। একটা বুলেট বার করে আমি ওকে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও-ও আমাকে একটি দিল, এবারে আর অবশ্য সুদসমেত নয়।

ঘাঁটিতে ফিরে এসে আমি রিপোর্ট করলাম যে পাহাড়টি জনমানবশূন্য, কোথাও কোনো শত্রু নেই।

অনুবাদ। অমল দাশগুপ্ত



প্রতিধ্বনি

অ্যাল্ফ্ ওয়ানেনবার্গ

দক্ষিণ আফ্রিকার এই খ্যাতনামা ছোট গল্পকারের জন্ম ১৯৩৬ সালে কেপটাউনে। দক্ষিণ আফ্রিকার কোলব্রুক খনিতে একটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় চারশো লোক প্রাণ হারান। সেই পটভূমিতে লেখা এই গল্পটি।

ধুলোভরা পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা তিনজনই পথ-নির্দেশক ফলকটার দিকে তাকাল। সোলো বললে, 'আর দু'দিন লাগবে গ্রামে পৌঁছতে। সোলো মাকি আর টেম্বা। বেশ কিছুদিন ধরেই ওরা হাঁটছে। ওদের গন্তব্যস্থল সহস্রপর্বত উপত্যকা। হলুদ ধুলো মাড়িয়ে আর তপ্ত সূর্যকে মাথায় করে দিনের বেলায় ওরা হাঁটে, রাত্তিরে পথের ধারেই আগুন জেলে শরীরের যত ক্লান্তি নিঃশেষে উজাড় করে দেয় পৃথিবীর তৃষিত বক্ষে। ওদের মধ্যে কথাবার্তা কমই হয়। যে বিভীষিকাকে পিছনে ফেলে এসেছে তার স্মৃতি এখনো ওদের হনন করছে।

দুর্ঘটনায় খনির চারশো শ্রমিক নিহত হয়েছে। ওদেরই সহকর্মীরা। তিন সপ্তাহ ধরে চেষ্টা চলেছিল আটক কর্মীদের উদ্ধার করার জন্যে। ভীত,ত্রস্ত, ক্রন্দনরত, বিহ্বল স্ত্রী-পুত্র পরিবার কাঁটা-তারের বেড়ার বাইরে নীরবে অপেক্ষা করেছে শেষ সংবাদের জন্য। তারপর তারা একে একে চলে গেছে। কাঁটাতারের গায়ে শেষ-পর্যন্ত ক'টা ছেঁড়া কাগজের টুকরো শুধু লেগেছিল। আর এই শ্মশানের মতো খনি এলাকাটার ঠিক মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল স্তব্ধ-চাকা হেডাগয়ার।

বোঁচকাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটির ওপর ফেলল সোলো। 'ওঃ—সূর্যের তেজ নয়তো যেন সাদা চামড়া মানুষের শাসন।'

'খনিতে যে কাণ্ড ঘটেছে তার চেয়েও বোধ হয় কোন অংশে কম নয় এই রোদ্দুরে পোড়ার কষ্ট।' মাকি মন্তব্য করল।

'এ সব কথা না বলাই ভাল। সাদা মানুষের আইন আমরা ঠিকই একদিন ভাঙব কিন্তু খনির কাজের কষ্ট কি দূর হবে?' সোলো বলল।

খনির প্রসঙ্গ উঠতেই একটা সুপ্ত বেদনা আবার ওদের মুখের কথা কেড়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত টেম্বা বলে, 'আজ আর না এগিয়ে এখানেই বরং রাত্তিরটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।'

'না না, চলো এগিয়ে যাই। রাত্তিরটা হাঁটলে কাল বিকেলেই গ্রামে পৌঁছে যাব।' সোলো বলল, 'গ্রামের কাছে এসে পড়েছি কিনা তাই পায়ে এখন নতুন করে জোর পেয়েছি।'

সোলো একটা বেড়া ডিঙিয়ে এগিয়ে যায়। বাকী দু'জন ওর পিছু ধরে। সোলো ওদের চিরকালের নেতা। গ্রামে থাকতে সোলোর নির্দেশেই ওরা জমি চষতো আবার ক্ষেতের ফলন কমে যাওয়ায় ওর পিছু পিছু এসেই ওরা দিন-মজুর হিসেবে অফিসে নাম লিখিয়েছিল। একবার ওরা জেলও খেটেছে সোলোর কথা শুনতে গিয়ে। তবু সোলোই ওদের নেতা।

এই জায়গাটার পাশেই রয়েছে একটা শুকনো নদীর বালির চর। ওরা তারই পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'জায়গাটা বেশ ভাল।' সোলো বলল।

মাকি বলল, কিন্তু নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই অবধি এগিয়ে গেলেই হত। এখানে থাকলে যে রাস্তা থেকেও আমাদের দেখা যাবে! তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।'

মাকির কথা শেষ হতে না হতেই আবার শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর, 'বিপদের সম্ভাবনা আছে...সম্ভাবনা আছে...আছে...'

'একি! ভেঙচি কাটছে কে?' মাকি অবাক হয়ে গেছে।

সোলো বলল, 'ও কিছু নয়। পাহাড়গুলোর বাঁদরামি।' ইতিমধ্যে টেম্বা তার কম্বলখানা বিছিয়ে ফেলেছে সোলোর পাশটায়। 'বেশ ভালই তো জায়গাটা।' টেম্বা বলল।

তিনজনেই এখন বালির ওপর বসে পড়েছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বালি ক্রমশ ঠাণ্ডা হচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে সোলোই প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করল, 'মনে আছে, আমরা একটা বেড়া পেরিয়ে এই জায়গাটায় এসেছি। তার মানে—'

'আমরা একজন সাদা চামড়ার ক্ষেতের মধ্যে ঢুকেছি।' সোলোর কথাটা শেষ করে দিল টেম্বা। 'কিন্তু যা ক্ষিদে পেয়েছে! তবে আশা এই যে সাদা মানুষের ক্ষেত-খামার বলে কথা, ছাগল-ভেড়া কি আর জুটবে না!'

'সাবাশ টেম্বা। এই না হলে বুদ্ধি!' সোলো একটা থাপ্পড় মারল টেম্বার পিঠে।

এসবই তো তোমার কাছেই শেখা।' মিটিমিটি হাসে টেম্বা।

ওদিকে মাকি কিন্তু ভাবনায় তলিয়ে গেছে। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে ওর বন্ধু মোজেসের কথা। মোজেস প্রাণ হারিয়েছে। অথচ আর দু'দিন পরেই ওর বাড়ি যাওয়ার ঠিক হয়েছিল। বাড়ির গল্প করবার সময় চোখ দুটো ওর যেন হাসত। দুর্ঘটনার আগের মুহূর্তেও মোজেস তার বাড়ির কথাই বলছিল। অকস্মাৎ কামান গর্জনের মতো আওয়াজ করে ধ্বসে পড়ল খনির ছাদটা। মোজেসের স্বপ্নের সমাধি। কত আশা নিয়ে তারপর ওরা ক'দিন জান্ কবুল করে উদ্ধার কার্য চালিয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা। শেষপর্যন্ত পাততাড়ি গুটিয়ে ওরা চলে এসেছিল মোজাম্বিকের ট্রেন ধরতে। বাড়িতে বৌয়েরা নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তায় আছে। ট্রেনে কিন্তু ঠাঁই হল না ওদের। দু' সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে ট্রেনে উঠতে হলে। শেষ-

পর্যন্ত সোলোর কথামতো ওরা পিঠে বোঁচকা নিয়ে হাঁটাপথেই রওনা হয়েছে।

'মাকির চোখে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা যে এদিকে খাবারের কথা ভাবছি।' সোলো বলে উঠল।

মাকি বলল, 'খাবারের চেয়ে অনেক বড় চিন্তা এখন আমার মাথায়! আর দু'দিন বাদেই বাড়ি ফিরছি। বৌয়ের সঙ্গে দেখা হবে। ছেলেটা তো প্রশ্নে প্রশ্নে কাহিল করে দেবে। আগুনের ধারে বসে আমি ওদের খনির গল্প শোনাব। আমাদের সব দুঃখ যন্ত্রণার কথা। বাড়ি ফেরার সুখের কাছে পেটের জ্বালাও হার মানে। একে মোটেই স্বপ্ন দেখা বলে না!'

'তুমি জীবনের কাছ থেকে কোন শিক্ষাই পাওনি।' পথের ধুলোর মতো কর্কশ কণ্ঠস্বর সোলোর। 'শুধু কয়লা কাটতে শিখেছ আর শিখেছ স্বপ্ন দেখতে।'

'আরে বাবা স্বপ্ন দেখে তো আর পেট ভরবে না!' টেম্বা যোগ করল।

সোলো আবার বলতে শুরু করে, 'তুমি এমন ভাবে বাড়ি আর গাঁয়ের কথা বলছো ওটাই যেন স্বর্গ! তাই যদি হবে তাহলে ক্ষেতের ফসলে পেট ভরে না কেন! আমরা যদি খনিতে কাজ না নিতাম ছেলেপুলে সবাই তো না খেয়ে শুকিয়ে মরত। তুমিও মোজেসের মতোই স্বপ্ন ছাখো!'

মাকি বলল, 'চলো আমরা এ জায়গা ছেড়ে সরে যাই। ছাখোনা, ছাগল চুরির কথা উঠতেই পাহাড়গুলো কেমন ভেঙাচ্ছে!'

সোলো হেসে বলল, 'এই টেম্বা, চলো আমরা একটা ছাগল মেরে আনি। মাকি বরং বসে বসে স্বপ্ন দেখুক।'

'কিন্তু বাড়ির এত কাছাকাছি পৌঁছে এসব ঝামেলা পাকাবার কি দরকার? ধরা পড়া মানেই এখন বেশ কিছুদিন হাজতবাস।' মাকি বলল।

'আমার হাতের ছুরিটা কেমন নিশপিশ করছে সোলো।' মাকির কথা কানেই তোলেনা টেম্বা।

'চলো তাহলে এগোন যাক।' সোলো বলল। 'মাকি, তুমি বরং আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করো।'

'ধরা পড়া মানেই হাজতবাস কিন্তু, মনে রেখো।' পেছন থেকেই চেঁচিয়ে উঠল মাকি। তারপর বহুকাল আগে বন্যার তোড়ে ভেসে আসা ভাঙা ডালপালার টুকরো জড়ো করে একটা পাথরের চাঁইয়ের পাশে জমা করল। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শীতল হয়ে উঠেছে সান্ধ্য বাতাস। আগুনের ধারে বসে গরম পোয়াতে পোয়াতেই মাকির মনে হয় সে যেন বাড়ির মধ্যে বসে। আগুনের নৃত্যরত হলুদ শিখাটাই যেন তার ঘরের দেওয়াল। বৌয়ের মিষ্টি ভালবাসা, ছেলের অফুরন্ত কৌতূহল তাকে ঘিরে। মাকি বলবে ওদের কাছে আসবে বলে কত দীর্ঘ পথ সে পায়ে হেঁটে এসেছে।

হঠাৎ গলার শব্দে মাকির সম্বিৎ ফেরে। সামনেই ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে সোলো, আর টেম্বার কাঁধে ঝুলছে একটা মরা ছাগল।

সোলো মাকির দিকে ছুরিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'নাও। আমরা পুরুষের কর্ম করে এসেছি। এবার তোমায় মেয়ের কাজটি করতে হবে। ওটা তোমাকেই মানায়।'

'কিন্তু এই ছাগলের রক্তটক্ত হাতে লেগে থাকলে আর আমাদের বাড়ি ফিরতে হচ্ছে না।' মাকি বলল।

'তোমার খালি ভয়। আরে এখানে কেউ নেই।' সোলো আশ্বস্ত করতে চায়।

পাহাড়গুলোও ওরই কথা সমর্থন করে ওঠে: 'এখানে কেউ নেই···কেউ নেই···নেই।'

ছুরি হাতে মাকি আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু অন্যের জিনিষ খেয়ে আমার পেট ভরাতে ইচ্ছে করে না।'

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সোলো বলে, 'কিন্তু আমরা যে কয়লা কাটি তার জন্যেই না ওরা এত বড়লোক। আমরা যে রাস্তা বানাই তার ওপর দিয়েই না ওরা গাড়ি হাঁকায় আর আমরা মরি হেঁটে। আমাদের যা ছিল সবই তো ওরা কেড়ে নিয়েছে। তবু একটা ছাগল মারা নিয়েই তোমার এত দুশ্চিন্তা। ওরা আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে এমন কি দেহের শক্তিটুকু অবধি রাখেনি।'

'কিন্তু আমি তো শক্তি ফিরে পেয়েছি। প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছি যে!' মাকি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

হঠাৎ পাড়ের ওপর থেকে শোনা গেল প্রচণ্ড এক হুঙ্কার। আর সেই শাসানির সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল রাইফেল।

সোলো আর টেম্বা ছুটে গেল নদীর বাঁকের দিকে। অন্ধকারের মধ্যে তারা মিশে গেল।

কাঠকুটোর প্রায় নিবু নিবু অগ্নিকুণ্ডের ধারেই বিছানো রয়েছে তিনটি কম্বল আর পড়ে রয়েছে দুটি মৃত প্রাণী। তার একটি ছাগল আর অন্যটি মাকি।

পাহাড়গুলো বিদ্রূপভরে তখন ঘোষণা করছে: 'প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছি যে···বাড়ি পৌঁছে গেছি যে···পৌঁছে গেছি যে!'

বিচার

অজ্ঞাত



অধিকৃত প্যালেস্তাইনের এক অজ্ঞাতনামা লেখকের এই অবিস্মরণীয় শোষণবিরোধী লেখাটি সেখানকার একটি কমিউনিস্ট মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'লোটাস' পত্রিকায় এটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

জমি জরিপের বাবু ক্ষেতটার মাপ জোপ সব খাতায় টুকে নিলেন। এটা আবু হামিদের জমি হলেও হামিদ কোনো গা করেনি। জরিপ বাবু বললেন, জমিটা নিয়ে 'রাষ্ট্র' আর ইব্রাহিম এল হামিদের মধ্যে একটা বিবাদ বেধেছে। হামিদের কোন বিকার নেই। নিশ্চিন্ত স্বরে বললে, 'লেখো বাবা লেখো, যত খুশী আঁকো আর লেখো। কালি-কাগজের চেয়ে সস্তা আর কি আছে। তবে হ্যাঁ— আমার জমি আমি কোন মতেই হাতছাড়া করছি না।'

আবু হামিদ যথারীতি জমিতে লাঙল দেয়। চাষ আবাদের কাজ করতে থাকে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে ও এই করে চলেছে। বাবা বেঁচে থাকতে সেই ছোট্ট বেলাতেই তার এই কাজে হাতেখড়ি। তারপর কতদিন হল বাবা মারা গেছেন। আবু হামিদের কাজ বন্ধ হয়নি এক দিনের জন্যেও।

এক এক করে দিন পেরিয়ে যায়, দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আসে। আবু হামিদ জরিপ বাবুর কথা প্রায় ভুলেই গেছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল তার হাইফার আদালতে। তার 'বিতর্কিত' জমির মামলা উঠেছে। হাজিরা দিতে হবে।

নির্ধারিত দিনে হামিদ হাইফা এসে পৌঁছল। ছেলেও কাজ ফেলে বাবার সঙ্গে এসেছে। যতই হোক বাবার বয়স হয়েছে।

উচ্চস্বরে কে একজন হামিদের নাম ডাকতেই প্রতীক্ষালয় ছেড়ে

হামিদ আর তার ছেলে আদালত কক্ষে এসে ঢুকল। শুরু হল বিচার।

বিচারক প্রশ্ন করলেন, 'মাগডেল কুরুম অঞ্চলের ১৯৫৭০ নম্বর ব্লকের ৪৮ নম্বর প্লটের জমিখানা যে তোমার—প্রমাণ করতে পারবে?'

আবু হামিদ বলল, 'হ্যাঁ হুজুর। জমিটা আমি আমার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ঈশ্বর আমার স্বর্গত পিতার আত্মার মঙ্গল করুন। প্রার্থনা করি—আপনার পিতার আত্মারও মঙ্গল করুন ঈশ্বর!' বিচারক বললেন, 'আজেবাজে বোকোনা তো! বাবাকে আবার এর মধ্যে টেনে আনছো কেন! তোমার দলিল দস্তাবেজ কিছু আছে মালিকানা প্রমাণ করার মতো?'

আবু হামিদ একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আবার বলছি হুজুর, জমিটি আমি আমার বাবার কাছ থেকে পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছি। সেই পনের বছর বয়সেই বাবার সঙ্গে আমি চাষের কাজে হাত লাগিয়েছি।'

'এটা কোন প্রমাণ নয়।' বিচারক বললেন। 'তাছাড়া এ জমিটির ষাট শতাংশ শুধু পাথরের চাঁই। এ জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি।'

আবু হামিদ চেঁচিয়ে উঠল, 'কি বলছেন হুজুর! ষাট শতাংশ কি সত্তর শতাংশ জানি না, কিন্তু এটুকু বুঝি যে এ জমিতে ট্র্যাক্টর চালিয়ে লাঙল দেওয়া যায়। দু' একটা পাথরের চাঁই এধার সেধার আছে বটে কিন্তু সেখানেও ডুমুর গাছ জন্মায়, আঙুর লতার চাষ হয়। জমি মোটেই বাঁজা নয়। আমার বাবা সারা জীবন ধরে জমি থেকে পাথর সরিয়েছে। আমিও এতদিন তাই করে আসছি। রাষ্ট্র কি আর জমি পেল না, যত লোভ আমার এই জমিটুকুর ওপর?'

বিচারক বলে উঠলেন, 'তোমাকে আমি আবার সাবধান করে

নিচ্ছি। আজেবাজে কথা বলবে না। রাষ্ট্র কখনো কারুর সম্পত্তি দখল করে না। এটা তার পবিত্র অধিকার।'

'অধিকার?' প্রশ্ন করল আবু হামিদ। 'আমি জানি হুজুর, রাষ্ট্র খুব ধনী আর আমার নিজের বলতে কেবল এই ক'খানা হাড় আর চামড়া। এরপরেও রাষ্ট্র কোন মুখে এরকম দাবী করে হুজুর?'

বিচারক বললেন, 'শোনো—শোনো! ভুলে যেওনা তুমি এখন আদালতে এসেছ। এখানে এ রকম আজেবাজে কথা বলতে নেই।' বিচারক কি একটু ভেবে আবার বললেন, 'এক কাজ করা যাক্, রাষ্ট্র বরং জমির অর্ধেকটা নিক, আর তুমি নাও বাকী অর্ধেকটা।'

আবু হামিদ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'কিন্তু হুজুর, আমার বাবা তো আমাকে এ কথা একবারো বলে যাননি যে রাষ্ট্র নামে আমার আর এক ভাই আছে বা জমিজমা তার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে।'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিচারক রাগত কণ্ঠে বললেন, 'শোন বৃদ্ধ— আমি যা বলছি ভালোয় ভালোয় মেনে নাও। এতে তোমার ভালই হবে। বুঝলে?'

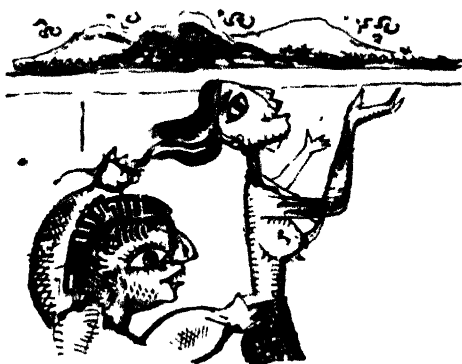
আবু হামিদ প্রতিবাদ করে উঠল, 'হুজুর—আপনার বিচারের রায়টা যেন শুক্‌নো কেলেপানা একটা এঁদো ডোবা। পচা গন্ধ ছাড়ছে।'

আবু হামিদ আর দাঁড়াল না। 'এমন অবিচার চিরকাল চলতে পারে না। কখনোই না।' বিড় বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে আবু হামিদ ছড়িটা হাতে তুলে নিয়ে আদালত কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অনুবাদ। সিদ্ধার্থ ঘোষ

পেশাওয়ার এক্সপ্রেস

কৃষণ চন্দর



উর্দু সাহিত্যের সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ কথ শিল্পী কৃষণ চন্দর। ভারতবর্ষে, এমনকি বাইরেও বহু ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত তাঁর সাহিত্যকৃতী। স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত তাঁর অনন্য গল্প সংকলন 'হাম ওয়াহশী হ্যাঁয়' থেকে এই অনুবাদটি সংগৃহীত।

পেশাওয়ার ছাড়ার পর হুসহুস করে নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলি। আমার কামরায় বসে বেশীর ভাগই হিন্দু। এরা সব পেশাওয়ার থেকে, হুই মর্দান থেকে, কোহাট, চারশেরাহ, খায়বার থেকে লাণ্ডি-কোটাল, বান্নু নওশেরাহ আর মানশেরাহ থেকে এসেছে। পাকিস্তানে নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা না পেয়ে হিন্দুস্থানের দিকে চলেছে। স্টেশনে কঠিন পাহারা। সেনানীরা কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত। এরা, যাদের পাকিস্তানে উদ্বাস্তু আর হিন্দুস্থানে শরণার্থী বলা হয়, ততক্ষণ নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস নিতে পারে না যতক্ষণ না আমি পাঞ্জাবের প্রণয়মুখর উন্মুক্ত সবুজ মাঠের দিকে পা বাড়াই। হাবভাবে চেহারায় সকলকেই পাঠান বলে মনে হয়। ফরসা, চওড়া, বলিষ্ঠ হাত পা, মাথায় কুল্লা লুঙ্গি, পরনে সালওয়ার কামিজ। পুস্তুতে কথা বলে সকলে, কেউ কেউ আবার রুক্ষ পাঞ্জাবিতেও দু একটা কথা বলে। এদের রক্ষণা-বেক্ষনের জন্য প্রত্যেক কামরায় বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে দুটো করে সিপাহি। মহান বেলুচি সিপাহি। পাগড়ীর পেছনে ময়ূরপুচ্ছের মত সুন্দর গুচ্ছ লাগিয়ে, হাতে উদ্ধত রাইফেল নিয়ে হিন্দু পাঠান আর তাদের স্ত্রীপুত্রদের পানে তাকিয়ে মুচকে মুচকে হাসছে। আজ

ঐতিহাসিক এক ভয় আর বীভৎস আতঙ্কে পালিয়ে চলেছে এইসব মানুষগুলো এই মাটি থেকে, যেখানে তারা শতাব্দী ধরে বাস করেছে। যার উর্বর ক্ষেত্র থেকে জীবন পেয়েছে, যার বরফ গলা ঝরনার জলে তৃষ্ণা মিটিয়েছে, যার সুন্দর উদ্যানের আঙুরের রস খেয়েছে। আজ হঠাৎ এ মাতৃভূমি অচেনা হয়ে গেছে, বন্ধ করে দিয়েছে তার স্নিগ্ধ বুকের দ্বার এদের জন্য। আর এরা এক নতুন দেশের তপ্ত মাঠের ছবি বুকে এঁকে বিদায় নিচ্ছে। এইটুকু ভেবে তারা খুশি যে তাদের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে, আহার্য সামগ্রী কাছে আছে, তাদের মা, বোন, স্ত্রীকন্যার আবরু এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। তবু এদের মন কাঁদে বারে বারে। দৃষ্টি লেহন করে সরহদের পাথুরে প্রান্তর, বিঁধে যেতে চায় অন্তরের গভীরে, যেন প্রীতি মমতার উৎসকে জিজ্ঞাসা করতে চায়, 'বল্ মা, কোন অন্যায়ের প্রতিবিধানে আজ তোর সন্তানদের গৃহহারা করলি? তোর বধূদের এ সুন্দর আঙিনা থেকে বঞ্চিত করলি, কাল পর্যন্ত যেখানে তারা এয়োতির সম্মানে গৌরবান্বিত হয়েছে, কেন তোর কুমারীদের, যারা তোর বুকে আঙুরলতার মত জড়িয়ে ছিল, নির্মম নিষ্ঠুরতায় কেন তাদের ছিন্ন করে দিলি? কেন এদেশ আজ বিদেশ হয়ে গেল?' আমি চলতে থাকি আর আমার কামরায় বসে লোকে নিজের স্বদেশের প্রান্তর, সুউচ্চ কঠিন পাহাড়ি উর্বর ক্ষেত্র, কুঞ্জ আর উদ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন প্রত্যেক চেনাজানা দৃশ্য নিজের মনে গেঁথে নিয়ে যাবে। প্রতিক্ষণেই দৃষ্টি যেন থেমে যেতে চায়। গভীর বেদনার চাপে পা আমার ভারি হয়ে ওঠে।

হাসান আবদাল পর্যন্ত সকলে, একই ভাবে দুঃখ, বেদনা আর ব্যথার প্রতিচ্ছাব হয়ে বসে থাকে। হাসান আবদালের স্টেশনে অপেক্ষারত থাকে একদল শিখ। পাঞ্জা সাহেব থেকে সব এসেছে, বড় বড় কৃপাণ নিয়ে। সঙ্গের ছেলেপুলেরা ভীত সন্ত্রস্ত। মনে হয় নিজেদের কৃপাণের ঘায়েই যেন আত্মহত্যা করবে। কামরায় বসে নিশ্চিন্ততায় নিশ্বাস ফেলে সকলে, আলাপ শুরু করে দেয় অন্যান্য

হিন্দু আর সরহদের পাঠানদের সাথে। কারুর ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, কেউ শুধু কামিজ আর সালওয়ারেই পালিয়েছে ঘর ছেড়ে, কারুর হয়তো পায়ে জুতো নেই, আবার কেউ কেউ এমনই চতুর যে ভাঙা খাটিয়াখানাও তুলে এনেছে বাড়ি থেকে। যাদের সত্যি সত্যি ক্ষতি হয়েছে অত্যধিক, তারা মর্মাহত—নিশ্চুপ বসে। আর যাদের ক্ষতি হয়নি কিছু তারা দুঃখ করে লক্ষ টাকার সম্পত্তি চলে যাওয়ার। গল্প শোনায় নিজেদের কল্পিত বিরাট ইমারত অট্টালিকার, গালাগালি দেয় মুসলমানদের। বেলুচি সিপাহিরা ঔদাসীন্যপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জনে রাইফেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল। কখনও সখনও একে অন্যের পানে আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে।

তক্ষশিলা স্টেশনে আমায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কি জানি কার অপেক্ষা ছিল। বোধহয় আশেপাশের গ্রাম থেকে হিন্দুরা আসছিল। গার্ড স্টেশন মাষ্টারকে বার বার জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পায়, 'গাড়ি আগে যেতে পারবে না।' আরও এক ঘণ্টা কেটে যায়। পরিশ্রান্ত লোকেরা যে যার আহার্য বার করে খেতে আরম্ভ করে। ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেরা ক্রমে হাসতে থাকে কলকলরবে। অসহায় কুমারীরা বাইরে তাকায় জানালা দিয়ে। বৃদ্ধেরা হুঁকো টানে গড় গড় করে। কিছুক্ষণ পরে শব্দ শোনা যায় প্রচণ্ড কলরবের, দূর থেকে ভেসে আসে ঢোলের আওয়াজ।

হিন্দু উদ্বাস্তুর দল আসে দূর থেকে। সকলে মাথা বাড়ায় জানালা দিয়ে, তাকায় এদিক ওদিক। এগিয়ে আসতে থাকে দল, ঢোলের শব্দ শোনা যায় আরও জোরে। দল একেবারে কাছে এসে পড়ে। গুলির শব্দ ভেসে আসে বাতাসে, সকলে মাথা টেনে নেয় ভেতরে। হিন্দু উদ্বাস্তুর দল, আশপাশের গ্রাম থেকে এসেছে। মুসলমানরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসে সকলকে। প্রত্যেক মুসলমানের কাঁধে একটা করে কাফেরের লাশ, যারা নিজেদের গ্রাম থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল; দু'শো লাশ। জনতা

এগিয়ে আসে স্টেশনে। নিশ্চিন্ততার সাথে লাশগুলো অর্পণ করে বেলুচি সিপাহিদের হাতে, 'এই শরণার্থীদেরও হিন্দুস্থানের প্রান্তে পৌঁছে দিও। দেখো এদের যেন কোনরকম কষ্ট না হয়।' বেলুচি সিপাহিরা সাদরে গ্রহণ করে কঠোর কর্তব্য। প্রত্যেক কামরায় তুলে নেয় পনেরো কুড়িটা করে লাশ। জনতা ফায়ার করে বাতাসে হুকুম দেয় স্টেশন মাস্টারকে গাড়ি ছাড়ার। আমি চলতে থাকি, আবার আমায় থামিয়ে দেওয়া হয় তখুনি। জনতার সর্দার এগিয়ে আসে। হিন্দু উদ্বাস্তুদের উদ্দেশে বলে, 'ছ'শো লোক চলে যাওয়ায় আমাদের গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। আমাদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা ছ'শো লোক গাড়ি থেকে নামিয়ে নিচ্ছি, গাঁয়ে নিয়ে যাব, তা তোমরা যাই বল! আমরা আমাদের দেশকে তো আর এভাবে ধ্বংস হতে দিতে পারি না।' বেলুচি সিপাহিরা প্রশংসা করে সর্দারের বুদ্ধিমত্তার, শ্রদ্ধা করে ওর দেশভক্তির। প্রত্যেক কামরা থেকে কয়েকজন করে নামিয়ে অর্পণ করে জনতার হাতে। পুরো ছ'শো। একজন কম নয়, একজন বেশীও নয়।

'লাইন লাগাও কাফেররা…'হুঙ্কার ছাড়ে সর্দার। সর্দার নিজের এলাকার সবচেয়ে বড় জাগিরদার। রক্তের ধারায় অনুভব করে পবিত্র জেহাদের ঝঙ্কার।

কাফেররা দাঁড়িয়ে নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত! জনতার লোকেরা একজন একজন করে দাঁড় করিয়ে দেয় লাইনে। ছশো লোক। ছ'শো জীবন্ত লাশ। মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখে বিঁধছে তীর-বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ছাট। উদ্বোধন করে বেলুচিরা। পনেরো জন পড়ে যায় ফায়ারিং-এর প্রথম পশলায়।

তক্ষশিলা…

কুড়ি জন আরও পড়ে যায়।

এখানে একদিন এশিয়ার সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। লক্ষ বিদ্যার্থী সভ্যতা আর সংস্কৃতির দোলনায় বেড়ে উঠেছিল মনুষ্যত্বের গৌরবে।

পঞ্চাশ জন আরও মারা যায়…

তক্ষশিলার যাদুঘর একদিন পূর্ণ ছিল সুন্দর প্রতিমায়, ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শনে। প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতির্ময় প্রদীপ।

আরও পঞ্চাশ জন মারা যায়…

পেছনে স্তার কুপ-এর বিরাট প্রাসাদ, খেলার জন্তে এ্যামপি-থিয়েটার, মাইলব্যাপি বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ—তক্ষশিলার বিগত সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় নিদর্শন।

তিরিশ জন আরও মারা গেল…

এখানেই কণিষ্ক রাজত্ব করেছিল। শান্তি আর সৌহার্দ্যের ধন-সম্পদে পুষ্ট করেছিল সকলের অন্তর।

পঞ্চাশ জন মারা গেল আরও…

এখানে বুদ্ধের শান্তিবাণী গুঞ্জন করেছিল আকাশে বাতাসে। ভিক্ষুরা জনম দিয়েছিল মৈত্রী, শান্তি সৌহার্দ্যের।

শেষ দলের মৃত্যু সম্মুখে…

এখানে সর্বপ্রথম ভারতের প্রান্তে ইসলামের পতাকা উড়েছিল আকাশে। মৈত্রী, শান্তি আর মনুষ্যত্বের পতাকা।

সব মরে গেল, 'আল্লাহ-হু-আকবর'। গাঢ় রক্তে রাঙা হয়ে গেল মাটির আঙিনা। আমি চলতে সুরু করি। প্লাটফর্ম ছাড়ার সময় পা বুঝি পিছলে যায়। রক্তে পিচ্ছিল লাইনে শ্লথ হয়ে আসে আমার গতি, মনে হয় আমি বুঝি পড়ে যাব।

প্রত্যেক কামরায় মৃত্যুর বিভীষিকা। লাশ ছড়ানো ইতস্তত। জীবন্ত লাশের জনতা। বেলুচি সিপাহিরা হাসে মৃদু মৃদু। কার সন্তান ককিয়ে ওঠে। বুড়ি মা হিক্কা তোলে। বুক ফাটা আর্তনাদ করে কার লুণ্ঠিত সোহাগ। চিৎকার, কান্না, আর্তনাদের তালে তালে এসে দাঁড়াই রাওয়ালপিণ্ডির প্ল্যাটফর্মে।

এখানে কোন উদ্বাস্তু ওঠে না গাড়িতে। একটা কামরায় ওঠে কয়েকজন মুসলমান যুবক, সঙ্গে জন পনেরো কুড়ি বোরখা পরিহিত

মেয়ে। প্রত্যেক যুবক রাইফেলে সুসজ্জিত, অন্য একটা কামরা ভরে দেওয়া হয় মেশিনগান, কার্তুজ, রাইফেল আর পিস্তলে।

ঝিলাম আর গুজরখানের মাঝামাঝি এলাকায় শিকল টেনে থামিয়ে দেওয়া হয় আমাকে। সশস্ত্র যুবকেরা নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। বোরখা ছিঁড়ে মেয়েরা চিৎকার করে, 'আমরা হিন্দু, আমরা শিখ, আমাদের জোর করে নিয়ে যাচ্ছে—' মুসলমান যুবকেরা হাসে, টেনে নামিয়ে নেয় সকলকে নিচে।

হ্যাঁ, এরা হিন্দু নারী। আমরা এদের রাওয়ালপিণ্ডি থেকে, এদের সুখের ঘর শান্তির পরিবেশ থেকে, সম্ভ্রান্ত মাতাপিতার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি। এরা এখন আমাদের, আমাদের যা ইচ্ছা তাই করব এদের সঙ্গে। কারুর সাধ্য থাকে তো কেড়ে নিয়ে যাক।

সরহদের হিন্দু পাঠান যুবক দুজন লাফিয়ে পড়ে গাড়ি থেকে। বেলুচি সিপাহিরা গুলি করে দেয় দুজনকেই অতি স্বচ্ছন্দে। লাফিয়ে পড়ে আরও কয়েকজন যুবক। মুসলমানদের দল শেষ করে দেয় সবকটাকে কয়েক মুহূর্তে। রক্ত-মাংসের দেওয়াল লোহার গুলি প্রতিরোধ করতে পারে না। যুবকেরা টেনে নিয়ে যায় মেয়েদের অরণ্যে, আর আমি ছুটে চলি মুখ লুকিয়ে। অন্ধকার কালো ভয়ঙ্কর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে আমার মুখ থেকে, যেন বিশ্ব ছেয়ে গেছে প্রেতলোকের অন্ধকারে। নিঃশ্বাস উত্তাল হয়ে ওঠে বুকের তলায়, যেন এখুনি ফেটে পড়বে আমার লোহার পিঞ্জর। অন্তরের লেলিহান শিখা ছুঁড়ে দেয় লাল স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারের গায়ে। যেন পুড়িয়ে দিতে চায় আমার আশেপাশে ছড়ানো ওই গহন আঁধার বন যা নিমেষেই আত্মসাৎ করেছে ওই পনেরোজন নারীকে।

লালমুসার কাছে দুর্গন্ধ অত্যধিক হওয়ায় বেলুচি সিপাহিরা বাধ্য হয় লাশ বাইরে ফেলে দিতে। লাশের সঙ্গে এক আধজন হিন্দুকেও ফেলে দেয় বাইরে ধাক্কা দিয়ে। কামরা খালি হয়ে যায় অনেকটা। পা ছড়াবার জায়গা পাওয়া যায় বেশ কিছুটা।

লালমুসা পার হয়ে যায়। আমি এসে পৌঁছই ওয়াজিরাবাদে। সমগ্র ভারতবর্ষে ছুরি চাকুর জন্যে বিখ্যাত শহর ওয়াজিরাবাদ। যেখানকার হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে পালন করে আসছে বৈশাখীর উৎসব শতাব্দী ধরে। ওয়াজিরাবাদের স্টেশন লাগে ভরপুর। বোধহয় এরা যেন বৈশাখীর মেলা দেখতে এসেছে। শহর থেকে ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশ ছেয়ে। স্টেশনের কাছ থেকে শোনা যায় ইংলিশ ব্যাণ্ডের মধুর সুর। জনতার কোলাহল আর হাততালির শব্দ। জনতা দ্রুত এগিয়ে আসে স্টেশনে। সম্মুখে উন্মত্ত উল্লাসে নৃত্যরত জনতা, মাঝখানে ঘেরা নগ্ন নারীর দল। নগ্ন নারী! বৃদ্ধা যুবতী, কিশোরী, মা, ঠাকুমা, বধু, কুমারী, আর অন্তঃসত্ত্বা। নাচে গানে উন্মত্ত পুরুষের আবেষ্টনে। হিন্দু আর শিখ নারী; পুরুষরা মুসলমান। নারী পুরুষের একত্র সমাবেশে অপূর্ব বৈশাখীর উৎসব। রুক্ষ খোলা কেশ, ক্ষত চিহ্নে চিহ্নিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—বুক চিতিয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলে নারীরা, যেন তারা সুসজ্জিত সহস্র বস্ত্রে। যেন তাদের আত্মাকে ছেয়ে রেখেছে মৃত্যুর শীতল শান্তি-বারি। দৃষ্টির জৌলুষ লজ্জা দেয় দ্রৌপদীকে। দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরা ঠোঁট এঁটে গেছে, যেন রুদ্ধ করে রেখেছে কোন আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত মুখ। এখুনি বোধ হয় ফেটে পড়বে এ আগ্নেয়গিরি, উত্তপ্ত লাভার প্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বিশ্বকে নরকের প্রান্তে।

জনতা জয়ধ্বনি করে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ—ইসলাম জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদ।'

নৃত্যতালে চঞ্চল পা সরে যায় সম্মুখ থেকে। কামরার মুখোমুখি দাঁড়ায় অপূর্ব নারীর সমারোহ। ভেতরে বসা মেয়েরা ঘোমটা টেনে দেয় লজ্জায়। জানলা বন্ধ হতে থাকে একে একে।

বেলুচি সেপাইরা গর্জে উঠে, 'জানলা বন্ধ কোর না, বাতাস আটকাচ্ছে...' জানলা বন্ধ হতে থাকে। বেলুচি সেপাই বন্দুক তুলে নেয়, 'দড়াম, দড়াম।' জানলা তবু বন্ধ হতে থাকে। কামরায় একটা

জানলাও খোলা থাকে না। শুধু মরে যায় আরো কয়েকজন উদ্বাস্তু। নগ্ন নারীর দলকে বসিয়ে দেওয়া হয় উদ্বাস্তুদের সঙ্গে। আর আমি রওয়ানা হয়ে যাই, 'ইসলাম জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদে'র উন্মত্ত চিৎকারে।

গাড়িতে বসা একটা খোকা গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসে বুড়ি দাদির কাছে, 'আম্মা, তুমি স্নান করে এসেছ বুঝি?'

দাদি আত্মসম্বরণ করে, 'হ্যাঁ খোকা, আজ আমার দেশেই ভাই-বেটারা আমায় স্নান করিয়েছে।'

'তোমার কাপড় কোথায় আম্মা?'

'তাতে আমার সোহাগের রক্ত-ছাপ ছিল তাই তারা ধোয়ার জন্যে নিয়ে গেছে।'

নগ্ন যুবতী দুজন লাফিয়ে পড়ে জানালা দিয়ে, আর আমি ছুটে চলি আর্তনাদ করে। দম নিই সোজা লাহোরে পৌঁছে।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করানো হয় আমাকে। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় গাড়ি—অমৃতসর থেকে এসেছে, মুসলমান উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পরেই মুসলিম খিদমতগারেরা তল্লাসি সুরু করে দেয় আমার প্রত্যেক কামরায়। অলঙ্কার, অর্থ আর মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে নেওয়া হয় দেশত্যাগীদের কাছ থেকে। চারশো জনকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় প্ল্যাটফর্মে। চারশো বলির পাঁঠা। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে আগত মুসলমান উদ্বাস্তুদের গাড়িতে চারশো জন মুসলমান কম। পঞ্চাশ জন মুসলিম মেয়েকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশ জন হিন্দু মেয়ে নামিয়ে নেওয়া হয় বেছে বেছে। চারশো হিন্দু যাত্রী বলি হয়ে যায় প্ল্যাটফর্মে। হিন্দুস্থান পাকিস্তানে জনসংখ্যার আদানপ্রদানে ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার।

মুসলিম খিদমতগারেরা গোলাকার একটা বন্ধনী বানিয়ে নেয়। ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে কয়েকজন। পরের পর এগিয়ে যায় এক একজন উদ্বাস্তু। ক্ষিপ্র গতিতে চাকু ওঠে আর নামে; শেষ হয়ে

যায় একজন, এগিয়ে দেওয়া হয় আর একজনকে। মিনিট কয়েকেই শেষ হয়ে যায় চারশো জন। আবার আমি এগিয়ে চলি সামনে। ঘৃণায় শিউরে উঠি। অঙ্গের প্রতিটি অনুরেণুতে অনুভব করি নোংরা পুতিগন্ধ। মনে হয় যেন কোন শয়তান নরক থেকে ধাক্কা দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে সোজা পাঞ্জাবে। আটারি পেঁীছে দৃশ্য যায় পালটে। মোগলপুরা হতেই বদলি হয়ে যায় বেলুচি সেপাই, স্থান নেয় ডোগরা আর শিখ সৈন্য। আটারি পেঁীছে হিন্দু উদ্বাস্তুরা মুসলমানদের এতো লাশ দেখে যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। হিন্দুস্থান এসে গেছে, তা না হলে এতো সুন্দর দৃশ্য দেখা যেতো কি করে? আর যখন অমৃতসরের স্টেশনে পেঁীছলাম শিখেরা জয়ধ্বনি মুখরিত করে তুলল হিন্দুস্থানের আকাশ বাতাস। মুসলমানদের লাশের পাহাড় জমে রয়েছে স্টেশনের দুধারে। হিন্দু, জাঠ, শিখ, আর ডোগরা সেপাই উঁকি দিয়ে যায় প্রত্যেক কামরায়, 'কোন শিকার আছে?' অর্থাৎ কোন মুসলমান আছে?

একটা কামরায় ওঠে চারজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। মাথা কামানো, লম্বা টিকি, রামনামের ধুতি পরা। হরিদ্বারের যাত্রী। প্রত্যেক কামরায় আট দশজন করে শিখ, জাঠ উঠে পড়ে। রাইফেল বল্লমে সুসজ্জিত। পূর্ব পাঞ্জাবে চলেছে শিকারের সন্ধানে। একজনের মনে সন্দেহ জাগে, প্রশ্ন করে এক ব্রাহ্মণকে, 'ব্রাহ্মণ দেওতা কোথায় চললে?'

'হরিদ্বারে, তীর্থ করতে।'

'হরিদ্বারে? না পাকিস্তানে চললে?'

'মিয়া আল্লাহ আল্লাহ কর।' দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ বলে ফেলে।

জাঠ হেসে ওঠে, 'এসো আল্লাহ আল্লাহ করি, উস্তা সাহাঁ শিকার পাওয়া গেছে, রদধী ভাই এসো 'আল্লাহ বেলি' করি···' বর্শা বসিয়ে দেয় নকল জাঠ ব্রাহ্মণের বুকে। আবার আমি এগিয়ে চলি।

পথে এক বনের মাঝে হঠাৎ আমায় থামিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দু উদ্বাস্তু, জাঠ, শিখ, সেপাই সকলে ছুটে চলে বনের দিকে। ভাবলাম

হয়তো বিরাট এক মুসলমানের দল এদের আক্রমণ করতে আসছে। হঠাৎ দেখি বনের মাঝে এক জায়গায় লুকিয়ে বসে এক দল মুসলমান কৃষক স্ত্রী, পুরুষ, বুড়ো, বাচ্চা। 'জয় শ্রীআকালি' 'হিন্দু ধরম কি জয়' অরণ্য কেঁপে ওঠে বর্বর হুঙ্কারে। ঘিরে ফেলে সকলে ছোট্ট দলকে। শেষ হয়ে যায় সব আধ ঘন্টায়। হত হয়ে যায় সকলে, বৃদ্ধ, জোয়ান, নারী, শিশু। ফিরে আসে সকলে পরম উল্লাসে। এক জাঠের বর্শার ফলকে গাঁথা ছোট্ট শিশুর দেহ। উন্মত্ত উল্লাসে বাতাসে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে থাকে, 'আয়ি বৈশাখী, আয়ি বৈশাখী, জাঠা লায়ে হ্যায়, হ্যায়।'

জলন্ধরের পাশেই পাঠানদের এক গ্রাম। গাড়ি থামিয়ে সকলে নেমে যায়। গ্রামে ঢুকে পড়ে উদ্বাস্তু, জাঠ আর ডোগরা সেপাইরা। পাঠানরা প্রতিরোধ করে কিন্তু মারা যায় সকলেই। শিশু আর পুরুষেরা হত হবার পর পালা আসে মেয়েদের। সেইখানে, সেই খোলা মাঠে, যেখানে কখনও গমের খামার লাগানো হত, সরষে ফুল হাসতো, স্নেহময়ী বধূরা স্বামীর প্রণয় আকুল দৃষ্টির উত্তাপে নুয়ে নুয়ে পড়তো তরুণ শাখার মত—বিস্তৃত সেই সবুজ খোলা মাঠে যেখানে পাঞ্জাবের হৃদয় হীর রান্‌ঝা আর সোনি মহিওয়ালের অমর প্রণয় গাথা গেয়েছে, সেই শিশম, শিরিষ, অশ্বত্থতলে প্রতিষ্ঠা হয় অস্থায়ী বেশ্যালয়ের। পঞ্চাশ মেয়ের জন্যে পাঁচশো স্বামী···পঞ্চাশ মেষ আর পাঁচশো কসাই···পঞ্চাশ সোনি আর পাঁচশো মহিওয়াল···বোধহয় আর কখনও চিনাবে বন্যা আসবে না। বোধহয় ওয়ারেশ শাহ'র 'হীর' আর কেউ কখনও গাইবে না। বোধহয় এই বিস্তৃত খোলা মাঠে আর কোনদিন গুঞ্জন উঠবে না 'মিরজা সাহাবানের' প্রণয়-মধুর সঙ্গীত। আজ পাঞ্জাব মরে গেছে, নীরব হয়ে গেছে এর সুমধুর সুরমূর্ছনা; মরে গেছে এর সব সঙ্গীত; মৃত এর ভাষা, মৃত এর নির্ভীক আপন-ভোলা কোমল হৃদয়। চক্ষু, কর্ণবিহীন নিষ্প্রাণ আমি, শুধু পাঞ্জাবের মৃত্যু দেখি। শঙ্কায় হতচেতন লোহার লাইনে থেমে যায় আমার পা।

পাঠান নারী পুরুষের লাশ কাঁধে তুলে ফিরে আসে জাঠ, শিখ,

ডোগরা আর সরহদি হিন্দুরা। আমি এগিয়ে চলি। পথেই পড়ে এক প্রকাণ্ড নদী। সেতুর ওপর উঠে ক্ষণে ক্ষণে থামিয়ে দেওয়া হয় আমাকে। প্রত্যেক কামরা সেতুর ওপর এলে লাশ ফেলে দেওয়া হয় নদীতে। সব লাশ নদীতে ফেলে দেওয়ার পর লোকে বোতল খোলে দিশি মদের। রক্ত মদ আর ঘৃণার বাষ্প ছেড়ে এগিয়ে চলি আমি।

লুধিয়ানা পৌঁছে আবার নেমে যায় লুণ্ঠনকারীরা। শহরের ভেতর খুঁজে বার করে মুসলমানের পাড়া। হত্যা, লুণ্ঠন আর আক্রমণ চলে বিপুল আক্রোশে। ফিরে আসে সকলে তিন চার ঘণ্টা বাদে, কাঁধে তাদের লুঠের মাল। যতক্ষণ না লুঠতরাজ হত, যতক্ষণ না দশবিশটা মুসলমান খুন হত, যতক্ষণ না হিন্দু উদ্বাস্তুরা নিজেদের ঘৃণা চরিতার্থ করত ততক্ষণ আমার এগিয়ে চলা দুষ্কর, একেবারেই অসম্ভব। ক্ষত বিক্ষত আত্মা, অঙ্গের প্রতিটি অণুরেণু আমার সিক্ত হয়ে ওঠে নারকীয় হত্যাকারীদের উন্মত্ত অট্টহাস্যে। স্নানের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করি। কিন্তু জানি এ যাত্রায় কেউ আমাকে স্নান করাবে না।

আম্বালায় এক মুসলমান ডেপুটি কমিশনারকে তার স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ তুলে দেওয়া হয় আমার এক ফার্স্ট ক্লাশের কামরায়। কামরায় এক সর্দার সাহেব আর তার স্ত্রীও ছিল। সেপাইদের পাহারায় তুলে দেওয়া হয় ডেপুটি কমিশনারকে। গাড়ির সেপাইদের সাবধান করে দেওয়া হয় তাঁর জান-মালের নিরাপত্তার জন্যে।

রাত্রি দুটো, এগিয়ে চললাম আম্বালা থেকে। দশ মাইল দূরে থামিয়ে দেওয়া হল আমাকে। ফার্স্টক্লাস বন্ধ ভেতর থেকে। জানলার কাচ ভেঙে সকলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কেটে ফেলা হল ডেপুটি-কমিশনার, তার স্ত্রী আর ছোট ছোট ছেলেদের। ডেপুটি-কমিশনারের মেয়ে যুবতী, পরমা সুন্দরী। কোন এক কলেজের ছাত্রী। দু একজন যুবক ভাবে বাঁচিয়ে নিলে মন্দ হয় না, এই সৌন্দর্য, কোমলতা, লোভনীয় যৌবন কারুর কাজে লাগতে পারে। যুবতী আর গয়নার বাক্স নিয়ে সকলে নেমে পড়ে। এগিয়ে যায় বনের দিকে। মেয়েটার

হাতে একটা বই।

বৈঠক সুরু হয়ে যায়। মেয়েটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, না মেরে ফেলা হবে।

যুবতী এগিয়ে আসে, 'আমায় মারতে চাও কেন? আমায় হিন্দু করে নাও, আমি তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করছি, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আমায় বিয়ে করে নাও। আমার প্রাণ নিলে তোমাদের লাভটা কি হবে?'

'ঠিকই তো।' একজন জবাব দেয়, 'আমার মতে···'

দ্বিতীয় জন কুৎসিত গালাগালি করে লাফিয়ে ওঠে, চাকু বসিয়ে দেয় মেয়েটার পেটে, বলে, 'আমার মতে শেষ করে দেওয়াই ভালো, চল চল, গাড়িতে চল সব, কি বৈঠক বসিয়েছো?'

ঘাসের বিছানায় পড়ে ছটফট করে মেয়েটা মরে যায়। হাতের বই সিক্ত হয়ে যায় ওরই বুকের রক্তে। বই-এর প্রচ্ছদপটে নাম লেখা 'সমাজতন্ত্র : মত ও পথ'—লেখক, জন স্ট্রেচি।

বুদ্ধিতে জৌলুষদীপ্ত মেয়ে। ওর মনে হয়তো ছিল দেশ আর জাতিকে সেবা করায় স্পৃহা, হয়তো মনে ছিল ওর কাউকে ভাল-বাসার, কাউকে আলিঙ্গন করার, কোন সন্তানকে স্তন দেবার পরম আগ্রহ। ও ছিল মেয়ে, মা, বধূ, প্রেয়সী, সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টির মহামন্ত্র। আর এখন ওর লাশ পড়ে রয়েছে বনের অন্তরালে। শেয়াল, শকুন আর কাকে ওর লাশ খাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

সমাজতন্ত্র : মত ও পথ, নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে যায় বর্বর জন্তুরা এবং কেউ কিছু বলে না। কেউ প্রতিবাদ করে না। জনতা থেকে কেউ আর বিদ্রোহের দ্বার খোলে না। আবার আমি এগিয়ে চলি রাতের অন্ধকারে, বুকের নিচে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে। আমার কামরায় তুফান তোলে লোকে মদের, জয়ধ্বনি দেয় মহাত্মা গান্ধীর।

অনেক দিন পরে আমি বম্বায়ে ফিরেছি। আমায় স্নান করিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে শেডের তলায়। আমার কামরায় আর মদের গন্ধ

নেই, রক্তের ছিটে নেই, বর্বর হত্যাকারী খুনীদের অট্টহাসি নেই। কিন্তু রাতের অন্ধকারে নির্জনতায় যেন প্রেতেরা জেগে ওঠে। মৃত আত্মা আকুল হয়ে ওঠে। আহতদের চিৎকার, নারীর বুকফাটা কান্না, শিশুদের আর্তনাদ আছাড়ি পাছাড়ি খায় বাতাসে বাতাসে।

আর আমি চাই—আমায় যেন কেউ আর যাত্রায় না নিয়ে যায়। আমি শেড থেকে বাইরে যেতে চাই না। আমি এই ভয়ঙ্কর যাত্রা আর চাই না। আমি আবার সেদিন যাত্রা সুরু করব যখন আমার পথের দুধারে বাতাসে বাতাসে দুলবে সোনালি গমের ক্ষেত, যখন সরষে ফুলের হিল্লোলে মূর্ছনা উঠবে পাঞ্জাবের মিষ্টি মধুর প্রণয় সঙ্গীতের, যখন হিন্দু আর মুসলমান কিষাণ মিলে কাটবে ফসল, বুনবে বীজ, নিড়বে সবুজ ক্ষেত। যখন তাদের অন্তরে বইবে প্রীতির ধারা, চক্ষে পরবে লজ্জার কাজল আর আত্মায় থাকবে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা।

আমি এক কাঠের নিষ্প্রাণ গাড়ি, তবু আমি চাই রক্ত মাংস আর ঘৃণার সেই বোঝা যেন আর না চাপানো হয় আমার কাঁধে। আমি দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে শস্য বইব, আমি কয়লা তেল আর লোহা নিয়ে যাব কারখানায়, আমি কিষাণের জন্যে নতুন হাল আর নতুন সার বহন করব। আমি আমার কামরায় কিষাণ আর মজদুরের সুখী পরিবার নিয়ে যাব। সতী নারীর মধুর দৃষ্টি খুঁজে বেড়াবে তার প্রিয় পুরুষের বুকে শান্তি, অঞ্চলে খেলবে তাদের প্রস্ফুটিত কমলের মত ছোট্ট খোকার সুন্দর মুখচ্ছবি। ওই মৃত্যুকে নয়, তারা সালাম করবে আগত জীবনকে। যখন কেউ হবে না হিন্দু, কেউ হবে না মুসলমান, সকলেই হবে মজদুর আর সকলেই হবে মানুষ।

শিকার

ভগবতী পানিগ্রাহী



ওড়িয়া সাহিত্যের এক দুর্লভ সংগ্রহ এই 'শিকার' গল্পটি। দুর্লভ তার শ্রেণীসচেতনার স্বচ্ছ অভিব্যক্তিতে, গল্প কথনের নিপুণ ভঙ্গিতে। যেখানে দুর্দান্ত এক সামন্ত-প্রভুকে হত্যা করে ফাঁসিকাঠে ঝুলে ঘিনুআ দেখিয়ে দিল বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার বিচারের নগ্ন প্রহসন। অথচ দুর্ভাগ্য, দুঃসাহসী এই তরুণ গল্পকার সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। গল্পটি প্রথমে সাধারণ একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান গল্পটি ঐ পত্রিকা থেকেই সংগৃহীত এবং মূল ওড়িয়া থেকে অনূদিত।

ওই এলাকার ঘিনুআ বেশ নাম করেছে শিকারী হিসেবে। ঘিনুআ বন্দুক চালাতে শেখেনি। তার প্রধান অস্ত্র হল নিজের তৈরী ধনুক আর তীর। তীর ছোঁড়ার সময় সে প্রায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। বাঁ-পাটা ধনুকের সঙ্গে লাগিয়ে কানের কাছ পর্যন্ত তীরটা টেনে এনে ছুঁড়ে দেয়। এ ভাবে এক মাইল দূর থেকেও সে তীর মেরে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। এই ধনুকের সাহায্যেই সে মেরেছে অসংখ্য হরিণ, সম্বর, শুয়োর, আর ভাল্লুক। চিতাবাঘও মেরেছে অনেক, তবে বড় বাঘ মেরেছে মাত্র দু'টো। বাঘ দুটো মেরে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে সে বেশ কিছু বকশিসও পেয়েছিল।

সেদিন সকাল বেলা ঘিনুআ অদ্ভুত একটা শিকার নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে এসে হাজির হল। তার এক কাঁধে ঝোলান রয়েছে গোটা দুই তিন তীর, অন্য কাঁধে পড়ে আছে একখানা কুঠার। এ হেন বেশে ঘিনুআকে দেখে ডেপুটি কমিশনার সাহেবের চাপরাশি জিগ্যেস করল, 'কিরে, কি শিকার এনেছিস আজ?'

ঘিনুআকে সে বেশ ভালো করেই চেনে। অনেকবার সে তার

বকশিসের অংশীদার হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঘিন্নুআ তার দুপাটি ময়লা দাঁত বের করে দেখাল। সে হাসল না খেঁকিয়ে উঠল ঠিক বোঝা গেল না। কেননা সত্যিকারের হাসি যাকে বলে সে হাসি ঘিন্নুয়ার মুখে কেউ কোন দিন দেখেনি। তাই চাপরাশি আবার জিগ্যেস করল, 'কিরে আজ কি শিকার করে এনেছিস?'

গামছায় বাঁধা একটা পুঁটলি নির্দেশ করে ঘিন্নুআ বলল, আজ সে একটা মস্ত বড় জানোয়ার শিকার করে এনেছে।

চাপরাশি প্রশ্ন করল, 'বাঘ?'

মাথা নেড়ে ঘিন্নুআ জানাল, না।

'তবে কি চিতাবাঘ, ভালুক না শুয়োর?'

ঘিন্নুআ মাথা নাড়লো।

'তাহলে কি এনেছিস রে?'

গোলমাল শুনে খোদ সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘিন্নুআ একটা সেলাম করে সাহেবের দিকে তেমনি দাঁত বের করে চেয়ে রইল। সাহেবও শিকারের চেহারাটি দেখবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করাতে গামছা খুলে ঘিন্নুআ বার করল একটা সদ্য-কাটা মানুষের মাথা এবং মাথাটা ও নামিয়ে রাখল তাঁর পায়ের কাছে।

চমকে উঠে সাহেব পিছিয়ে গেলেন দু'পা। আর ঘিন্নুআ হাত বাড়িয়ে বলল, 'সাহেব বকশিস?'

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সাহেব ইঙ্গিতে ঘিন্নুয়াকে বকশিসের জন্যে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গেলেন, তারপর ফোন করলেন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে। এ ছাড়া ঘিন্নুআকে শায়েস্তা করার আর কোন উপায় ছিল না। একে তার গায়ে অসুরের বল, তার ওপর হাতে আছে তীর ধনুক আর কুঠার।

হাতে পায়ে বেড়ি নিয়ে ঘিন্নুআ যখন হাজতে ঢুকল তখনও ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। এ ভাবে আটকে রাখার কারণ কী? সুযোগ পেলেই একে তাকে জিগ্যেস করে ঘিন্নুআ।

কেউ বলে, তার ফাঁসি হবে, আবার কেউ বলে কালাপানি পেরিয়ে যেতে হবে দ্বীপান্তরে। কেন, এমন কি অপরাধ সে করেছে? কিছু বুঝে উঠতে পারে না ঘিসুআ। ওদের কথাকে সে বিশ্বাস করে না। শেষে একদিন ডেপুটি কমিশনার এলেন জেল পরিদর্শনে। ঘিসুআ তার কাছ থেকে সবকিছু জানতে চাইল। সাহেব বললেন, এতকাল সে বাঘ ভাল্লুক মারতো, তাই বকশিস পেত সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এবার সে মেরেছে একটা মানুষ, তাই কি বকশিস দেওয়া হবে সেটা পাঁচ জনের ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে।

কথাটা ঘিসুয়ার মনে ধরল! যেদিন ঘিসুআর বিচার হল সেদিন সে মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই তার ভালো বকশিস জুটবে। সুতরাং উৎসাহিত হয়ে জজের কাছে সব খুলে বলতে লাগল: গোবিন্দ সর্দারের মাথা কাটতে গিয়ে তাকে কম কষ্ট করতে হয়নি। অনেকে ওকে মেরে ফেলবার জন্যে সুযোগ খুঁজলেও কেউ পারেনি। গোবিন্দ সর্দার যে সব সময় মোটর চড়ে ঘুরে বেড়ায়। নিজের অঢেল সম্পত্তি করেছে সকলের লুটপাট করে। ওটা কি কম শয়তান ছিল? কত লোককে খুন করেছে, কত লোককে যে উচ্ছেদ করেছে আর কত মেয়েমানুষের যে সতীত্ব নষ্ট করেছে তার কি কোন হিসেব আছে? এই ভাবেই তো ঘিসুআর জমিবাড়ি কেড়ে নিয়ে সব কিছু লুটেপুটে তাকে সর্বশান্ত করেছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে ঘিসুআর স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল। বেটার কি সাহস!

হঠাৎ ঘিসুআকে সামনে দেখে গাড়ি নিয়ে চম্পট দিচ্ছিল। বেটা ভেবেছিল ঘিসুআর হাত থেকে রেহাই পাবে। তা কি কখনও হয়! প্রথমে দূর থেকে চাকায় তীর মেরে গাড়িটাকে দিলাম অচল করে। তারপর কুঠারের এক কোপে তার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সেই রাত্রেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সোজা ছুটতে লাগলাম। প্রায় ত্রিশ মাইল পথ ছুটে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে এসে পৌঁছলাম।

গোবিন্দ সর্দার যে সে লোক নয়। হাতে তার সব সময় থাকত

বন্দুক। লোকে বাঘ ভালুকের চেয়ে ওকে বেশী ভয় করত। কেননা বাঘ ভালুকের চেয়ে মানুষের সর্বনাশ ও অনেক বেশী করেছে। সুতরাং ওকে মেরে ঘিনুআ কম সাহস আর বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়নি।

কয়েক বছর আগে বিদ্রোহী নেতা ঝপট সিং-এর মাথা কাটার জন্যে ভোরাকে সাহেব পাঁচশো টাকা বকশিস দিয়েছিলেন। অথচ ঝপট সিং মানুষটা ভালো ছিল। সে কোন মেয়ে মানুষের সতীত্ব নষ্ট করেনি। অথবা কারো জমি বাড়িও দখল নেয়নি। সে খাজাঞ্চি খানা লুঠ করেছিল আর একবার মেরে ফেলেছিল একটা সিপাইকে। কিন্তু গোবিন্দ সর্দার একটা ভয়ঙ্কর লোক। তাকে মারার জন্যে ঘিনুআকে অনেক বেশী বকশিস দেওয়া উচিত।

ঘিনুআর যুক্তি শুনে সকলে হেসে উঠলেন হো হো করে। জজ সাহেব বললেন: হ্যাঁ তা ঠিক, ন্যায্য পাওনা তোকে দিতে হবে বইকি। সরকারী উকিল বললেন: তোকে বকশিস দেবার জন্যেই তো এখানে আনা হয়েছে।

কথাগুলোকে ঘিনুআ পরিহাস না ভেবে সহজ অর্থে গ্রহণ করল, কেননা ঠাট্টা পরিহাস সে বোঝে না।

সুতরাং প্রাণদণ্ডের রায় দেবার পরেও ঘিনুআ তার যথার্থ অর্থ কিছু বুঝতে পারল না। তাছাড়া জেলে নিয়ে যাবার পথে বোঝানো হল তার বকশিস পাবার দিন এগিয়ে আসছে। সুতরাং ঘিনুআ তখনও বুঝতে পারল না যে সে একজন অপরাধী এবং তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ঝপট সিংকে মারা আর গোবিন্দ সর্দারকে মারা যে এক ব্যাপার নয়—একথা সে কেমন করে বুঝবে। সে জানতে পারল না যে একটা হল গৌরবের বিষয় আর অন্যটা অপরাধ। বুনো সাঁওতাল হতভাগা ঘিনুআর মোটা মাথায় আইনের এতসব সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ ঢুকবে কেমন করে?

মনে মনে ঘিনুআ ভাবে ঝপট সিংকে মেরে ও পেয়েছিল পাঁচশো টাকা। তার চেয়ে বেশী না হলে ও নেবে কেন? সবটাই

ফিরিয়ে বলবে, কিছু না দিলেও চলবে সাহেব, কিন্তু তোমার চেয়ে আমাকে বকশিস বেশী দিতে হবে।

নির্জন সেলে একাকী ঘিসুআ গভীর অন্ধকারে বসে অনেক কথা ভাবে। কথা বলার একটা মানুষও সে দেখতে পায় না। কথা বলার ইচ্ছাও তার নেই। শুধু বকশিস্ নিয়ে ঘরে ফেরবার জন্যে তার মন ছটফট করতে থাকে।

অবশেষে ফাঁসির দিন এসে গেল। জিজ্ঞাসা করা হল সে কি চায়? ঘিসুআর এক কথা: আমার বকশিস? তখনও তাকে বলা হল: চল্ তোকে বকশিস দেওয়া হবে। তার মাথায় পরানো হল কালো কাপড়। ঘিসুআ ভাবল বোধ হয় চোখ বেঁধে তার হাতে ঢেলে দেওয়া হবে অনেক সোনা-রূপো। সরকারের লীলা বোঝাই ভার। এমনি করে শুধু শুধু কি বকশিস দেওয়া যায়? ঘরে ফিরে বউকে সে সব কিছু দেখাবে, বউ নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। এই টাকায় সে নতুন ঘর তৈরী করবে, জমি জায়গা কিনবে—কত সুখ। এখন তো আর গোবিন্দ সর্দার নেই যে সব কিছু লুঠ করে নেবে।

হঠাৎ কি একটা এসে তার গলায় বেড়ি পাকিয়ে গেল।